ইসলামের ইতিহাস

দাখিল নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে দাখিল
নবম-দশম শ্রেণির ইসলামের ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

ইসলামের ইতিহাস

দাখিল
নবম ও দশম শ্রেণি

২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পরিমার্জিত

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

প্রসঙ্গকথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়বদ্ধ এবং নৈতিকতা সম্পন্ন সুশিক্ষিত জনশক্তি প্রয়োজন। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশিত পন্থায় ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আকিদা অনুযায়ী জীবন গঠনের মাধ্যমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী নাগরিক তৈরি করা এবং জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা মাদ্রাসা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফলন নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ইসলামি মূল্যবোধ, দেশপ্রেম ও মানবতাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষাধারার শিক্ষাক্রমের আলোকে ইবতেদায়ি ও দাখিল স্তরের ইসলামি ও আরবি বিষয়ের সকল পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীদের বয়স প্রবণতা, শ্রেণি ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভা বিকাশ সাধনের দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইসলামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবহিত হতে ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এ বিষয়টি সামনে রেখে **'ইসলামের ইতিহাস'** পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটিতে মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদিনের জীবনী এবং ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমন ও মুসলিম শাসন সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটিতে বাংলা বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে।

একুশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে বিভিন্ন পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ আলেম, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, শ্রেণিশিক্ষক, শিক্ষক প্রশিক্ষক এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তকটি অধিকতর উন্নত করা হয়েছে, যার প্রতিফলন বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে। তা সত্ত্বেও কোনো ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

পুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আশা করি, পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের পাঠকে আনন্দময় করবে এবং তাদের প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জনে সক্ষম করে তুলবে।

অক্টোবর ২০২৪

অধ্যাপক মুহাম্মদ শাহ্ আলমগীর
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

Lore

সূচিপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম অধ্যায়

প্রাক-ইসলামি পটভূমি ও রাসুল (সা.)এর মক্কা জীবন

(ক) প্রাক-ইসলামি পটভূমি ও আইয়াম-ই-জাহিলিয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাক-ইসলামি আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থান ও সীমা

পবিত্র আরব ভূ-খণ্ড হচ্ছে ইসলামের প্রাণকেন্দ্র। ভৌগোলিক অবস্থান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আরবভূমি ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের মিলনস্থলে অবস্থিত। এদেশের মাটি পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা। তাই পবিত্র কুরআনে আরবের মক্কা নগরীকে 'উম্মুল কুরা' (اُمُّ الْقُرٰى) বা আদিনগরী বলা হয়েছে।

ধারণা করা হয় যে, প্রাচীনকালে হিজাজ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত তায়ামা প্রদেশের কাছে 'আরাবা' (اَلْعَرَبَةُ) নামক স্থান ছিল। সেই 'আরাবা' থেকেই কালক্রমে 'আরব' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, 'ইয়ারাব' (يَعْرُبُ) থেকে আরব শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। ইয়ারাব ছিল কাহতানের পুত্র সন্তান। আর কাহতান ছিল দক্ষিণ আরবিয়দের পূর্ব পুরুষ। অন্য একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে, হিব্রু ভাষায় প্রচলিত 'আবহার' (اَلْاَبْهَرُ) শব্দটি আরব শব্দের সমার্থক। 'আরব' এবং 'আবহার' দু'টি শব্দের সমার্থক বাংলা শব্দ হল 'মরুভূমি'। অপরদিকে পাশ্চাত্য অঞ্চলের লোকগণ আরবিয়দের 'সারাসিনি' হিসেবে অবহিত করত। সাহারা শব্দ থেকে উৎপন্ন 'সারাসিনি' শব্দের অর্থ হলো 'মরুভূমি'। আবার 'আরব' শব্দের আভিধানিক অর্থ বাগ্মিতা। আরববাসীরা বাগ্মী হওয়ায় পৃথিবীতে তাদের দেশের এরূপ নামকরণ হয়েছিল। আরবের অধিকাংশ স্থান মরুময় ছিল বলেও এরূপ নামকরণ করা হয়ে থাকতে পারে।

প্রাচীন আরবের ভূ-প্রকৃতি

পবিত্র আরব ভূ-খণ্ড পৃথিবীর সর্ববৃহৎ উপদ্বীপ। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত এ ভূ-খণ্ডের তিন দিকে সমুদ্র ও একদিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত। তাই এ ভূখণ্ডকে 'জাজিরাতুল আরব' (جَزِيْرَةُ الْعَرَبِ) বা আরব উপদ্বীপ বলা হয়ে থাকে। এর পূর্বদিকে পারস্য উপসাগর, পশ্চিমে লোহিত সাগর, উত্তরে সিরিয়া মরুভূমি এবং দক্ষিণ দিকে ভারত মহাসাগর অবস্থিত।

তবে ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে আরবভূমি সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার মরু অঞ্চলের অংশ ছিল। ধারণা করা হয়, আরবভূমি সাহারা ভূমির অন্তর্ভুক্ত ছিল। লোহিত সাগরের তীরব্যাপী একটানা পর্বতমালাকে আরব অঞ্চলের মেরুদণ্ড বলা হয়ে থাকে। লক্ষণীয় যে, সমগ্র আরব ভূখণ্ড পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে অপেক্ষাকৃত ঢালু। পূর্বদিকে ওমান পর্বতমালা, দক্ষিণাঞ্চল নিচু এবং কিয়দাংশ ঢালু, উত্তরের নজদ একটি উচ্চ মালভূমি। পাহাড় ও মালভূমি ছাড়া বাকি অংশ মরু অঞ্চল এবং অনুর্বর ভূমি।

আরবের উত্তরাংশে রয়েছে নুফুদ (اَلنُّفُوْدُ) বা সাদা ও লালচে বালিযুক্ত অঞ্চল। কোথাও বা উঁচু ঢিবি আবার কোথাও বা বালিয়াড়িতে পরিণত হয়ে উত্তর আরবের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল আবৃত করে রেখেছে। এর প্রাচীন নাম হল আল-বাদিয়া (اَلْبَادِيَةُ)। উত্তরে নুফুদ থেকে দক্ষিণে আল-রাব-আল্-খালি পর্যন্ত বিস্তৃত লাল বালিপূর্ণ আদ-দাহনা (اَلدَّهْنَاءُ) বা লালভূমি দক্ষিণ-পূর্বদিকে এক বিরাট বক্ররেখা বরাবর ৬০০ মাইলের বেশি বিস্তীর্ণ। পুরোনো মানচিত্রে আদ-দাহনা সাধারণত 'আল্-রাব-আল্-খালি' (ফাঁকা অঞ্চল) নামে অভিহিত।

আয়তন: আরব ভূ-খণ্ডের আয়তন ১০,২৭,০০০ বর্গমাইল (২৬,৫৮,৭৮১ বর্গ কিলোমিটার)। প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরের এ স্রোতধারা উপদ্বীপকে প্লাবিত করে কিছুটা তৃণময় ও মানুষের বাসোপযোগী করে তোলে।
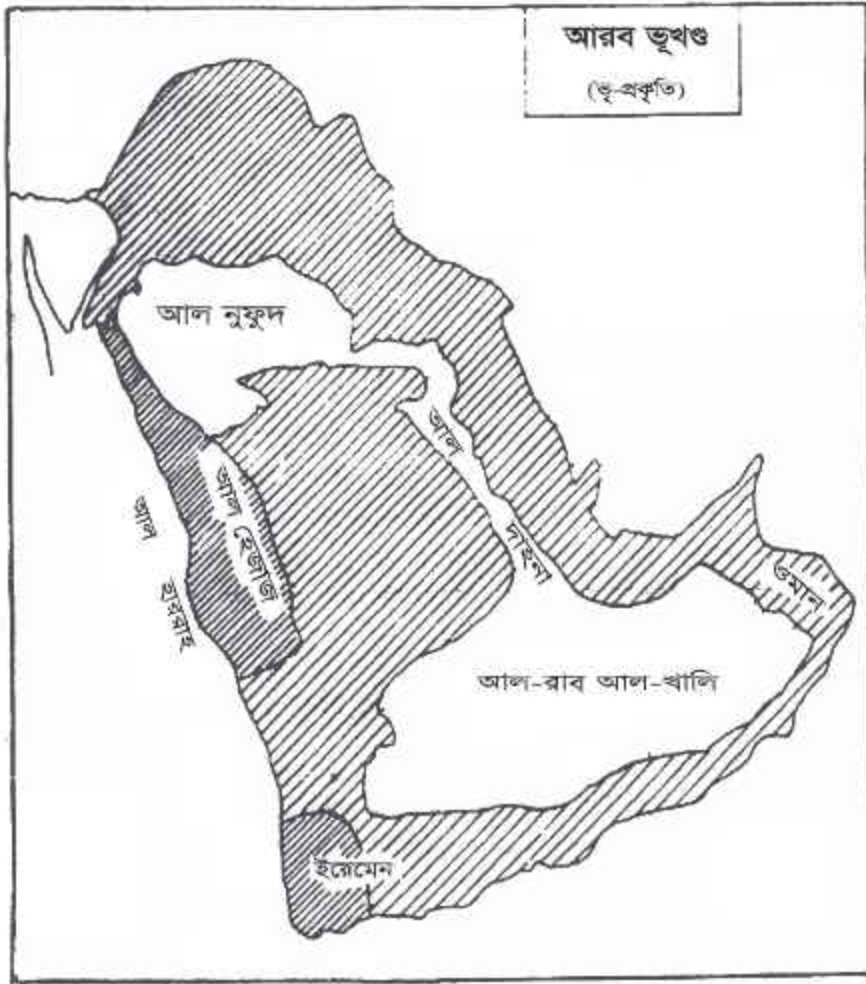
চিত্র ঃ প্রাচীন আরবদেশ

ভৌগোলিক পরিচিতি : ভৌগোলিক পরিচিতির দৃষ্টিকোণ থেকে আরবকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গ্রিক ভূগোলবিদদের মতে এ ভাগগুলো হলো– মরু অঞ্চল, পার্বত্য অঞ্চল ও উর্বর অঞ্চল। মরু অঞ্চল ও পার্বত্য অঞ্চল ব্যতীত আরবের উর্বর তৃণ অঞ্চল হিজাজ, নজদ, ইয়ামেন, হাজরামাউত এবং ওমান এ কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ইসলামের প্রাণকেন্দ্র হিজাজ আরবদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত এবং মক্কা, মদিনা ও তায়েফ এর তিনটি প্রধান শহর। দক্ষিণ আরবে অবস্থিত হাজরামাউত, ওমান ও ইয়ামেন অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষিকার্যের জন্য খুবই বিখ্যাত। অপরদিকে মরু অঞ্চল ছিল খরতাপে বিদগ্ধ ও গুল্মশূন্য, বসবাসের অনুপযোগী উত্তপ্ত এলাকা। কখনও কখনও মরু অঞ্চলে বিষাক্ত লু-হাওয়া প্রবাহিত হয়।

আবহাওয়া : আরব উপদ্বীপটি অত্যন্ত শুষ্ক ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। পূর্ব ও পশ্চিমে সমুদ্রবেষ্টিত হলেও সেই জলরাশি এখানকার ভূমি সিক্ত করতে পারে না। কারণ, আরবভূমির অধিকাংশই আফ্রিকা ও এশিয়ার বৃষ্টিহীন বিপুল প্রান্তর। তাই তার আবহাওয়ায় অনাবৃষ্টির রুক্ষতার প্রাধান্যই বেশি। দক্ষিণ সমুদ্র থেকে স্বাভাবিক কারণেই জলবাহী মেঘ ওঠে, কিন্তু মরুর বালুঝড় (সাইমুম) তা বাতাসেই শুষে নেয়। ফলে সেই মেঘ যখন আরবের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছায় তখন তাতে জলীয় বাষ্প আর অবশিষ্ট থাকে না। ওমান, হাজরামাউত, হিজাজ প্রভৃতি উপকুলবর্তী অঞ্চল ও পানি বিধৌত উপত্যকায় সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। চাষের উপযোগী বৃষ্টিপাত হয় ইয়ামেন ও আসীর প্রদেশে। ইয়ামেনের আধুনিক রাজধানী সানা সমুদ্র হতে ৭০০ ফুট (২১৩.৩৬ মিটার) উচ্চে অবস্থিত এবং এটি আরবের অন্যতম সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর স্থান।

চিত্র ঃ প্রাচীন প্রাচ্য

আরব উপদ্বীপের বৈশিষ্ট্য : আরব উপদ্বীপ একটি বিশাল ও বিস্তৃত মালভূমি। এ উপদ্বীপের পশ্চিম প্রান্ত অন্যান্য অংশ বা অঞ্চল হতে অনেক উঁচু। এদেশের ভূখণ্ড পশ্চিম হতে পূর্বদিকে ক্রমান্বয়ে ঢালু ভূমি দ্বারা গঠিত। মধ্যআরবে কিছু পর্বতশৃঙ্গ পরিদৃষ্ট হয়। এগুলো সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ৪০০০ থেকে ৬০০০ ফুট উঁচু (যথাক্রমে ১২১৮ ও ১৮১৯ মিটার)। এ আরব ভূখণ্ডের জলবায়ু সর্বত্র উষ্ণ। এদেশে নাব্য নয় এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু সংখ্যক নদ-নদী রয়েছে। ভূমি অনুর্বর। কেবলমাত্র মরুদ্যান এবং উপকূলভাগ অপেক্ষাকৃত উর্বর।

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের জন্য আরব উপদ্বীপ এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের মিলনকেন্দ্র হিসেবে বিদ্যমান থেকেও যেন সমগ্র বিশ্ব হতে বিচ্ছিন্ন। আরব ভূখণ্ডের এক-তৃতীয়াংশ মরুময়। উত্তর ভাগে 'নুফুদ' মরুভূমি এবং নুফুদ হতে আরম্ভ করে দক্ষিণ ভাগ পর্যন্ত ৬০০ মাইল এলাকা জুড়ে রয়েছে আরবের বৃহত্তম মরুভূমি 'আদ-দাহ্না' ('আল্-রাব-আল্-খালি')। এতদ্ব্যতীত এদেশের পশ্চিম দিকে রয়েছে আল্-হাররাহ্ নামক আর একটি ক্ষুদ্র মরুভূমি।

কতিপয় পর্বতমালা, কিছুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদ-নদী, স্বল্পসংখ্যক মরূদ্যান এবং এক বিশাল ও বিস্তৃত মরুভূমি বুকে নিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে বিদ্যমান রয়েছে প্রাচীনকালের আরব উপদ্বীপ বা আরবদেশটি। এ দেশের ভৌগোলিক অবস্থা ও বৈশিষ্ট্য যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি গুরুত্বপূর্ণও বটে।

আরবের ফসলাদি ও প্রাকৃতিক সম্পদ : খেজুর আরবদের প্রধান খাদ্য। খেজুর ছাড়া তাদের জীবন ধারণ করা ছিল কষ্টকর। খেজুর গাছ আরব দেশে 'বৃক্ষরাণী' হিসেবে খ্যাত। স্থানীয় লোকজনের বহুবিধ প্রয়োজন ছাড়াও খেজুরের বীজ চূর্ণ করে উটের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। খেজুর গাছের মিষ্টি রস আরব বেদুইনদের অন্যতম পানীয়। প্রত্যেক বেদুইনের স্বপ্ন হল 'দুটি কৃষ্ণ দ্রব্য' (আল-আসওয়াদান) অর্থাৎ পানি ও খেজুর। হিজাজে প্রচুর পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হয়। ইয়ামেনের কয়েকটি মরূদ্যানে উৎপন্ন হয় গম। ঘোড়ার খাদ্য হিসেবে চাষ হয় বার্লি, কয়েকটি অঞ্চলে ভুট্টা এবং ওমান ও আল-হাসায় ধান উৎপন্ন হয়। আরবীয় মরূদ্যানে উৎপন্ন অন্যান্য ফলের মধ্যে বেদানা, বাদাম, কমলালেবু, কাগজি লেবু, আখ, তরমুজ ও কলা উল্লেখযোগ্য।

আরবের কোনো কোনো অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে খনিজ দ্রব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে আরবের ইয়ামেন অঞ্চল ও কেন্দ্রীয় আরবের কয়েকটি স্থানে খাঁটি সোনা পাওয়া যেত। আরবের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে পেট্রোল, স্বর্ণ, গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি।

আরবের প্রাণী : আরবের জীবকুলের মধ্যে চিতাবাঘ, হায়েনা, নেকড়ে, শিয়াল ও গিরগিটি উল্লেখযোগ্য। শিকারী পাখির মধ্যে ঈগল, বাজপাখি ও পেঁচা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অতি পরিচিত পাখির মধ্যে ঝুঁটিওয়ালা পাখি(হুদহুদ), বুলবুল, পায়রা ও আরবি সাহিত্যে আল-কাতা নামে পরিচিত এক ধরনের তিতির পাখি দেখতে পাওয়া যায়। গৃহপালিত পশুর মধ্যে উট, ঘোড়া, গাধা, সাধারণ কুকুর, শিকারী কুকুর, বিড়াল, ভেড়া, ছাগল প্রধান। দৈহিক সৌন্দর্য, কষ্ট সহিষ্ণুতা, বুদ্ধি এবং মনিবের প্রতি মর্মস্পর্শী আনুগত্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ ও উত্তমভাবে প্রতিপালিত আরবিয় ঘোড়া এক অনন্য দৃষ্টান্ত। উটের সাহায্য ছাড়া মরু অঞ্চল কখনই মানুষের বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারত না। উট ছিল যাযাবরদের ধাত্রীসম। উত্তপ্ত মরুভূমিতে উট ছিল আরবদের একমাত্র যাতায়াতের বাহন। তাই উটকে 'মরুভূমির জাহাজ' বলা হয়। পবিত্র কুরআন শরীফে আরবদের জন্য এক বিশেষ অবদান হিসেবে উটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আরবদের মধ্যে উটের ব্যবহার ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। যার যতো বেশি উট ছিল সে ছিল ততো বেশি ধনী। উট বেদুইনদের নিত্য সহচর ও পথের বন্ধু। উটের মাংস তাদের খাদ্য এবং দুগ্ধ ছিল পুষ্টিকর পানীয়। উটের চামড়া দিয়ে তারা তাবু এবং পশম দিয়ে পোশাক তৈরী করত।

আরব জাতি : আরব উপদ্বীপের আদিম অধিবাসীদের সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করা এখনও সম্ভব হয় নি। তবে স্বকীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্দীপ্ত আরব জাতি প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত; যথা– বায়দা (اَلْبَائِدَةُ) ও বাকিয়া (اَلْبَاقِيَةُ)। কুরআন শরীফে বর্ণিত প্রখ্যাত প্রাচীন বংশ 'আদ', 'সামুদ', 'তামস' ও 'জাদিস' প্রভৃতি প্রাচীন আরব গোত্রগুলো প্রথম শ্রেণিভুক্ত ছিল। পরবর্তী জাতিগুলোর মধ্যে অভ্যুত্থানে প্রাচীন বায়দা গোত্রগুলো বিলুপ্ত হয়।

অধুনালুপ্ত বায়দা গোত্রের উত্তরাধিকারী 'বাকিয়া' জাতি বর্তমান আরব ভূখণ্ডের প্রধান অধিবাসী। এ 'বাকিয়া' শ্রেণিভুক্ত আরবদের দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। 'প্রকৃত আরব বা আরিবা' (عَارِبَةٌ) ও 'আরবিকৃত আরব' বা মুস্তারিবা (مُسْتَعْرِبَةٌ)। সর্বাপেক্ষা আদিম ও নিষ্কলুষ রক্তের অধিকারী আরিবা গোত্র কাহতানের বংশোদ্ভূত। দক্ষিণ আরবের ইয়ামেন অঞ্চলের অধিবাসী ছিল বলে তাঁরা ইয়ামেনীয় বা হিমারিয়া বলে পরিচিত ছিল। কাহতানের বংশের অভ্যুত্থান হতেই আরব জাতির প্রকৃত ইতিহাসের সূত্রপাত হয়। উল্লেখ্য যে, রক্তের পবিত্রতার জন্য আরিবা অথবা ইয়ামনীয়রা মুস্তারিবা গোত্রের তুলনায় অধিক ক্ষমতাশালী ছিল এবং মদিনায় হিজরত করার পর প্রকৃতপক্ষে রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁদের নিকট হতে সহযোগিতা লাভ করেন। ইসমাইল (আ.)-এর একজন বংশধর আদনান মুস্তারিবা গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। হিজাজ, নজদ, পেত্রা, পালমিরা অঞ্চলে বসবাসকারী মুস্তারিবা গোত্রের নিযারী হতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর কুরাইশ বংশের উদ্ভব হয়। মুস্তারিবাগণ উত্তর আরবের হিজাজের অধিবাসী হিসেবে 'হিজাজি' বা 'মুদারি' নামেই সমধিক পরিচিত লাভ করেন।

উত্তর আরবগোত্র সাধারণভাবে নিযারি অথবা মুদারি নামে অভিহিত এবং সাধারণত তারা যাযাবর জীবন যাপন করত। অপরদিকে দক্ষিণ আরব অথবা ইয়ামেনিরা ছিল নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত। কারণ, তারা সাবিয়ি ও হিমায়ারি রাজ্যের অধিবাসী ছিল। উত্তর আরবের লোকেরা কুরআন শরীফের ভাষা অর্থাৎ আরবিতে কথা বলত। দক্ষিণ আরবের লোকেরা প্রাচীন সেমেটিক ভাষা, সাবেয়ি ও হিমায়ারি ব্যবহার করত। কৃষ্টির দিক হতে বিচার করলে দক্ষিণ আরবের সভ্যতার উন্মেষ হয় খ্রিস্টের জন্মের ১২শত বছর পূর্বে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত উত্তর আরব ইতিহাসে কোনো উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করতে পারেনি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ভূ-প্রকৃতি অনুসারে আরবের অধিবাসী

ভূ-প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে আরবের অধিবাসীদের দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়– শহরের স্থায়ী বাসিন্দা ও মরুবাসী যাযাবর, যারা 'বেদুইন' নামে পরিচিত। এ দুশ্রেণির আচার-ব্যবহার, জীবনযাত্রার প্রণালী, ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ রয়েছে। অনেক মরুবাসী আরব বেদুইন জীবন ত্যাগ করে শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। অপরদিকে দারিদ্র্যের কষাঘাত সহ্য করতে না পেরে কিছু সংখ্যক স্থায়ী বাসিন্দা বাধ্য হয়ে যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করে।

(ক) **শহরবাসী:** আরবের উর্বর তৃণ-অঞ্চলগুলো স্থায়ীভাবে বসবাসের উপযোগী বলে অসংখ্য জনপদ গড়ে উঠেছে। কৃষিকার্য, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ছিল স্থায়ী বাসিন্দাদের প্রধান জীবিকা। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার ফলে এরা ছিল মরুবাসী বেদুইনদের তুলনায় অধিকতর রুচিসম্পন্ন ও মার্জিত।

(খ) মরুবাসী যাযাবর : আরব অধিবাসীদের অধিকাংশই স্বাধীনচেতা, বেপরোয়া ও দুর্ধর্ষ মরুবাসী বেদুইন। সমাজের ধরাবাঁধা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে শহরে বসবাস করার পরিবর্তে বেদুইনগণ জীবনধারণের জন্য মরুভূমির সর্বত্র ঘুরে বেড়াত। তারা তৃণের সন্ধানে এক পশুচারণ হতে অন্য পশুচারণে গমন করত। তাদের গৃহ হচ্ছে তাবু, আহার্য উটের মাংস, পানীয় উট ও ছাগলের দুগ্ধ, প্রধান জীবিকা লুটতরাজ। শহরবাসী ও বেদুইনের মধ্যে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

বেদুইন জীবন : মরুভূমির নিরবিচ্ছিন্ন শুষ্কতা ও একঘেয়েমি দুরন্ত আরব বেদুইনদের শারীরিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গঠনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করে। প্রগতি ও পরিবর্তনকে উপেক্ষা করে তারা পূর্ব পুরুষদের রীতিনীতি ও জীবনযাত্রার প্রণালী মনেপ্রাণে অনুসরণ করে। ইতিহাসের গতিধারা, রাজ্যের উত্থান-পতন যাযাবর বেদুইনদের সাবলীল ও স্বাধীন জীবন পদ্ধতিকে ব্যাহত করতে পারেনি। পাদুকা ব্যবহারে তারা অভ্যস্ত নয়। দুরন্ত যাযাবর বেদুইনদের নিকট মরুভূমিই প্রধান বাসস্থান। বেদুইন সমাজের মূলভিত্তি গোত্রপ্রথা। গোত্রের প্রধানকে 'শাইখ' (اَلشَّيْخُ) বলা হত। গোত্রপতি বয়স, জ্ঞান-বুদ্ধি, সাহস ও বীরত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। পারিবারিক প্রধানদের নিয়ে গঠিত কাউন্সিলের সঙ্গে তিনি পরামর্শ করতেন। সামরিক, বিচার সংক্রান্ত ও জনকল্যাণকর ব্যাপারে শেখ এর বিশেষ কোনো কর্তৃত্ব ছিল না। তাবু এবং গৃহস্থালির দ্রব্যাদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হলেও পশুচারণ, তৃণভূমিতে পানি এবং যৎসামান্য ভূমি গোত্রের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হত। একই গোত্রের মধ্যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলে কেউ অপরাধীকে সাহায্য করত না; কিন্তু অপর কোনো গোত্র যদি হত্যা করত তা হলে সমগ্র গোত্র প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হত।

বেদুইনদের বৈশিষ্ট্য : আরব বেদুইনদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয় যে, একদিকে তারা লুটতরাজ, জিঘাংসা, পরদ্রব্য অপহরণ, যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকা, অপরদিকে মহত্ত্বের সুকুমার গুণাবলিও তাদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যাযাবর বেদুইনদের স্বজনপ্রীতি ও গণতন্ত্রপ্রীতি সর্বজনবিদিত। গোত্রকেন্দ্রিক মরুবাসী বেদুইনদের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য কওম-চেতনা (আসাবিয়্যাহ)। গোত্রপ্রীতি ও রক্ত সম্পর্কের উপর গঠিত এ কওম-চেতনা পরবর্তীকালে আরব জাতিগঠন এবং ইসলামের বিস্তৃতি সাধনে সহায়ক ছিল। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, গোত্র-মানসিকতা, অতিথিপরায়ণতা, সহিষ্ণুতা, পৌরুষত্ব প্রভৃতি তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। রক্তের পবিত্রতা, পূর্বপুরুষদের আভিজাত্য ও বীরত্ব, প্রাচীন আরবি কবিতা ও বাগ্মিতা, আরবি অশ্ব ও তরবারি তাদের গর্বের বস্তু ছিল। আরব বেদুইনদের অতিথিপরায়ণতা সর্বজনস্বীকৃত। কারণ, অতিথি শত্রুকেও তাঁরা আদর আপ্যায়ন করতে দ্বিধা করেনি।

অধিবাসীদের উপর ভৌগোলিক প্রভাব

আরব উপদ্বীপের বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক পরিবেশ, অধিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। এ ভূখণ্ডের বৃষ্টিপাতহীন শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়া, বালুকাময় ধু-ধু মরুভূমি প্রভৃতি প্রতিকূল ও ভৌগোলিক পরিবেশের সাথে সংগ্রাম করে মরুবাসী বেদুইনগণ একদিকে যেমন রুক্ষ, দুঃসাহসী ও সৈনিক জাতিতে পরিণত হয়েছে, অপরদিকে তারা ধৈর্যশীল, কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী হয়েছে। তাদের চরিত্রে কঠোরতা, বর্বরতা, নৃশংসতা এবং সাহসিকতার সমন্বয় ঘটেছে। মরুভূমির প্রচণ্ড সাইমুম ঝড়, প্রখর উত্তাপ, রৌদ্রদগ্ধ বালুকা, উন্মত্ত লু হাওয়া, রুক্ষ পর্বতমালা, কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষাদি তাদেরকে সংগ্রামী করে তুলেছে। পশুচারণ ও পশুপালন তাদের প্রধান পেশা হলেও খাদ্যের অভাব হলে তারা পণ্যবাহী কাফেলায় হামলা চালাত কিংবা পার্শ্ববর্তী এলাকায় লুটতরাজ করত।

আরবদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ও কলহ লেগেই থাকত। লুণ্ঠন তৎপরতা, রাহাজানি, খুন-খারাবি তাদের মধ্যে দূষণীয় ছিল না। এ যুদ্ধাংদেহী সমাজব্যবস্থায় পুত্র সন্তানের কদর ছিল বেশী। কারণ গোত্রভিত্তিক কাঠামোতে পুরুষ সভ্যের সংখ্যাধিক্য গোত্রের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন করত। এ সময় কন্যা সন্তান ছিল সমাজের বোঝা। এ বোঝা নিরসন কল্পে তারা নারী ও কন্যা সন্তানের উপর বিরূপ হয়ে ওঠেছিল। যুদ্ধবিগ্রহে পরাজয়ের অর্থ ছিল নারীদের দাসত্ব। কন্যা সন্তান বৃদ্ধি মানে অনাহার বা অর্ধাহার, এ ছিল অধিকাংশ আরবের ধারণা।

'মরুভূমিতে রাত্রি ভীতিকর, ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানবের আনাগোনা'– এ সাধারণ বিশ্বাস মরুভূমির বিপদ হতে পথিককে রক্ষা করার জন্য আরবদের মধ্যে অতিথিপরায়ণতা বিকশিত হয়েছিল। মরুভূমি অনুর্বর ও পর্বতাঞ্চলের আরব সমাজ গোত্রভিত্তিক ছিল। গোত্র-নিরাপত্তা ও বহিরাক্রমণের ভয় তাদেরকে গোত্রপ্রিয় করে তুলেছিল। এ গোত্রপ্রীতি তাদের মধ্যে জন্ম দেয় মনুষ্যত্ব, আত্মসংযম, স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের। শেখের নিকট সকল নাগরিকের অধিকার সমান। এরূপ পরিস্থিতিতে উন্নততর ধর্মে-কর্মে তাদের শিথিলতা পরিলক্ষিত হওয়াই স্বাভাবিক। আরব ভূ-খণ্ডের অনুদার পরিবেশ, খাদ্য ও পানীয় জলের অভাব, নির্দিষ্ট চলাচলের পথ না থাকায় বৈদেশিক আক্রমণের হাত থেকে আরববাসীরা সব সময় নিরাপদ থেকেছে।

ভৌগোলিক প্রভাবের কারণে শহরবাসী আরব ও মরুবাসী বেদুইনদের মধ্যে আত্মসচেতনাবোধ ও কাব্যিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। আরববাসীরা ছিল কাব্যের প্রতি অধিক মাত্রায় অনুরক্ত। গীতিকাব্য রচনা ও সাহিত্যচর্চায় আরবদের অপূর্ব সৃজনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। আরব কবিগণ ভৌগোলিক পরিবেশে যে কাব্য রচনা করেন তা সংঘাত, অদম্য সাহসিকতা, বীরত্ব, গোত্রপ্রীতি ও প্রেম সম্পর্কিত।

মূলত আরব ভূ-খণ্ডের ভূ-প্রকৃতি, ভৌগোলিক পরিবেশ এবং অধিবাসীদের চরিত্রে এমন বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই তারা ইসলাম গ্রহণের অতি অল্পকালের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যে, শিল্প-সাহিত্যে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এমন একটি নতুন জাতি গড়ে তোলে, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
প্রাচীন সভ্যতাসমূহ

মানব সভ্যতার ইতিহাস উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে। সভ্যতার ইতিহাস কখন থেকে শুরু হয়েছিল একথা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও সভ্যতার গতি স্থির থাকেনি। ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবি পৃথিবীর ইতিহাসকে বিভিন্ন কৃষ্টির ক্রমবিকাশের ফল বলে আখ্যায়িত করেছেন। একথা সত্য যে, আধুনিক সভ্যতাসহ পূর্ববর্তী প্রতিটি সভ্যতা তার পূর্বের সভ্যতার কাছে ঋণী। পূর্ববর্তী সভ্যতার আর্থ-সামাজিক প্রভাব পরবর্তী প্রতিটি সভ্যতার উপর ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। সভ্যতার উন্মেষের মূল কারণগুলো ছিল ক্রমবর্ধমান মানব সমাজের সামাজিকীকরণ, লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ধরনের

সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ। যেমন- কৃষিকার্য, সেচ ব্যবস্থা, যানবাহনের উন্নতি, রাষ্ট্রীয় বিধান ও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রবর্তন, শিল্প, স্থাপত্য, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা প্রভৃতি। ইউফ্রেটিস, টাইগ্রীস, নীল ও সিন্ধুনদের অববাহিকায় পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনগুলো বিদ্যমান রয়েছে। বলা বাহুল্য, মিসরীয় সভ্যতা ও মেসোপটেমীয় সভ্যতা মানব সভ্যতার ইতিহাসে সর্ব প্রাচীন বলে স্বীকৃত। সুমেরীয়, কালদীয়, ব্যাবিলনীয়, আক্কাদীয় ও অ্যাসিরীয় কৃষ্টির সমন্বয়েই মেসোপটেমীয় সভ্যতার' উদ্ভব হয়েছিল।

মিসরীয় সভ্যতা

প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা পৃথিবীর ইতিহাসের সুসমৃদ্ধ সভ্যতা। এ সভ্যতার উন্মেষ হয় মিসরের নীলনদের অববাহিকায়। সভ্যতার ইতিহাসে মিসরীয়গণ যে অবদান রেখেছেন সম্ভবত অপর কোনো জাতি এরূপ অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি। প্রাচীন মিসরই ছিল বিশ্বের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার অগ্রদূত।

মিসরের ভৌগোলিক অবস্থান : মিসরকে নীলনদের দান বলা হয়। কারণ মরুভূমিতে পরিণত হওয়া মিসর নীলনদের প্রভাবেই জুন হতে অক্টোবর মাসের মধ্যে উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়। এ সময়ের মধ্যে নীলনদের উভয় তীর প্লাবিত হয়। প্লাবন শেষে পলিমাটিতে উভয় তীর দৈর্ঘ্যে ৬০০ মাইল এবং প্রস্থে ১০ মাইল পর্যন্ত ভরে যায়। এরূপ সঞ্চিত পলি মাটির গুণে উভয় ভূ-ভাগ অত্যন্ত উর্বর হয়। ফলে শস্য, তুলা প্রভৃতি প্রচুর পরিমানে উৎপন্ন হওয়ায় মিসর একটি সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হয়। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এ তিনটি মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় এবং ভূ-মধ্যসাগরের উপকূলে বিদ্যমান হওয়ার ফলে মিসরের ভৌগোলিক অবস্থানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মেসোপটেমীয় সভ্যতা

মিসরীয় সভ্যতায় সমসাময়িককালে ইরাক অঞ্চলের টাইগ্রীস (দজলা) এবং ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদীর মধ্যবর্তী ভূমিতে সময়ের ব্যবধানে বেশ কয়েকটি নগর সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। একত্রে এ সভ্যতাসমূহকে 'মেসোপটেমীয় সভ্যতা' বলে। মেসোপটেমীয় সভ্যতার মধ্যে রয়েছে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, অ্যাসিরীয়, আক্কাদীয় ও কালদীয় সভ্যতা। মিসরীয় সভ্যতার সঙ্গে মেসোপটেমীয় সভ্যতার পার্থক্য এই যে, প্রথমটি ছিল নীতি-ধর্মভিত্তিক এবং দ্বিতীয়টি আইনশাস্ত্রভিত্তিক।

ক. সুমেরীয় সভ্যতা :

সুমেরীয় সভ্যতা ছিল মেসোপটেমীয় সভ্যতার সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা। এ সভ্যতার ধারক বাহক ছিল অসেমেটিক সুমেরীয়গণ। তাঁদের নামানুসারে তাদের সভ্যতাকে 'সুমেরীয় সভ্যতা' বলা হয়। তাঁরা ছিল মূলত টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যস্থিত অববাহিকা অঞ্চলের অধিবাসী। তারা লিখন পদ্ধতি, আইন-কানুন, ধর্মীয় অনুভূতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রথম শুরু করে।

খ. ব্যাবিলনীয় সভ্যতা :

টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল 'মেসোপটেমীয়া' নামে পরিচিত। মেসোপটেমীয়ার দক্ষিণে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। সুমেরীয় রাজা ডুঙ্গীর মৃত্যুর পর সুমেরীয় সাম্রাজ্যের পতনের পর ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। ঐতিহাসিকদের মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে সেমেটিক জাতির যে শাখাটি টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায় গমন করে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে কালক্রমে তারা অ-সেমেটিক সুমেরীয় জাতির সমন্বয়ে ব্যাবিলনীয় সভ্যতা গড়ে তোলে।

বিশ্ব সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের অবদান : ব্যাবিলনীয় সভ্যতা ছিল নিঃসন্দেহে উন্নত সভ্যতা। আধুনিক সভ্যতা প্রাচীনকালে ব্যাবিলনীয় সভ্যতার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া এমনকি গ্রিকগণও সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যাবিলনীয়দের কাছে ঋণী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের অবদান পরবর্তী শতাব্দীগুলোর অনুসন্ধিৎসু পন্ডিতদের গবেষণা পরিচালনা করার পথ রচনা করে গেছে। তারা নিজস্ব ও অন্যান্য জাতির পৌরাণিক কাহিনী কিংবা লৌকিক উপাখ্যান সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করে হিব্রু বাইবেলের পটভূমি রচনা করে গেছেন। তারা সমলোচনামূলক ও বিস্তৃতভাবে পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করে অংকশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা, ব্যাকরণ, দর্শন এবং অভিধান সংকলনের ভিত্তি রচনা করে গেছেন। তাঁরা মহাকাব্য, ধর্মীয় গীতি প্রবাদ ইত্যাদিরও প্রর্বতক ছিলেন। সভ্যতার ক্ষেত্রে তাদের এ সমস্ত কর্মকান্ড ক্রমে ক্রমে নিকট প্রাচ্য এবং ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশ্ব সভ্যতার অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

হিব্রু সভ্যতা

প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের প্রাচীনতম সভ্যতাসমূহের মধ্যে হিব্রু সভ্যতা একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। হিব্রুগণ সেমেটিক জাতির একটি উল্লেখযোগ্য শাখা। তারা ছিল যাবাবর শ্রেণির লোক। আরবদেশ থেকে প্রথমে তারা প্যালেস্টাইন গমন করেন এবং তাদের আদিপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর নেতৃত্বে মেসোপটেমীয়ায় বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীতে সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে তাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে তারা ফিনিসীয়, আরামীয় ও হিব্রু– এ তিন ভাগে বিভক্ত হয়।

পারসিক (সাসানীয়) সভ্যতা

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তনের প্রাক্কালে সাসানীয় ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য মধ্যপ্রাচ্য ও নিকট প্রাচ্যে খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের পূর্বে আর্যদের যে শাখাটি পারস্য উপসাগরের দক্ষিণে বসতি গড়ে তোলে, তারা পারসিক এবং যে শাখাটি উত্তর-পশ্চিমের পর্বত সংকুল এলাকায় বসতি স্থাপন করে, তাঁরা মেদ নামে পরিচিত ছিল। সম্রাট সাইরাসের অধীনে তারা খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ অব্দে কালদিয়া সাম্রাজ্য দখল করে নেয়। এশিয়া মাইনরের লিডিয়া অধিকার করে সাইরাস আরো শক্তিশালী হয়ে উঠেন।

সাইরাসের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ক্যামবিসাস সিংহাসনে আরোহণের পর খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫ অব্দে মিসর জয় করেন। ক্যামবিসাসের মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যে কিছুকাল অরাজকতার পর খ্রিস্টপূর্ব ৫২১ অব্দে ডেরিয়াস (দারায়ুস) সিংহাসনে বসেন। অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে তিনি রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তিনি ছিলেন পারসিক সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর সাম্রাজ্য পূর্বে ভারতের সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁর শাসনামলে সম্রাট আলেকজান্ডার পারস্য সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির শীর্ষ চূড়ায় পৌছে। তাঁর উত্তরাধিকারী পরবর্তী সম্রাট জারজেসের শাসনামলে সম্রাট আলেকজান্ডার পারস্য সাম্রাজ্য দখল করে নেন।

গ্রিক সভ্যতা

ইউরোপের দক্ষিণে অবস্থিত আড্রিয়াটিক, ভূ-মধ্যসাগর ও এজিয়ান সাগর পরিবেষ্টিত এবং অসংখ্য দ্বীপাঞ্চল সম্বলিত গ্রীস ছিল প্রাচীন সভ্যতার পাদপিঠ। গ্রীসের এ ভৌগোলিক অবস্থা প্রাচীন গ্রিসে গড়ে উঠা সভ্যতাকে অন্যসব প্রাচীন সভ্যতা থেকে আলাদা করেছে। গ্রিকবাসী তাদের দেশকে 'হেলাস' বলত এবং তারা যে সভ্যতা গড়ে তোলে তা 'হেলেনিক সভ্যতা' নামে পরিচিত। আলেকজান্ডার, সক্রেটিস, এরিস্টটল, প্লেটো, হিরোডোটাস, পিথাগোরাস, আর্কিমিডিস, ইউক্লিড প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত

ব্যক্তি গ্রিসে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্রিকদের অবদান অবিস্মরণীয়। বিশ্বজগৎ যখন সভ্যতার দিকে হাঁটি হাঁটি করছিল, গ্রিক জাতি তখন জ্ঞানের মশাল জ্বালিয়ে চারদিক আলোকিত করছিল। প্রয়োজনীয় প্রতিটি ক্ষেত্রে গ্রিস তার কৃতিত্ব সংযোজন করে। তাই বিশ্বসভ্যতা গ্রিকদের কাছে বহু দিক দিয়ে ঋণী।

রোমান সভ্যতা

বিশ্ব সভ্যতায় রোমানদের অবদান অপরিসীম। সভ্যতার ইতিহাসে গ্রিকদের পরেই রোমানদের নাম স্মরণীয়। রোমানদের অবদানগুলো প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত। এক-গ্রিকদের জ্ঞানভান্ডারকে তারা সজীব রাখেন। দুই- নতুন উপাদান দ্বারা বিশ্ব সভ্যতাকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যান। রোমান সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল প্রাচীন রোম নগরীকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে ইতালির পশ্চিম-দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরের উপকূলে রোম নগরী অবস্থিত ছিল। রোম নগরী সাতটি টিলার উপর ছড়িয়ে ছিল। এজন্য রোমকে 'সাতটি পর্বতের নগরী' নামেও অভিহিত করা হয়। ঐতিহাসিক লিভি বলেন, লোকশ্রুতি অনুসারে নির্বাসিত দুই রাজপুত্র রোমুলাস ও রেমাস সিংহাসন পুনরাধিকার করে ৭৫৩ খ্রিস্টপূর্ব রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। রোমুলাসের নামানুসারে রোম নগরী নামকরণ করা হয়। সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অববাহিকা, দক্ষিণ ইউরোপ, আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলের সীমানা এবং নিকট প্রাচ্যের একটি বিরাট অংশ নিয়ে রোমান সাম্রাজ্য গঠিত হয়।

সম্রাট কনস্টানটাইন গোটা রোমান সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা বজায় রাখেন। তাঁর পরেও ৩৯৫ খ্রিস্টপূর্ব পর্যন্ত এ অখণ্ডতা অক্ষুন্ন থাকে। অতঃপর থিওডোসিয়াস এবং তাঁর পুত্রের শাসনামলে সাম্রাজ্যের অখন্ডতা বিনষ্ট হয় এবং পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যে রোমান সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। কনস্টানটাইন হতে শুরু করে একমাত্র সম্রাট জুলিয়ান ব্যতীত অন্যান্য সকল সম্রাটই খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের শাসনামল অবধি রোমানদের রাষ্ট্রভাষা ছিল ল্যাটিন। তৎপর সেদেশে গ্রিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় থিওডোরাসের পর প্রথম জাসটিনিয়ান রোমান সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তার এবং রোমান আইনের সংকলন ও প্রকাশনা ছিল তার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ঐতিহাসিক মায়ার্স বলেন, 'এ আইন বিশ্বের নিকট রোমান প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ সম্পদ'। পরবর্তী প্রসিদ্ধ রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস মহানবি (সা.) কর্তৃক প্রেরিত দূতকে সসম্মানে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। রোমান সম্রাটদের মধ্যে অগাস্টাস ছিলেন আর একজন উল্লেখযোগ্য সম্রাট। রোমান সাম্রাজ্য পতনের প্রধান কারণ ছিল সম্রাটদের দ্বন্দ্ব, বিদ্বেষ। মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতা ও দাসপ্রথা রোমের পতনকে তরান্বিত করে। রোম সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন স্বয়ং সম্রাট।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাহেলিয়া যুগে আরবের রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা

আইয়ামে জাহেলিয়ার পরিচয়

মহানবি (সা.) এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বযুগকে আইয়ামে জাহিলিয়া (اَلْاَيَّامُ الْجَاهِلِيَّةُ) বা অন্ধকার যুগ বলা হয়। আইয়াম অর্থ যুগ এবং জাহেলিয়া অর্থ অন্ধকার, কুসংস্কার, বর্বরতা, অজ্ঞতা। যে যুগে আরব দেশে কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও আল্লাহ প্রদত্ত ধর্মীয় অনভূতি লোপ পেয়েছিল সে যুগকেই অন্ধকার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তবে অন্ধকার যুগের সময়কাল সম্বন্ধে ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যেও মতবিরোধ রয়েছে।

অনেকের মতে, হযরত আদম (আ.) হতে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) - এর নবুয়ত প্রাপ্তি পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কেই অন্ধকার যুগ বলা যায়। কিন্তু এ অভিমত সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, কারণ এ ক্ষেত্রে সকল নবি ও রাসুলকে অস্বীকার করা হয়। হযরত আদম (আ.) হতে মহানবি (সা.)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত বিশ্বের ইতিহাসে যে সকল সভ্য জাতি ও সভ্যতা চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে, সেগুলোকে তমাচ্ছন্ন বলে আখ্যায়িত করা ইতিহাসকে অস্বীকার করা ছাড়া কিছুই নয়।

অপর একদল মনে করেন যে, হযরত ঈসা (আ.)-এর তিরোধানের পর হতে মহানবি (সা.)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় ছয় শতাব্দী কালকে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়। কারণ এ সময় ঐশী জীবনবিধান সম্পর্কে জগৎ সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এ যুগের তমসাকে আরও পরিবর্ধিত করে ও কুসংস্কার এর দিক ধাবিত করে, কিন্তু পরীক্ষার কষ্টিপাথরে এ অভিমতও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ খ্রিস্ট্রীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত দক্ষিণ আরব ও উত্তর আরবে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসায়-বাণিজ্যে শিল্প-সাহিত্য, রাজনৈতিক চেতনাবোধ, অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু ব্যবহার যতখানি উৎকর্ষতা লাভ করেছিল, তাকে অন্ধকার বলে আখ্যায়িত করলে সত্যের অপলাপ করা হবে।

তবে বলা যায়, ইসলাম পূর্ব যুগের আরববাসী বা আরব জাতি বলতে আইয়ামে জাহেলিয়ার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল অর্থাৎ হেজাজ এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসীরা অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের তুলনায় অধিকতর বর্বর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, নৈতিকতাহীন, উচ্ছৃঙ্খল এবং অজ্ঞানতায় নিমজ্জিত ছিল।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় জানা যায় যে, মহানবি (সা.) এর জন্মের প্রাক্কালে উত্তর এবং দক্ষিণ আরবে সমৃদ্ধশালী রাজবংশ স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেছিল। উত্তর আরবের হীরা ছিল একটি সমৃদ্ধশালী নগরী। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) কর্তৃক ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে হীরা অধিকৃত হলে এর সুরম্য হর্মরাজি মুসলিম বাহিনীকে স্তম্ভিত করে তোলে। প্রণিধানযোগ্য যে, পরবর্তীতে কুফা শহর ও মসজিদ সম্প্রসারণে হীরার স্থাপত্য রীতির অনুকরণ করা হয়েছিল। বস্তুত দক্ষিণ আরবের হিমাইয়ারী রাজ্য খিস্ট্রীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর এক বিস্ময়কর প্রতিভা। এ রাজবংশের অহংকারী আবরাহা কাবাগৃহ ধ্বংস করতে গিয়ে নিহত হয়েছিল। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দক্ষিণে আরব মিনাইয়ান, সাবিয়ান ও হিমাইয়ারী সভ্যতাকে অজ্ঞতার আবর্তে নিক্ষেপ করা যায় না। অপরদিকে উত্তর আরবের নুফুদ অঞ্চলে নাবাতিয়ান, পালমিরা ঘাসসানি ও লাখমিদ রাজ্যগুলোর সমৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করলে এগুলোকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন বলা যায় না।

তাছাড়া উত্তর আরবের মরুময় নুফুদ অঞ্চলসহ নজদ ও হিজাজ প্রদেশে মরুচারি বেদুইনদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। অর্ন্তদ্বন্দ্ব, গোত্র কলহ, কাব্যে কুৎসা রচনায় মত্ত রক্তলোলুপ লুটেরা বেদুইনদের মধ্যে পার্শ্ববর্তী সভ্যতার ছোয়া দাগ কাটতে পারেনি। দুর্দমনীয়, দুর্বিনীত অত্যাচারী হিজাজ ও নজদবাসীর ইতিহাস প্রাক-ইসলামি যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়। বিশেষত হিজাজ ও তৎপার্শ্বস্থ এলাকায় নৈরাজ্যের ঘনঘটা বিরাজমান ছিল। হিজাজে প্রচলিত আরবি ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়। এ জন্য অন্ধকার যুগের আরব বলতে হিজাজ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং অন্ধকার যুগ বলতে সে সময়কে বুঝতে হবে।

রাজনৈতিক অবস্থা

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং হতাশাব্যঞ্জক ছিল। কোনো কেন্দ্রীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব না থাকায় আরবে গোত্র প্রাধান্য লাভ করে। তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য ছিল না। গোত্রসমূহের মধ্যে সব সময় বিরোধ লেগেই থাকত।

গোত্রীয় শাসন : অন্ধকার যুগে আরবের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল বিশৃঙ্খলা, স্থিতিহীন ও নৈরাজ্যের অন্ধকারে ঢাকা। উত্তর আরবে বাইজান্টাইনও দক্ষিণ আরবের পারস্য প্রভাবিত কতিপয় ক্ষুদ্র রাজ্য ব্যতীত সমগ্র আরব এলাকা স্বাধীন ছিল। সামান্য সংখ্যক শহরবাসী ছাড়া যাযাবর শ্রেণির গোত্রগুলোর মধ্যে গোত্রপতির শাসন বলবৎ ছিল। গোত্রপতি বা শেখ নির্বাচনে শক্তি, সাহস, আর্থিক স্বচ্ছলতা, অভিজ্ঞতা, বয়োজ্যেষ্ঠতা ও বিচার বুদ্ধি বিবেচনা করা হত। শেখের আনুগত্য ও গোত্রপ্রীতি প্রকট থাকলেও তারা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রতি সর্বদা সচেতন ছিলেন। ভিন্ন গোত্রের প্রতি তারা চরম শত্রুভাবাপন্ন ছিল। গোত্রগুলোর মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি মোটেই ছিল না। কলহ বিবাদ নিরসনে বৈঠকের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। শেখের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক জীবন ধারার ছোয়া থাকলেও শান্তি ও নিরাপত্তার লেশমাত্র ছিল না।

গোত্র-দ্বন্দ্ব : গোত্র কলহের বিষবাষ্পে অন্ধকার যুগে আরব জাতি কলুষিত ছিল। গোত্রের মানসম্মান রক্ষার্থে তারা রক্তপাত করতেও কুণ্ঠাবোধ করত না। তৃণভূমি, পানির ঝর্ণা এবং গৃহপালিত পশু নিয়ে সাধারণত রক্তপাতের সূত্রপাত হত। কখনও কখনও তা এমন বিভীষিকার আকার ধারণ করত যে দিনের পর দিন এ যুদ্ধ চলতে থাকত। আরবিতে একে আরবের দিন (أَيَّامُ الْعَرَبِ) বলে অভিহিত করা হত। আরবের মধ্যে খুনের বদলা খুন, অথবা রক্ত বিনিময় প্রথা চালু ছিল। অন্ধকার যুগের অহেতুক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের নজীর আরব ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। তন্মধ্যে বুয়াসের যুদ্ধ, ফিজার যুদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। উট, ঘোড়দৌড়, পবিত্র মাসের অবমাননা, কুৎসা রটনা করা ইত্যাদি ছিল এ সকল যুদ্ধের মূল কারণ। বেদুইনগণ উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা পাঠ করে যুদ্ধের ময়দানে রক্ত প্রবাহে মেতে উঠত। এ সকল অন্যায় যুদ্ধে জানমালের বিপুল ক্ষতি সাধিত হত। যুদ্ধপ্রিয় গোত্রগুলোর মধ্যে আউস, খাযরায, কুরাইশ, বানু বকর, বানু তাগলিব, আবস ও জুবিয়ান ছিল প্রধান।

সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা

ইসলাম পূর্ব যুগে আরবদের সামাজিক জীবন অনাচার-পাপাচার, দুর্নীতি, কুসংস্কার, অরাজকতা, ঘৃণ্য আচার অনুষ্ঠান এবং নিন্দনীয় কার্যকলাপে পরিপূর্ণ ছিল। আরবেরা মদ নারী ও যুদ্ধ নিয়ে মত্ত থাকত। হযরত মুহাম্মাদ(সা.) সমগ্র আরব দেশকে মূর্খতা, বর্বরতা ও প্রকৃতি পূজায় নিমজ্জিত দেখতে পান। তারা এত বেশি মদ্যপায়ী ছিল যে কোন গর্হিত কাজ করতে তারা দ্বিধাবোধ করত না।

কৌলিন্য প্রথা : তৎকালীন আরবের সমাজ বলতে শহরবাসী ও বেদুইনদের বুঝাতো। এ উভয় সমাজে বিয়ে-শাদী, আচার অনুষ্ঠান বিদ্যমান ছিল। তা ছাড়া রীতি-নীতি ও ধ্যান-ধারণায় উভয় সমাজ একই ধরনের ছিল। বংশগত কৌলিন্য ও গোত্রগত মর্যাদা এত প্রকট ছিল যে অহংকার, হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা সমাজের সর্বত্র বিরাজমান ছিল। বংশ মর্যাদা ও কৌলিন্য প্রথা সংরক্ষণের জন্য কখনও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হত। প্রাকৃতিক কঠোরতার নিষ্পেষণে আরব সমাজে অরাজকতা, কুসংস্কার, নিন্দনীয় কার্যকলাপ ও ঘৃণাপ্রথা অপ্রতিহতভাবে বেড়ে চলছিল। পাপাচার, দুর্নীতি, মদ্যপান নারীগমনের আসক্তি তাদের পেয়ে বসেছিল। বস্তুত তাঁদের জীবনযাত্রা ছিল অভিশপ্ত ও কলুষিত। জনজীবন ছিল বর্বতার শিকার।

নারীর অবস্থান : জাহেলী যুগে আরব সমাজে নারীর স্থান ছিল অতি নিম্নে। সামাজিক মর্যাদা বলতে তাদের কিছুই ছিল না। নারী ছিল ভোগ-বিলাসের সামগ্রী ও অস্থাবর সম্পত্তির মত। অবৈধ প্রণয়, অবাধ মেলামেশা ও একই নারীর বহু স্বামী গ্রহণ প্রথা ব্যাপক ছিল। ব্যভিচার এত জঘন্য আকার ধারণ করেছিল যে, স্বামীর অনুমতিক্রমে কিংবা স্বামীর নির্দেশে অথবা পুত্র সন্তানের আশায় নারীগণ বহু পুরুষের সান্নিধ্যে গমন করতো। বিষয়-সম্পত্তিতে স্ত্রীর কোনো অধিকার ছিল না। নারীদের প্রতি গৃহপালিত পশুর মত ব্যবহার করা হত। নারীও যে মানুষ এ কথা তাদের স্মরণে আসত না।

দাস-দাসীর অবস্থা : প্রাচীনকাল হতেই আরবে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। দাস-দাসীদের জীবন ছিল অত্যন্ত দুর্বিষহ ও করুণ। মানবিক মর্যাদা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা বলতে তাদের কিছুই ছিল না। হাটে বাজারে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের মত দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় হতো। প্রভুর বিনা অনুমতিতে দাস-দাসীগণ বিয়ে করতে পারত না। কিন্তু তাঁদের ছেলে-সন্তানের মালিক হত প্রভু। মুলত ভৃত্য ও ভূমিদাসদের আশা আকাঙ্ক্ষার ক্ষীণ আলোও পরিলক্ষিত হত না। নির্মম অত্যাচারে দাস-দাসীদের নিরাপত্তা দারুণভাবে বিঘ্নিত হত। দাস-দাসীদের মানুষ হিসেবে গণ্য করার কথা তাদের বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল।

জীবন্ত কন্যা সন্তানকে কবরস্থ করা : প্রাক-ইসলামি আরবে জীবন্ত কন্যা শিশুকে কবরস্থ করার নিষ্ঠুর প্রথা প্রচলিত ছিল। দারিদ্রতার ভয়ে বিশেষ করে কন্যা সন্তানকে অভিশপ্ত, লজ্জাজনক ও অপয়া মনে করে জীবন্ত কবর দেওয়া হত। কন্যা সন্তান জন্মদানকারী মাতার ভাগ্যেও নেমে আসত কঠিন অত্যাচারের তীব্র কষাঘাত। এ ঘৃণ্য প্রথার উচ্ছেদ করে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে 'তোমরা দরিদ্রতার-ভয়ে সন্তানদেরকে হত্যা করো না, বস্তুত আমিই তাদের ও তোমাদের জীবিকা সরবরাহ করে থাকি।' (সুরা ইসরা, আয়াতঃ ৩১)

অনাচার, ব্যভিচার ও নৈতিক অবনতি : নৈতিক অবনতি, ব্যভিচার, অনাচার, লুটতরাজ, মদ্যপান, জুয়াখেলা-সুদ, নারীহরণ, ইত্যাদি অপকর্ম আরব সমাজে বিদ্যমান ছিল। সুদ আদায়ে অপারগ হলে সুদ গ্রহীতার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের মালিক মহাজন ক্রীতদাস-দাসী রূপে হস্তগত করে হাটে– বাজারে বিক্রয় করে ফেলত। মোটকথা নারীহরণ, ঋণ প্রথা, কুসিদ প্রথা ও দাসত্ব প্রথার মতো নানাবিধ পাপ পঙ্কিল আরব সমাজকে জর্জরিত করে ফেলেছিল।

ধর্মীয় অবস্থা

জাহেলিয়া যুগে আরবদের ধর্মীয় অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ও অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। আরবে তখন অধিকাংশ লোকই ছিল জড়বাদী পৌত্তলিক। তাদের ধর্ম ছিল পৌত্তলিকতা এবং বিশ্বাস ছিল আল্লাহর পরিবর্তে অদৃশ্য শক্তির কুহেলিকাপূর্ণ ভয়ভীতিতে। তারা বিভিন্ন জড়বস্তুর উপাসনা করত। চন্দ্র, সূর্য, তারকা এমনকি বৃক্ষ, প্রস্তরখণ্ড, কূপ, গুহাকে পবিত্র মনে করে তার পূজা করত। প্রকৃতি পূজা ছাড়াও তারা বিভিন্ন মূর্তির পূজা করত। মূর্তিগুলোর গঠন ও আকৃতি পূজারীদের ইচ্ছানুযায়ী তৈরি করা হতো। পৌত্তলিক আরবদের প্রত্যেক শহর বা অঞ্চলের নিজস্ব দেবীর মধ্যে অন্যতম ছিল আল-লাত, আল-মানাহ এবং আল-উজ্জা। আল-লাত ছিল তায়েফের অধিবাসিদের দেবী, যা চারকোণা এক পাথর। কালো পাথরের তৈরি আল-মানাহ ভাগ্যের দেবী। এ দেবীর মন্দির ছিল মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী কুদায়েদ স্থানে। মদিনার আউস ও খাজরাজ গোত্রের লোকেরা এ দেবীর জন্য বলি দিত এবং দেবীকে সম্মান করত। নাখলা নামক স্থানে অবস্থিত মক্কাবাসীদের অতি প্রিয় দেবী আল-উজ্জাকে কুরাইশগণ খুব শ্রদ্ধা করত।

আরবদেশে বিভিন্ন গোত্রের দেবদেবীর পূজার জন্য মন্দির ছিল। এমনকি পবিত্র কাবা গৃহেও ৩৬০ টি দেবদেবীর মূর্তি ছিল। কাবাঘরে রক্ষিত মূর্তিদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মূর্তির বা দেবতার নাম ছিল হোবল। এটি মনুষ্যাকৃতি ছিল– এর পাশে ভাগ্য গণনার জন্য শর বা তীর রাখা হতো।

উপরিউক্ত দেব-দেবী ছাড়া আরবে আরও পাথরের দেব-দেবীর মূর্তি ছিল। এগুলোর কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে। আরববাসীরা ধর্মীয় কুসংস্কার ও অনাচারে আচ্ছন্ন ছিল। তারা দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে পশু ও নরবলি দিত। মন্ত্রতন্ত্র, যাদু টোনা, ভূত, প্রেত ও ভবিষ্যৎ বাণীতে তারা বিশ্বাসী ছিল।

এ যুগে আরবে পৌত্তলিক ছাড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকও কিছু ছিল। এদের মধ্যে ছিল ইহুদী, খ্রিষ্টান ও হানাফী সম্প্রদায়ের লোক। ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মের লোকেরা আসমানী কিতাবের অধিকারী ও একেশ্বরবাদী বলে দাবী করত। কিন্তু ইহুদীদের বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল না। তারা বিশৃংখলা ও বৈষম্য সৃষ্টিকারী ছিল। অপরপক্ষে খ্রিস্টানরা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী ছিল। আরবে আর এক শ্রেণির বিশ্বাসী লোক ছিল। তারা পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিল। এক সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তা এবং পরলোক সম্বন্ধে তাদের ধারণা ছিল। তারা সৎ জীবন যাপন করত। ওয়ারাকা বিন নাওফেল, যায়েদ বিন আমর, আবু আনাস প্রমুখ এ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এ সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যা এত অল্প ছিল যে তারা আরবদের উপরে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়নি।

অর্থনৈতিক অবস্থা

আরবের অধিকাংশ অঞ্চল মরুময় ও অনুর্বর। অনুর্বর মরুভূমি কৃষি কাজের উপযোগী ছিল না। ফলে খাদ্য দ্রব্যের উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম ছিল। তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুন্নত ছিল।

ভৌগোলিক পরিবেশ এবং জীবিকার ভিত্তিতে ইসলাম পূর্ব যুগে আরববাসীদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। এ ভাগ গুলো হল– (১) কৃষিজীবি (২) ব্যবসায়ী (৩) সুদের কারবারী (৪) কারিগর (৫) মরুবাসী বেদুইন ইত্যাদি।

কৃষিজীবি : আরবের তায়েফ, ইয়েমেন এবং মদিনা অঞ্চলের ভূমিও কৃষির উপযোগী ছিল। এসব অঞ্চলের অধিবাসীরা কৃষিকাজ করত। বানু নাজির ও বানু কুরাইজা দুই ইহুদি গোত্র মদিনার শস্য শ্যামল অঞ্চলে কৃষিকাজে নিয়োজিত ছিল। উর্বর তায়েফ ভূমিতে তরমুজ, খেজুর, ডুমুর, আঙ্গুর, জলপাই, ইক্ষু উৎপন্ন হত।

ব্যবসায়ী : আঞ্চলিক বসবাসের ভিত্তিতে আরবগণ দুভাগে বিভক্ত ছিল। যথা– শহরবাসী আরব এবং মরুবাসী বেদুইন। শহরবাসী আরবের কিছু কিছু গোত্র ব্যবসায় বাণিজ্যে নিয়োজিত থেকে জীবিকা অর্জন করত। মক্কাবাসী কুরাইশ সম্প্রদায় মিসর, সিরিয়া, পারস্য এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করে সম্পদশালী হয়। ইসলাম পূর্ব যুগে হযরত আবুবকর (রা.), হযরত ওসমান (রা.) এবং বিবি খাদিজা (রা.) বিত্তশালী ব্যবসায়ী ছিলেন।

সুদের কারবার : ইসলাম পূর্ব যুগে ধনী আরববাসী বিশেষ করে ইহুদি সম্প্রদায় সুদের ব্যবসা বা কারবারে নিয়োজিত ছিল। দরিদ্র লোকেরা অধিক সুদে ইহুদি ও সুদের ব্যাবসায়ীদের নিকট থেকে ধার গ্রহণ করত। ফলে ঋণ গ্রহণকারীরা সর্বশান্ত হয়ে যেত। কোন কোন সময় ঋণ ও সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হলে নিজ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, বিত্ত-সম্পত্তি সুদ-ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যেত। পরবর্তীতে ইসলামে সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।

কারিগর **সম্প্রদায় :** ইসলাম পূর্ব আরবে পৌত্তলিকতার ব্যাপকতার কারণে মূর্তি তৈরির জন্য এক প্রকার কারিগর শ্রেণির উদ্ভব হয়। এদের আর্থিক অবস্থা ও সামাজিক মর্যাদা ভালো ছিল।

মরুবাসী বেদুইন : মরুবাসী বেদুইনদের জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল লুটতরাজ ও পশুপালন। জীবিকার তাগিদে এসব স্বভাবের বশবর্তী হয়ে তাঁরা ডাকাতি, রাহাজানী ও লুটতরাজ করত।

সাংস্কৃতিক অবস্থা

বর্তমান যুগের ন্যায় প্রাক-ইসলামি যুগে আরবে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা ও সংস্কৃতি না থাকলেও আরবরা সাংস্কৃতিক জীবন হতে একেবারে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাদের ভাষা এত সমৃদ্ধ ছিল যে, আধুনিক ইউরোপের উন্নত ভাষাগুলোর সাথে এর তুলনা করা যায়।

কবিতার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক চেতনা : প্রাক-ইসলামি যুগে লিখন প্রণালির তেমন উন্নতি হয়নি বলে আরবগণ তাদের রচনার বিষয়বস্তুগুলো মুখস্ত করে রাখত। তাঁদের স্মরণ শক্তি ছিল খুব প্রখর। তারা মুখে কবিতা পাঠ করে শুনাত। কবিতার মাধ্যমে তাদের সাহিত্য প্রতিভা প্রকাশ পেত। এ জন্যেই লোক-গাঁথা ও জনশ্রুতির উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে আরব জাতির ইতিহাস লিখিত হয়েছে।

আরব সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন আরবি গীতিকাব্য অথবা কাসীদা সমসাময়িক কালের ইতিহাসে অতুলনীয়। ৫২২ হতে ৬২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রচনার সাবলীল গতি ও স্বচ্ছ বাক্য বিন্যাসে বৈশিষ্ট্য থাকলেও এর বিষয়বস্তু রুচিসম্মত ছিল না। যুদ্ধের ঘটনা, বংশ গৌরব, বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, যুদ্ধের বিবরণ, উটের বিস্ময়কর গুণাবলি ছাড়াও নারী, প্রেম, যৌন সম্পর্কিত বিষয়ের উপর গীতিকাব্য রচনা করা হত। ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, 'কাব্য প্রীতিই ছিল বেদুঈনদের সাংস্কৃতিক সম্পদ।' প্রাক-ইসলামি কাব্য সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ে মিলযুক্ত গদ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কুরআন শরীফে এ ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কাব্য চর্চার রীতির মধ্যে উষ্ট্র চালকের ধ্বনিময় সঙ্গীত (হুদা) এবং জটিলতার ছন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কাসীদা ছিল একমাত্র উৎকৃষ্ট কাব্যরীতি। বসুস যুদ্ধে তাঘলিব বীর মুহালহিল সর্বপ্রথম দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন। জোরালো আবেগময় সাবলীল ভাষা ও মৌলিক চিন্তা ধারায় এটি ছিল পুষ্ট।

উকাজের সাহিত্য মেলা : প্রাক-ইসলামি যুগে আরবদের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের বাগ্মিতা। জিহ্বার অফুরন্ত বাচন শক্তির অধিকারী প্রাচীন আরবের কবিরা মক্কার অদূরে উকাজের বাৎসরিক মেলায় কবিতা পাঠের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতেন। উকাজের বাৎসরিক সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত সাতটি ঝুলন্ত কবিতাকে 'আস্-সাবউল মুআল্লাকাত' (اَلسَّبْعُ الْمُعَلَّقَاتُ) বলা হয়। হিট্টি উকাজের মেলাকে আরবের Academic francaise বলে আখ্যায়িত করেন। তখনকার যুগের কবিদের মধ্যে যশস্বী ছিলেন উক্ত সাতটি ঝুলন্ত গীতি কাব্যের রচয়িতাগণ। সোনালী হরফে লিপিবদ্ধ এ সাতটি কাব্যের রচনা করেন আমর ইবনে কুলসুম, লাবিদ ইবন রাবিয়া, আনতারা ইবন শাদদাদ, ইমরুল কায়েস, তারাফা ইবনে আবদ, হারিস ইবনে হিলজা ও জুহাইর ইবন আবি সালমা। এদের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভাশালী ছিলেন ইমরুল কায়েস। তিনি প্রাক-ইসলামি যুগের শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা লাভ করেন। ইউরোপীয় সমালোচকগণও তার উৎকৃষ্ট শব্দ চয়ন, সাবলীল রচনাশৈলী, চমকপ্রদ স্বচ্ছ লহরীতে মুগ্ধ হয়ে তাকে আরবের শেক্সপীয়র বলে আখ্যায়িত করেন। আরবি ভাষায় এরূপ উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনে হিট্টি মন্তব্য করেন, 'ইসলামের জয় অনেকাংশে একটি ভাষার জয়, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে একটি ধর্মগ্রন্থের জয়।'

সাহিত্য আসরের আয়োজন : তৎকালীন আরবে সাহিত্য চর্চায় আরবদের আগ্রহ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। অনেক সাহিত্যমোদী আরব নিয়মিত সাহিত্য আসরের আয়োজন করতেন। সাহিত্য আসরের উদ্যোক্তাদের মধ্যে তাকিব গোত্রের ইবনে সালামায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রতি সপ্তাহে তিনি একটি সাহিত্য আসরের আয়োজন করতেন। আরবদের সাহিত্য প্রীতির কথার উল্লেখ করে ঐতিহাসিক হিট্টি বলেছেন, 'পৃথিবীতে সম্ভবত অন্যকোনো জাতি আরবদের ন্যায় সাহিত্য চর্চায় এতবেশি স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ প্রকাশ করেনি এবং কথিত বা লিখিত শব্দ দ্বারা এত আবেগাচ্ছন্ন হয়নি।' এ সমস্ত সাহিত্য আসরে কবিতা পাঠ, সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা ও সমালোচনা অনুষ্ঠিত হত।

কবিতার বিষয়বস্তু : প্রাক-ইসলামি যুগের সাহিত্যিকগণ তাদের গোত্র ও গোত্রীয় বীরদের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, যুদ্ধের বিবরণ, উটের বিস্ময়কর গুণাবলি, বংশ গৌরব, অতিথি পরায়ণতা, নরনারীদের প্রেম, নারীর সৌন্দর্য, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করতেন। তাদের এ সকল কবিতা সুদূর অতীতকালের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি প্রাক-ইসলামি আরবদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করে।

মহানবি (সা.)-এর আবির্ভাব : অজ্ঞতা যুগের পাপ পঙ্কিল সমাজ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মীয় মতবাদ, রাজনৈতিক বিশৃংখলা, অরাজকতা, অভিশপ্ত প্রথা ও অনুষ্ঠানের কথা বললে স্থান ও কাল সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ, আরবদের অজ্ঞতা বা বর্বরতার যুগ বলতে হযরত মুহাম্মাদ(সা.)-এর নবুয়ত লাভের(৬১০ খ্রি.) পূর্বে হিজাজের অবস্থাকে বুঝায়। সামগ্রিকভাবে সমস্ত আরবের প্রাক-ইসলামী যুগকে কখনই বর্বরতার যুগ বলা যেতে পারে না। আল্লাহর প্রেরিত মহাপুরুষের একত্ববাদের আদর্শ হতে বিচ্যুত হয়ে মানবজাতি এক সংকটজনক ও অভিশপ্ত অবস্থায় পতিত হয়। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে ইহুদীগণ ধর্মগুরুর প্রদর্শিত পথ ও একত্ববাদের পথ ভুলে পৌত্তলিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে। খ্রিষ্টানগণ হযরত ঈশা (আ.) এর প্রচারিত ধর্মমত হতে বিচ্যুত হয়ে ত্রিত্ববাদে (Trinity) বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। দক্ষিণ আরবে খ্রিষ্টান, ইহুদী ও পরবর্তীকালে জরথুস্ট্র ধর্মের প্রভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক নৈরাশ্যজনক পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই চরম দুর্গতিসম্পন্ন জাতিকে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করার জন্য একজন মহাপুরুষের আবির্ভাব অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। আমীর আলীর ভাষায় 'পৃথিবীর ইতিহাসে পরিত্রাণকারী আবির্ভাবের এত বেশি প্রয়োজন এবং এমন উপযুক্ত সময় অন্যত্র অনুভূত হয়নি।' অবশেষে আল্লাহ মানব জাতিকে হেদায়তের জন্য হযরত মুহাম্মাদ(সা.)-কে শ্রেষ্ঠ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি রূপে বিশ্বে প্রেরণ করলেন। শুধু আরবের নয়, বরং সমগ্র বিশ্বে কুসংস্কারের কুহেলিকা ভেদ করে তৌহিদের বাণী প্রচার করার জন্য তিনি মক্কায় ভূমিষ্ঠ হন। তিনি অনন্ত কল্যাণ ও স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আপোষহীন তৌহিদের প্রতীক। এ সম্বন্ধে হিট্টি বলেন, 'মহান ধর্মীয় ও জাতীয় নেতার আবির্ভাবের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হয়েছিল এবং সময়ও ছিল মনস্তাত্ত্বিকতাপূর্ণ।'

(খ) হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর মাক্কিজীবন (৫৭০-৬২২ খ্রিষ্টাব্দ)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
আবির্ভাব ও পরিচয়

সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও সর্বশেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ(সা.)-এর আবির্ভাব কাল ছিল জাহিলিয়াতের যুগে। তখন আরব উপদ্বীপসহ সমগ্র পৃথিবী অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সে সময়ে মিথ্যা, পাপাচার, হত্যা, লুণ্ঠন, মদ্যপান, জুয়া, যৌন অনাচার, কথায় কথায় ঝগড়া-বিবাদ এমনকি যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্যন্ত ঘটে যেত। কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তাদেরকে হত্যা করা হত বা জীবন্ত পুঁতে ফেলা হত। মানবতা বলতে যা বোঝায় তা ছিল তাদের মধ্যে অনুপস্থিত। এক কথায়, মানুষ আল্লাহর বিধান এবং রাসুলগণের আদর্শ ও সত্যের বাণী ভুলে গিয়ে পাশবিকতায় লিপ্ত ছিল মানবতার এ চরম দুর্দিনে আরবের মক্কা নগরে বিখ্যাত কুরাইশ বংশে আল্লাহ তাআলা হযরত মুহাম্মাদ(সা.) কে পাঠালেন বিশ্ব মানবতার মুক্তি ও শান্তির দূত হিসেবে। অংশীদারিতা, পৌত্তলিকতা ও জড় পূজা থেকে মানবজাতিকে একত্ববাদের ও ন্যায়ের পথ প্রদর্শন করতে। বিশ্বের নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত মানুষকে মুক্তি দিতে। মুক্তি ও শান্তির দূত হযরত মুহাম্মাদ(সা.) -এর মধ্যে ছিল সকল মানবিক গুণাবলির বিকাশ। তাই তিনি সমগ্র বিশ্বের মানুষের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক। তিনি ছিলেন মানব জাতির জন্য রাহমাতুল্লিল আলামিন।

হযরত মুহাম্মাদ(সা.) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ১২ রবিউল আউয়াল তারিখে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তিনি পিতৃহারা হন। নবুয়ত লাভ পর্যন্ত ৪০ বছর এবং নবুয়ত লাভের পর থেকে মদিনায় হিজরত পর্যন্ত ১৩ বছর মোট ৫৩ বছর তিনি পবিত্র ভূমি মক্কায় কাটান। এই সময়কে তাঁর মাক্কি জীবন নামে আখ্যায়িত করা হয়। মদিনায় হিজরত করে মহানবি (সা.) মাত্র দশ বছর জীবিত ছিলেন এবং তিনি মদিনায় অবস্থান করেছিলেন। মদিনায় অবস্থানকালীন ১০ বছর সময়কে হযরতের মাদানি জীবন নামে আখ্যায়িত করা হয়। হযরত মুহাম্মাদ(সা.)-এর সমস্ত জীবনটাই ছিল সংগ্রামমুখর। নবুয়ত লাভের পর থেকে স্বজাতির স্বার্থান্ধ ব্যক্তিরা তাঁকে সহজে মেনে নেয়নি। নানা নির্যাতন, নিপীড়ন ও অত্যাচারে তারা হযরত মুহাম্মাদ(সা.)-এর জীবনকে বিষময় করে তুলেছিল। তা সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মাদ(সা.) সফল হয়েছিলেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্ময়করভাবে। তাঁর আদর্শিক বিপ্লবে উদ্ভাসিত হয় বিশ্ব মানবতা। আলোকিত হয় মানব ও মানব সভ্যতা।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বংশ তালিকা
হযরত ইব্রাহিম (আ.)
হযরত ইসমাইল (আ.)
আদনান
মাআদ
ফিহ্‌র (কুরাইশ)
কা'ব
মুররা
কুশাই
আবদুদ্‌দার
আব্‌দ মানাফ
আবদুস শামস
মুত্তালিব
হাশিম
উমাইয়া
হারব
আবু সুফিয়ান
মু'আবিয়া এবং
পরবর্তী উমাইয়া
খলিফাগণ
আবদুল মুত্তালিব
আবদুল্লাহ
আল হারিস
আবু লাহাব
আব্বাস
হামজা
হযরত মুহাম্মদ (স.)
কন্যা ফাতিমা
আবু তালিব
আলী
আবদুল্লাহ
আলী
মুহম্মদ
ইব্রাহিম
আবুল আব্বাস
আস্‌সাফ্‌ফাহ্‌
আবু জাফর
আলমনসুর এবং
পরবর্তী আব্বাসীয়
খলিফাগণ
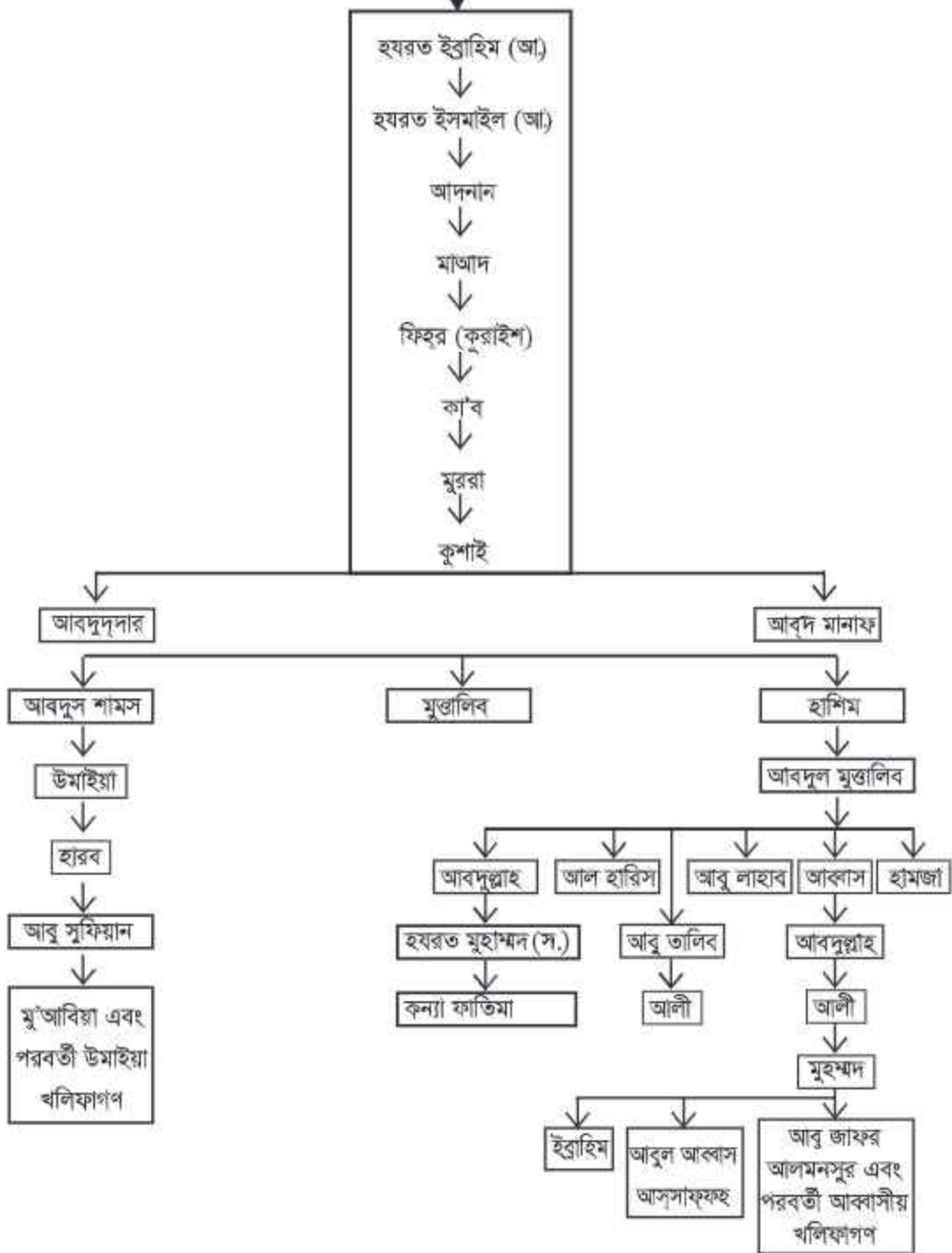
মহানবি (সা.)-এর বংশ পরিচিতি

মুসলিম জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.) এর পুত্র ইসমাঈল (আ.) এর বংশের উত্তর পুরুষগণ কুরাইশ নামে খ্যাত। হযরত ইসমাঈল (আ.) এর বংশধর ফিহরের অপর নাম ছিল কুরাইশ। তাঁর নামানুসারে গোত্রের নাম রাখা হয় কুরাইশ। তাঁর বংশধরগণ কুরাইশ নামে পরিচিত। কুরাইশ শব্দের অর্থ সওদাগর। তৎকালে আরবের মধ্য কুরাইশগণ ব্যবসায়-বাণিজ্যে অন্যান্য গোত্র থেকে উন্নতি সাধন করেছিল ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মক্কায় তাদের ছিল একচ্ছত্র প্রাধান্য। ফলে মক্কায় তাঁরা সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। ফিহর খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। তাঁরই উত্তর পুরুষ কুশাই খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে মক্কা এবং হিজাযে প্রাধান্য বিস্তার করেন। তিনি কাবাগৃহের সংস্কার এবং তীর্থ যাত্রীদের সেবা-যত্ন করায় প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ধর্মীয় ও পার্থিব বিষয়ে আরবদের নেতা ছিলেন। ৪৮০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করলে তাঁর পুত্র আবদুদ্দার মক্কার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। আবদুদ্দারের মৃত্যুর পর আব্দুল মানাফ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র আবদুদ্দারের পৌত্রগণ কাবা ঘরের রক্ষণাবেক্ষণ ও দারুণ নাদওয়া বা পরামর্শ সভাগৃহের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব লাভ করেন। আব্দুস শামসের পর তাঁর ভাই হাশিম এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই মুত্তালিব শাসনভার গ্রহণ করেন। মুত্তালিব বীরত্ব ও দানশীলতার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন।

৫২০ খ্রিষ্টাব্দে দয়ালু ও দানশীল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র শায়বাকে মক্কার সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, শায়বাকে দয়ালু মুত্তালিবের ক্রীতদাস মনে করে তাঁর নাম দেয়া হয় আবদুল মুত্তালিব। ইসলামের ইতিহাসে তিনিই আবদুল মুত্তালিব নামে পরিচিত। তাঁর শাসনামলে ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দে আবিসিনিয়ায় বাদশাহ আবরাহা মক্কা নগরী আক্রমণ করে। আবরাহা হাতির পিঠে আরোহণ করে মক্কায় যুদ্ধ যাত্রা করেন বলে এ বছরকে হস্তিবর্ষ বা 'আ-মুল ফিল' (عَامُ الْفِيْلِ) বলা হয়। মহান আল্লাহর নির্দেশে একদল আবাবিল পাখি ছোট ছোট পাথর কনা নিক্ষেপ করে আবরাহার বাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়। পবিত্র কুরআন শরীফের 'সূরা আল ফীলে' এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আবদুল মুত্তালিব অপরিসীম কার্যক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি ৫৯ বছর বয়সে মক্কায় ক্ষমতাসীন থাকাকালে মৃত্যুবরণ করেন। আবদুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে ১২ জন পুত্র এবং ৬ কন্যা সন্তান ছিল। পুত্রগণের মধ্যে আবু তালেব, আব্বাস, হামজা এবং আবদুল্লাহ ইসলামের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আব্বাস হলেন আব্বাসীয়া বংশের পূর্ব পুরুষ।

আবদুল মুত্তালিবের কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ ছিলেন বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর পিতা। তিনি মদিনার বানু জোহরা গোত্রের নেতা আবদুল ওয়াহাবের কন্যা বিবি আমিনাকে বিয়ে করেন। বিবাহের কিছুদিন পর আবদুল্লাহর ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। কিন্তু বাণিজ্য থেকে ফেরার পথে মদিনার উপকণ্ঠে অসুস্থ হয়ে মাত্র ২৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। বিবি আমিনা তখন গর্ভবতী ছিলেন। আবদুল্লাহর মৃত্যুর পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্ম ও প্রাথমিক জীবন

আল্লাহর প্রেরিত সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বিশ্বনবি নিখিল বিশ্বের অনন্ত কল্যাণ ও আশীর্বাদের মূর্ত প্রতীক হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল সোমবার আরবের মক্কা নগরে সম্ভ্রান্ত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল্লাহ এবং মাতার নাম বিবি আমিনা। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর উর্ধ্বতন একাদশ পুরুষের নাম ছিল ফিহর। তিনি কুরাইশ নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। এ কারণে তাঁর বংশধর কুরাইশী নামে খ্যাতি লাভ করে।

নামকরণ : হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তাঁর পিতা আবদুল্লাহ বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় গমন করেন। বাণিজ্য শেষে সিরিয়া থেকে ফেরার পথে মদিনার উপকণ্ঠে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। হযরতের দাদা ছিলেন আবদুল মুত্তালিব। হযরতের জন্মের পর দাদা আবদুল মুত্তালিব নবজাত শিশুর লালন-পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং শিশুটির নাম রাখেন 'মুহাম্মাদ' অর্থাৎ'প্রশংসিত'। মাতা আমিনা তাকে আদর করে ডাকতেন 'আহমদ' বলে।

ধাত্রী গৃহে গমন : মহানবি (সা.) জন্মের পর প্রথম সাত দিন নিজ মায়ের দুধ পান করেন। অতঃপর আরবের প্রথানুযায়ী শিশু মুহাম্মাদ (সা.) কে লালন-পালনের জন্যে সাদ গোত্রের বিবি হালিমাকে ধাত্রী নিযুক্ত করা হয়। তিনি পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত বিবি হালিমার গৃহে লালিত-পালিত হন। সেখানে অবস্থানকালে তৎকালীন আরব সমাজের মধ্যে বিশুদ্ধ আরবি ভাষা আয়ত্ত করেন।

প্রথম বক্ষ বিদীর্ণ বা সিনা চাক : বিবি হালিমার গৃহে লালিত-পালিত হওয়ার সময় হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বয়স যখন চার বছর মাত্র তখন দু'জন ফিরিশতা এসে তাঁর সিনা চাক করে নবুয়ত লাভের উপযোগী করে তোলেন এবং অন্তরের সমস্ত ব্যাধি দূর করে দেন।

মাতৃক্রোড়ে বালক মুহাম্মাদ (সা.): হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বয়স যখন ছয় বছর তখন তিনি মাতা আমিনার কাছে ফিরে আসেন। তাঁর এ মাতৃ সান্নিধ্য বেশিদিন স্থায়ী হল না, তিনি মক্কা থেকে পিতা আবদুল্লাহর কবর যিয়ারত করার জন্য মায়ের সাথে মদিনায় গমন করেন। মদিনা থেকে ফেরার পথে 'আবওয়া' নামক স্থানে মাতা আমিনা অসুস্থ হয়ে সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। এ সময় দাসী উম্মে আইমন তাঁকে মক্কায় নিয়ে এসে তাঁর দাদা আবদুল মুত্তালিবের কাছে পৌঁছে দেন। আবদুল মুত্তালিবের কাছে মাত্র দু'বছর লালিত পালিত হন। পরে ৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দাদাকেও হারান।

চাচার অভিভাবকত্বে বালক মুহাম্মাদ (সা.): দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর নবিজির লালন-পালনের দায়িত্ব পড়ে চাচা আবু তালিবের ওপর। চাচা আবু তালিব বালক মুহাম্মাদ (সা.) কে যথাসাধ্য আদর-যত্নে প্রতিপালন করতে থাকেন। কিন্তু আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় মুহাম্মাদ (সা.)কে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। তাঁকে চাচার উট ও মেষ চরাতে হতো এবং অবসর সময়ে তিনি মক্কায় তীর্থ যাত্রীদের পানি পান করাতেন। এ সকল কাজ-কর্মে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও তিনি অশ্ব চালনা, বর্শা চালনা, তলোয়ার চালনা প্রভৃতি শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১০ বছর বয়সে তাঁর দ্বিতীয় বার সিনা চাক হয়।

সিরিয়া গমন : বার বছর বয়সে বালক মুহাম্মাদ (সা.) চাচা আবু তালেবের সঙ্গে ৫৮২ খ্রিষ্টাব্দে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া গমন করেন। এ পরিভ্রমণে খোদাদ্রোহী সামুদ জাতির ধ্বংসাবশেষ অবলোকন ও প্রাকৃতিক অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনে তাঁর মন এক পরম সত্তার সান্নিধ্য পাবার আগ্রহ প্রকাশ করে। কথিত আছে, সিরিয়া যাত্রাকালে পাদ্রী বুহাইরা বালক মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রতিশ্রুত শেষ নবি হিসেবে চিনতে পারেন। তিনি তাঁর চাচাকে নবির ব্যাপারে ইহুদি খ্রিষ্টানদের হতে সতর্ক করে দেন। বালক মুহাম্মাদ (সা.) প্রথমবারের মত জন্মভূমির বাইরে গমন করে বিশাল পৃথিবী এবং ব্যাপক কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন। রাসুল (সা.) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে তিনবার সিরিয়া গমন করেছিলেন।

আল-আমীন উপাধি লাভ : বাল্যকাল থেকেই হযরত মুহাম্মাদ (সা.) চিন্তাশীল ছিলেন। মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় তাঁর মন ব্যথিত হত। তাঁর স্বভাব ছিল নরম-প্রকৃতির। তিনি সর্বদা সত্য কথা বলতেন, তাই তিনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

তিনি কখনও অন্যায় আচরণ করতেন না। এমনকি বাল্যকাল থেকেই 'লাত' ও 'উযযার' নামে কোন বিশেষ কাজ করার কথা হলে তিনি বলতেন' এ মূর্তিগুলোর দোহাই দিয়ে তোমরা আমাকে কিছুই বলো না। **হযরত মুহাম্মাদ (সা.)**-এর কর্মনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, নম্রতা, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি গুণাবলির জন্য সকলে তাঁকে ভালোবাসত এবং 'আল-আমীন' উপাধি দিয়েছিলেন।

হারবুল ফুজ্জারে অংশগ্রহণ : চাচা আবু তালিবের সঙ্গে সিরিয়া থেকে মক্কায় ফিরে আসার কিছুদিন পরেই শুরু হল বিখ্যাত মেলা। এ মেলায় জুয়া খেলা, ঘোড়াদৌড় ও কাব্য প্রতিযোগিতা নিয়ে শুরু হয় এক ভয়াবহ যুদ্ধ। এ যুদ্ধ "হারবুল ফুজ্জার" বা অন্যায় সমর বা পাপাচারীদের সমর নামে পরিচিত। এ যুদ্ধ পাঁচ বছরকাল স্থায়ী হয়েছিল এবং এতে অনেক লোকে প্রাণ হারিয়েছিল। যেহেতু এ যুদ্ধ কুরাইশ ও কায়েস বংশের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল, সেহেতু হযরত **মুহাম্মাদ (সা.)**- কে তাঁর চাচা আবু তালিবের সাথে ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়েছিল। এ যুদ্ধে তিনি নিক্ষিপ্ত তীর সংগ্রহ করে চাচার হাতে তুলে দিতেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

হিলফ-উল-ফুজুল

ফুজ্জার যুদ্ধের বীভৎসতা ও সহিংসতা দেখে তাঁর মন অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়ল। তিনি আর্ত-পীড়িত, অসহায়, গরিব, দুর্বল ও অত্যাচারিতকে জালিম ও ধনীদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে এবং আরবে শান্তি বজায় রাখার জন্যে কতিপয় শান্তিপ্রিয় যুবকদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন, ইতিহাসে এটি 'হিলফ-উল-ফুজুল' বা 'শান্তি সংঘ' নামে পরিচিত। এ সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল–

১. নিঃস্ব, অসহায় ও দুর্গতদের সেবা করা

২. অত্যাচারিতকে সাহায্য করা ও অত্যাচারীকে বাধা দেয়া

৩. শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা

৪. বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করা

৫. বিদেশি বণিকদের ধনসম্পদের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করা ইত্যাদি।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বিবাহ

হিলফ-উল-ফুজুলের মাধ্যমে মানব কল্যাণকামী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি নিজেকে এ সংঘের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করলেন। সকলের কাছে তাঁর সরলতা, সততা, সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা ও চারিত্রিক গুণাবলির কথা আলোচিত ও প্রশংসিত হতে লাগল। এ সুনাম কুরাইশ বংশের এক বিধবা নারী বিবি খাদিজার কাছেও পৌছল। বিবি খাদিজা বিপুল ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন। অপরদিকে রূপে, গুণে ও বংশের মর্যাদায় তিনি হিজাজের মধ্যে অদ্বিতীয়া ছিলেন। চরিত্রের পবিত্রতা ও স্বাভাবিক শুদ্ধাচারের জন্যে বিবি খাদিজা আরব দেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এজন্য মক্কাবাসীরা তাকে 'খাদিজাতুত তাহিরা' বা নিষ্কলঙ্ক খাদিজা নামে অভিহিত করেছিল।

বিবি খাদিজা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রথমে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন এবং ক্রমশ তাঁর চরিত্র মাধুর্য, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। আবু তালিবের অনুমতি নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) খাদিজাকে স্ত্রী হিসেবে বরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২৫ বছর এবং বিবি খাদিজার

বয়স ছিল ৪০ বছর। হযরত **মুহাম্মাদ (সা.)** দীর্ঘ ২৫ বছর কাল বিবি খাদিজার সাথে সংসার ধর্ম পালন করেন এবং খাদিজার জীবদ্দশায় তিনি অন্য কোনো স্ত্রী গ্রহণ করেন নি। খাদিজার গর্ভে হযরতের তিন পুত্র হযরত কাসেম, আবদুল্লাহ তৈয়ব ও তাহের এবং চার কন্যা হযরত ফাতেমা, রোকাইয়া, কুলসুম এবং যয়নাবের জন্ম হয়েছিল। তিন পুত্র শৈশবেই মারা যান কিন্তু কন্যাগণ জীবিত ছিলেন। রোকাইয়া এবং কুলসুমের সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর বিবাহ হয় সেজন্য হযরত উসমানকে যুননুরাইন (ذُوْ النُّوْرَيْنِ) বা দু'জ্যোতির অধিকারী বলা হয়। সর্ব কনিষ্ঠা মেয়ে হযরত ফাতিমা (রা.) সাথে হযরত আলী (রা.)-এর বিবাহ হয়। আবু তালিবের অসচ্ছলতার জন্যে হযরত আলী মুহাম্মাদ (সা.) এর গৃহে লালিত-পালিত হন।

বিবি খাদিজার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় হযরত মুহাম্মাদ (সা.) জীবনধারণের সংগ্রামে অবতীর্ণ হন নি। স্ত্রী বিত্তশালী হওয়ায় ভবিষ্যত কর্মপন্থা নির্ধারণে, স্থির চিত্তে, সূক্ষ্মভাবে চিন্তার অবকাশ ও সুযোগ ঘটে। হযরতের নবুয়্যতের বিকাশ ও সার্থকতার জন্য বিবি খাদিজার সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল।

হাজরে আসওয়াদ স্থাপন

মক্কার কাবাঘর পৃথিবীব্যাপী চির প্রসিদ্ধ। এর নাম বাইতুল্লাহ (بَيْتُ اللّٰهِ)। এ গৃহটি হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সময় হতেই বিশ্বের সর্বপ্রধান এবাদত খানা রূপে পরিগণিত ছিল। মানুষ আল্লাহকে ভুলে গিয়ে অন্ধ-কুসংস্কারের মোহে পড়ে এই পবিত্র গৃহে বহু দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপন করা সত্ত্বেও একে আল্লাহর ঘর হিসেবে বিশ্বাস করত। কাবা গৃহটি সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিলে কুরাইশ বংশের সকল গোত্র একত্রিত হয়ে নতুন করে কাবাগৃহ নির্মাণ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়। তাঁরা সকলে মিলে কাবা গৃহের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত করেন। কিন্তু হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরটি কে যথাস্থানে স্থাপন করবেন তা নিয়ে মহা বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। পাথরটির সাথে সামাজিক মর্যাদা ও বংশগত প্রাধান্যের বিষয় সম্পৃক্ত ছিল। প্রত্যেক গোত্রের লোকই দাবি করতে লাগল যে, তাঁরাই পাথরটি স্থাপনের একমাত্র অধিকারী। প্রথমে বচসা, অতঃপর তুমুল দ্বন্দ্ব কলহ শুরু হল। এভাবে চারদিন অতিবাহিত হয়ে গেল কিন্তু মীমাংসার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তখন আরবের চিরাচরিত প্রথানুসারে সকলে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেল। যুদ্ধ যখন একেবারে অনিবার্য হয়ে পড়ল, তখন জ্ঞানবৃদ্ধ আবু উমাইয়া সকলকে আহবান করে বললেন, স্থির হও, স্থির হও, আমার কথা শোন। বৃদ্ধের গভীর মর্ম বেদনাপূর্ণ গম্ভীর আহবানে সকলে ফিরে দাঁড়াল। তখন তিনি সকলকে বুঝিয়ে বললেন এবং প্রস্তাব দিলেন : 'যে ব্যক্তি আগামীকাল সর্বপ্রথম কাবা গৃহে প্রবেশ করবে তিনিই এ বিবাদের ফয়সালা দেবেন। তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন সকলেই তা মেনে নেবে।' এ প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হল। প্রথম আগন্তুক আগমনের প্রতীক্ষায় সকলেই উদগ্রীব রইলেন এবং কাবা ঘরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

এমন সময় শতকণ্ঠে আনন্দ রোল উঠল এইত আমাদের 'আল-আমীন' উপস্থিত। আমরা সকলেই তাঁর মীমাংসায় সম্মত। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তখন তাদের মুখ থেকে সকল ঘটনা শুনলেন এবং নিজের বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তিনি তাঁর সমাধান দিলেন। তিনি একখানা চাদর বিছিয়ে নিজে পাথরটি এর মধ্যস্থলে স্থাপন করেন এবং বিদ্যমান সকল গোত্রের প্রতিনিধিগণকে বললেন এবার আপনারা প্রত্যেকেই এর চাদরের এক এক প্রান্ত ধরে পাথরটিকে যথাস্থানে নিয়ে আসুন। সকলেই তা করলেন। তখন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পুনরায় পাথরটি নিজ হাতে তুলে যথাস্থানে বসালেন। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৫ বছর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
ওহি নাযিল

বিবি খাদিজার সাথে বিয়ের পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আর্থিক চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে প্রতি বছর একমাস মক্কার অদূরে হেরা নামক পর্বতের গুহায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি ৪০ বছর বয়সে ৬১০ খ্রিষ্টাব্দের রমযান মাসের ২৭ তারিখে হেরা গুহায় হযরত জিবরাইল (আ.)-এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকট থেকে ওহি প্রাপ্ত হন। এই আলৌকিক ঘটনার কথা জানতে পেরে বিবি খাদিজা তাঁকে যথেষ্ট সাহস, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান করেন। হযরত খাদিজা (রা.) রাসুল (সা.) এর নিকট পূর্বাপর সকল ঘটনা শুনে বিশ্বাস করে মুসলমান হলেন। তিনিই মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী।

নবুয়ত লাভের মধ্যদিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হল। নবুয়ত প্রাপ্তির পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বিপথগামী পৌত্তলিক মক্কাবাসীর নিকট ইসলাম প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি ঘোষণা করেন আল্লাহ্ ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই এবং **মুহাম্মাদ (সা.)** তাঁর প্রেরিত রাসুল। তিনি আরও বলেন, ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম এবং আল-কুরআন মানুষের হিদায়াতের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছে।

হযরত **মুহাম্মাদ (সা.)** সত্য প্রচারে ব্রতী হলেন। প্রথম তিন বছর গোপনে প্রচারকার্য করেন। সর্বপ্রথম মুসলমান হলেন তাঁর সহধর্মিনী হযরত খাদিজা (রা.)। তারপর মুক্ত গোলাম হযরত যায়েদ, হযরত বিল্লাল, হযরত উসমান, হযরত আবদুর রহমান, হযরত সা'দ, হযরত তালহা, হযরত যুবাইর প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ইসলাম গ্রহণ ও আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেন।

পবিত্র কুরআন অবতরণ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ইসলামি জীবন দর্শনের মৌল উৎস ও মহান আল্লাহর বাণী। এটি দুনিয়ার প্রচলিত কোন ধর্মীয় পুস্তক বা মানব রচিত কোন গ্রন্থের মত গ্রন্থ নয়। এটি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশ্ব মানবতার হিদায়াতের জন্য তাঁর মনোনীত শ্রেষ্ঠবান্দা ও সর্বশেষ রসুল হযরত **মুহাম্মাদ (সা.)** এর নিকট বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে অবতারিত প্রত্যক্ষ ওহির সমষ্টি। যা নবি জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছর ব্যাপী নাযিল হয়। এটি ইসলামি শরিয়তের মূলনীতি, সমগ্র বিধি-বিধানের উৎস। এর ভাষা সহজ, কাব্যিক সাবলীল, মর্মস্পর্শী অলংকারময় ও অনুপম। বিশ্বনবি হযরত **মুহাম্মাদ (সা.)**-এর প্রতি পবিত্র কুরআন নাযিলের পূর্বে এটা লাওহে মাহফুজে সুরক্ষিত ছিল। মহান আল্লাহ বলেন 'নিশ্চয়ই ইহা সম্মানিত কুরআন, লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত' (সুরা ওয়াকিয়াঃ ৭৯)।

মহানবি (সা.)-এর প্রতি কুরআন নাযিলের পদ্ধতি

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী জানা যায় যে, কুরআন মাজিদ হযরত জিবরাইল আমীন (আ.) এর মাধ্যমে মহানবি (সা.)-এর কাছে অবতীর্ণ হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন- 'এই কুরআন তো বিশ্ব প্রভুর নিকট থেকে অবতীর্ণ। বিশ্বস্ত ফেরেশতা একে নিয়ে অবতরণ করেছেন '(সুরাঃ শুআরা ১৯২-৯৩)। আল্লাহ্ পাক আরো বলেন- 'রুহুল কুদ্দুস তথা পবিত্র আত্মা ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) হযরত **মুহাম্মাদ (সা.)**-এর প্রভুর নিকট হতে সঠিকভাবে এটা আনয়ন করেছেন।' (সুরা নাহল: ১০২)

প্রথম পর্যায়ে 'লাওহে মাহফুজ' থেকে সম্পূর্ণ কুরআন মজিদ একই সাথে নাযিল হল রমযান মাসের কদর রজনীতে পৃথিবী সংলগ্ন আসমানে তথা বাইতুল ইয্যাতে। এ মর্মে আল্লাহ্ বলেন- 'নিশ্চয়ই আমি কুরআনকে কদর রজনীতে নাযিল করেছি।' (সূরা কদর : ১)। মহানবি স্বয়ং বলেন- 'লাওহে মাহফুজ হতে কুরআন মজিদকে প্রথমে পৃথিবীর আকাশে বাইতুল ইযযাতে রাখা হয়।' হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন- 'কদর রজনীতে সম্পূর্ণ কুরআন পৃথিবীর আকাশে এক সঙ্গে অবতীর্ণ হয়।' অতঃপর প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে তথা হতে ফেরেশতা জিবরাইল (আ.)-এর মারফতে প্রকাশ্যে ওহি যোগে মহানবি (সা.)-এর প্রতি দুনিয়াতে অবতীর্ণ হয়। নবি জীবনের সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানব জাতির প্রয়োজনের তাকীদে অবস্থার ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের আয়াত ও সূরা পর্যায়ক্রমিকভাবে অবতীর্ণ হয়। এটা অন্যান্য আসমানী কিতাবের মতো এক সঙ্গে সম্পূর্ণ নাযিল না হওয়ার তাৎপর্যও রয়েছে।

সর্বপ্রথম ৬১০ খ্রিষ্টাব্দে নবি কারিম (সা.)-এর ৪০ বছর বয়সে 'জাবালুন নুর' এর হেরা গুহায় লাইলাতুল কদর রজনীতে' সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তখন তিনি হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় ছিলেন।
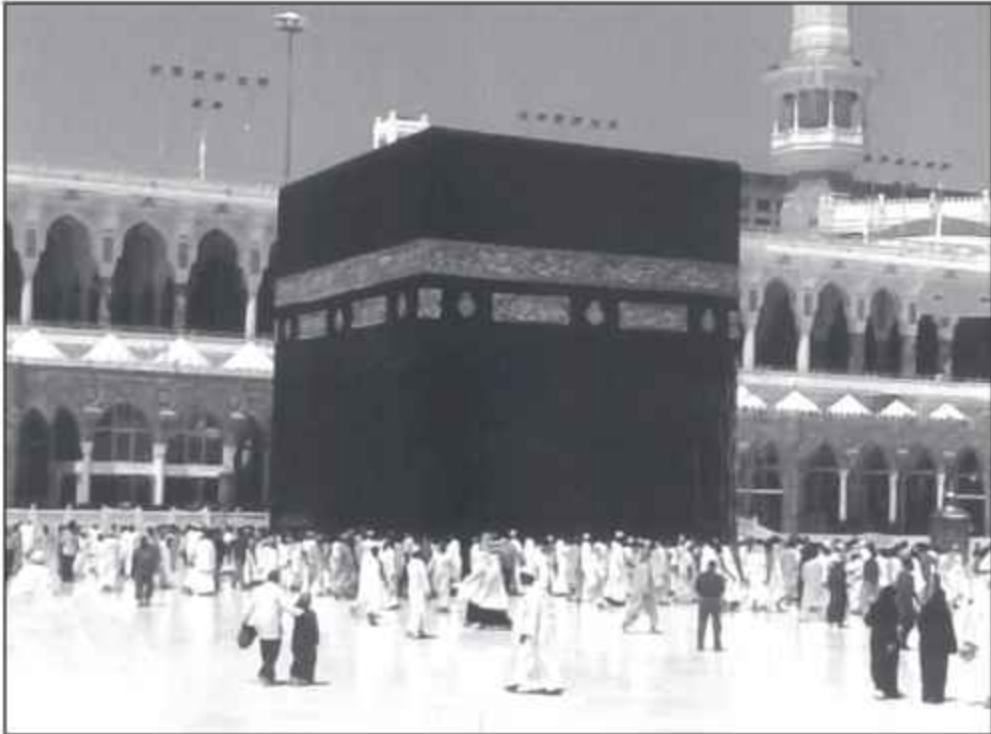
চিত্র : মক্কায় অবস্থিত পবিত্র কাবা শরীফ

চিত্র : মক্কায় অবস্থিত পবিত্র হেরেম শরীফ

চিত্র: হেরা পর্বত

তারপর প্রায় ২৩ বছর পবিত্র কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ খন্ডাকারে নাযিল হতে থাকে। অবস্থা, প্রয়োজন ও বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে মহানবি (সা.)-এর ২৩ বছর নবুয়তি জীবনে কুরআন অবতরণ হতে থাকে। প্রথম দিকে আল্লাহর অস্তিত্ব, তাঁর একত্ববাদ, পরকালের নিশ্চয়তা ইত্যাদি বিষয়ক সূরা অবতীর্ণ হয়। অবশেষে হিজরতের পরে অবতীর্ণ সূরা গুলোতে সামাজিক, নৈতিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক আইন-কানুন ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে নাযিল হয়েছিল। অবশেষে একাদশ হিজরির শেষ লগ্নে বিদায় হজ্জের সময় আরাফাতের ময়দানে সূরা মায়িদার এ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে কুরআন নাযিল সমাপ্ত হয়।

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন বিধানের পরিপূর্ণতা দান করলাম। তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামত পরিপূর্ণ করলাম। আর তোমাদের জন্য ইসলামকে জীবনব্যবস্থারূপে মনোনীত করলাম'। (সূরা মায়িদা: ৩)

ইসলাম পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হওয়ার কারণে ইসলাম প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কুরআন খন্ডাকারে সুদীর্ঘ ২৩ বছর ব্যাপী পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা ঐশীবাণী কুরআনকে আয়ত্ব করা, বিভিন্ন লোকের প্রশ্নের জবাব, উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা, কুরআনের প্রতিটি নির্দেশের উপর আমল করার সুবিধার্থে এবং সর্বোপরি কুরআনের যথাযথ মর্ম অনুধাবন করা সহজ নয়, সে কারণেই কুরআন দীর্ঘ তেইশ বছরে পর্যায়ক্রমে খন্ডাকারে অবতীর্ণ হয়। আর তা সাথে সাথে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়। মহানবি (সা.) সে আলোকে সমাজ বিনির্মাণ করেন এবং কুরআনের সকল বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করেন।

এই কুরআনে ১১৪ টি সূরা, ৬২৩৬ টি আয়াত, ৭৭,৯৩৪ টি শব্দ এবং ৩,২৩,৬২১ টি অক্ষর আছে। মক্কায় ৯২ টি সূরা এবং মদিনায় ২২ টি সূরা অবতীর্ণ হয়। কুরআন শরীফ তার ভাব, ভাষা, অলংকার, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, ছন্দ-মূর্ছনা, রচনা শৈলী, বিষয়বস্তুর অভিনব গ্রন্থনা, বাক্যের অনুপম বিন্যাস-দ্যোতনা সব ঘিরে এক অতুলনীয় ও অনুপম শাশ্বত কিতাব।

সপ্তম পরিচ্ছেদ
প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

তিন বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করার পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) প্রকাশ্যে ৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। তাঁর ওপর আদেশ হয়- 'আপনাকে যে বিষয়ে আদেশ প্রদান করা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে জনগণকে শুনিয়ে দিন। আর এ ব্যাপারে মুশরিকদের পরোয়া করবেন না।' এ নির্দেশ পেয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মক্কায় অদূরবর্তী ছাফা পর্বতে আরোহণ করেন এবং সকল গোত্রের সর্দারদের উদ্দেশ্যে বলেন ঃ- 'হে কুরাইশগণ, আজ যদি আমি বলি এই ছাফা পর্বতের পশ্চাতে একদল শত্রু তোমাদেরকে আক্রমণ করার অপেক্ষায় রয়েছে, তবে কি তোমরা সে কথা বিশ্বাস করবে? সকলেই জবাব দিল নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। কারণ এ পর্যন্ত তুমি কখনও আমাদের সাথে মিথ্যা কথা বলনি। এরপর তিনি বললেন 'আমি একথা বলি যে, তোমরা যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আরোপিত হবে'। এ কথা শুনে তাঁর পিতৃব্য আবু লাহাবসহ সকলেই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে গেল।

প্রকাশ্যে প্রচারণার ফলে মুসলমানদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে কিন্তু মক্কার কুরাইশগণ তীব্র বিরোধিতা শুরু করে এবং তাঁর ওপর অত্যাচার, নিপীড়ন ও নির্যাতন চালাতে শুরু করে। আবু সুফিয়ান, আবু লাহাব, আবু জাহল প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তার বিরোধিতা করতে থাকে। কুরাইশরা হযরতকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ, উপহাস শুরু করে। তাঁকে তারা ধর্মদ্রোহী পাগল আখ্যা দেয়। পাথর ছুঁড়ে আঘাত ও আবর্জনা ফেলে অপমান ও লাঞ্ছিত করে। কিন্তু তিনি ও তাঁর অনুসারী মুসলমানগণ তাদের বিশ্বাসে অটল এবং অনড় থাকেন। প্রলোভন, অত্যাচার এবং নির্যাতনে কোনো ফল না পাওয়ায় তারা মুসলমানদের ওপর উৎপীড়ন ও নির্যাতন বৃদ্ধি করে।

কুরাইশদের বিরোধীতার কারণ

কুরাইশদের বিরোধিতার যে সব কারণ ঐতিহাসিকগণ নির্দেশ করেছেন তা হলো–

১. তৌহিদের আদর্শ কুরাইশদের নীতি বিরুদ্ধ ছিল : হযরত মুহাম্মাদ(সা.) কর্তৃক প্রচারিত ইসলামের মূলতত্ত্ব তৌহিদ বা একত্ববাদ ছিল কুরাইশদের নীতি বিরোধী। তারা ছিল মূর্তিপূজক। জড়বাদ ও পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী বলে তারা মূর্তিপূজা বর্জন করতে পারে নি। নিরাকার এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করা ছিল তাদের পক্ষে কঠিন ব্যাপার। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পরিবর্তে পরকালে বিশ্বাস ও পুরস্কারের আশ্বাস তাদেরকে বিভ্রান্তিতে নিপতিত করে। তাই তারা তৌহিদবাদী ইসলামের বিরোধিতা করে সমূলে ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করে। তারা বিশ্ব ভ্রাতৃত্বও পছন্দ করত না। সমাজে উঁচু-নীচের ব্যবধান ছিল অনেক। বংশ গৌরব ও আভিজাত্যকেই তারা প্রাধান্য দিত।

২. ইসলামের আদর্শ ছিল কুরাইশদের স্বার্থ বিরোধী : হযরত মুহাম্মাদ(সা.) আরবদের বংশগত আভিজাত্য ও কৌলিন্যের উপর কুঠারাঘাত করে সমাজে সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পান। ইসলামের সামাজিক সাম্য স্থাপনের প্রচেষ্টা কুরাইশদেরকে বিক্ষুব্ধ করে তোলার প্রধান কারণ ছিল। তারা মনে করেছিল ইসলাম তাদেরকে কৌলিন্য ও পৌরহিত্যের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে। কুরাইশগণ তাদের দীর্ঘদিনের অন্যায় ও অবৈধ সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ এবং পুরোহিত শ্রেণির ঔদ্ধত্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়ায় ইসলামের বিরুদ্ধাচারণ করে। মক্কার শাসকগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের শিক্ষার প্রতি ততো বিরূপ ছিল না– যতখানি বিরূপ ছিল ইসলামের ভবিষ্যত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের প্রতি।

কুরাইশগণ ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করল এবং প্রতিজ্ঞা করল যে, দেহে প্রাণ থাকতে তারা কখনও তাদের পূর্ব-পুরুষদের পৌত্তলিকতা বিসর্জন দিবে না। হযরতের এবং নব-মুসলমানদের ওপর তারা দ্বিগুণ জুলুম এবং উৎপীড়ন চালাতে লাগল।

৩. অর্থনৈতিক কারণ : কাবা ঘরের পৌরহিত্য ও রক্ষণাবেক্ষণ করার ফলে কুরাইশদের প্রচুর অর্থাগম হয়। অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে সাথে তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এর প্রচারিত একত্ববাদের ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে এবং ইসলামি অনুশাসন প্রয়োগ করলে মক্কাবাসী কুরাইশদের অর্থোপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে যাবে। এই আশঙ্কায় তারা তাঁর বিরুদ্ধে বিরোধিতা করেছিল।

আবিসিনিয়ায় হিজরতের গুরুত্ব

আবিসিনিয়ায় প্রথম ও দ্বিতীয় বার হিজরত করে মুসলমানগণ প্রমাণ করলেন যে, সত্য ধর্ম ইসলামের জন্যে তাঁরা যে কোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত রয়েছেন। হিজরতের মাধ্যমে মুসলমানগণ আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ধর্মের জন্যে দেশত্যাগ এবং জীবন বিসর্জন দিতেও তাঁরা সদা প্রস্তুত, আবিসিনিয়ায় হিজরত করে তাঁরা তা-ও প্রমাণ করলেন। আবিসিনিয়ায় তাঁদের দুর্দিনের জন্যে নিরাপদ আশ্রয় স্থল হিসেবে পরিগণিত হল। তাছাড়া এটা মদিনায় হিজরতের সূচনা ও পূর্বাভাস ছিল। মদিনাবাসীগণ হযরতকে আশ্রয় দিতে রাজি না হলে এবং আল্লাহর প্রত্যাদেশ না পেলে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) হয়ত আবিসিনিয়াতেই হিজরত করতেন। কাজেই মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের গুরুত্ব অপরিসীম।

কুরাইশদের বয়কট

হযরতের নবুয়ত লাভের ৬ষ্ঠ বছরে ৬১৬ খ্রিষ্টাব্দে কুরাইশগণ ইসলামে দীক্ষিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে বয়কট নীতি প্রচলন করল। কারণ, মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় গমন করে নির্বিঘ্নে নিজেদের ধর্ম-কর্ম করছে। নাজ্জাশীর নিকট দূত প্রেরণ করেও কোনো সুফল পেল না বরং নিরাশ হয়ে মক্কায় ফিরে এল। কুরাইশগণ নিজেদের মুসলমান হওয়ার মিথ্যা সংবাদ রটিয়ে যে সব মতলব এঁটেছিল তাও ব্যর্থ হয়ে গেল। তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও চেষ্টা এভাবে ব্যর্থ হওয়ায় কুরাইশ দলপতিগণের ক্রোধের সীমা অতিক্রম হয়ে গেল। উপরন্তু তারা দেখতে পেল যে হযরত হামযা (রা) ও হযরত উমর (রা) এর মতো প্রতিষ্ঠিত বীর ও গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এতে তাদের ক্ষোভ, দুঃখ, ক্রোধ ও অভিমান প্রচন্ড আকার ধারণ করল। তাই তারা একদিন সমস্ত কুরাইশদের একটি পরামর্শ সভায় সমবেত করল। সকলে একত্র হয়ে এক প্রতিজ্ঞাপত্র লিপিবদ্ধ করল।

কুরাইশদের প্রতিজ্ঞাপত্রটি হল: হাশেম ও মুত্তালিব গোত্রের সহায়তার ফলেই মুহাম্মাদ(সা.) এর স্পর্ধা এত দুর বেড়ে গেছে। অতএব, তাদেরকে এবং মুহাম্মাদ(সা.) ও তাঁর দলে দীক্ষিতদেরকে একদম বয়কট করতে হবে। তাদের সঙ্গে বেচা-কেনা, সামাজিক লেনদেন, কথা-বার্তা সব কিছু বন্ধ থাকবে। কেউ তাদের কন্যা গ্রহণ বা তাদেরকে কন্যা দান করতে পারবে না। কেউ তাদেরকে কোন অবস্থায় কোন প্রকার সাহায্য করলে, সে কঠোর দন্ডের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা স্বেচ্ছায় মুহাম্মাদ(সা.)কে হত্যা করার জন্য আমাদের কাছে সমর্পণ না করবে ততদিন এ প্রতিজ্ঞাপত্র বলবৎ থাকবে। এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা শিব্ আবি তালিব-এ (شِعْبُ أَبِيْ طَالِبٍ) মহানবি (সা)কে তিন বছর বন্দি করে রাখে।

অতঃপর কুরাইশগণ হাশেম গোত্রের ও মুত্তালিব গোত্রের লোকদের বিরুদ্ধে অসহযোগ ও বর্জননীতি প্রয়োগ করে তাদেরকে সমাজচ্যুত করে। এই চরম সংকটাপন্ন অবস্থায়ও মুসলমানগণ তাঁদের ঈমান ও মনোবল অটুট রাখেন। অবশেষে কুরাইশগণ তাদের বর্জননীতি প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে হাশেম ও মুত্তালিব গোত্রদ্বয়ের লোকজন এবং মুসলমানগণ আবার নিজ নিজ গৃহে ফিরে আসলেন।

আমুল হুযন বা দুঃখের বছর

নবুয়তের দশম বছরে ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এক প্রচন্ড মানসিক আঘাতে ভেঙ্গে পড়েন। গিরি সংকট হতে ফিরে আসার কয়েক দিন পর আবু তালেব অসুস্থ হয়ে পড়েন। কারা জীবনের কঠোরতা তাঁর সহ্য হয় নি। তাই তিনি ৮৩ বছর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। তিনিই মহানবী (সা.)এর বিপদ আপদে একমাত্র আশ্রয়দাতা ছিলেন। কুরাইশগণ যখন নবী (সা.)-কে তাদের হাতে সোপর্দ করার জন্যে আবু তালিবকে অনুরোধ করল, তখন আবু তালিব বললেন, 'এই মসজিদের মালিকের শপথ! আমার আহমদকে কখনও তাদের হাতে সমর্পণ করব না, কালনাগিনী তার সমস্ত ভয়াবহতা দিয়ে দংশন করলেও নহে।'

আবু তালিবকে হারিয়ে মহানবি (সা.) অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। আবু তালিবের মৃত্যুতে তিনি যেন অসহায় হয়ে পড়লেন। পিতৃব্য আবু তালিবের মৃত্যুর শোক ভুলতে না ভুলতেই বিবি খাদিজাও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। হযরত(সা.) বুঝতে পারলেন তাঁর জীবন সঙ্গিনীও এবার তাঁকে ছেড়ে চলে যাবেন। চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যেই বিবি খাদিজা (রা) ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল মু আল্লায় দাফন করা হয়।

বিবি খাদিজা (রা.) ছিলেন হযরতের সকল বিপদে আপদে সান্ত্বনাদানকারী, পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী। তাঁর মৃত্যুতে নবি করিম (সা.) এর অন্তর এবং গৃহ শূন্য হয়ে পড়ে। তাঁর শৈশবের আশ্রয় স্থল, যৌবনের অভিভাবক ও পরবর্তী জীবনের কার্যাবলির একনিষ্ঠ সমর্থক পিতৃব্য আবু তালিবের মৃত্যুতে তিনি শোকে মোহ্যমান হয়ে পড়েন। হযরতের বিপদ আপদে ও দুঃসময়ে এ দু'জন মহাপ্রাণের অনুপস্থিতি তাঁর জীবনে অপূরনীয় ক্ষতি সাধন করে। তাঁদের মৃত্যুতে তিনি দুঃখিত ও ব্যথিত হন। এজন্য বছরটি আ'মুল হুযন (عَامُ الْحُزْنِ) বা দুঃখের বছর নামে খ্যাত।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর তায়েফ গমন

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর স্ত্রী বিবি খাদিজা (রা.) ও চাচা আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশদের অত্যাচারের পথ একেবারে নিস্কন্টক হয়ে যায়। ফলে তাঁরা রাসুল (সা.) এর উপর অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। নরাধমগণ প্রায়ই তাঁর গৃহদ্বারে কাঁটা বিছিয়ে রাখত। হযরত (সা.) যখন কাবাঘরের সামনে নামাযরত থাকতেন, তখন নরাধম কুরাইশরা কখনো উটের নাড়িভূঁড়ি কখনো বা সদ্যপ্রসূত ছাগির ফুল তাঁর মাথার উপর চাপিয়ে দিত। এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটেছে। একদিন হযরত নামাযে মগ্ন হয়ে আছেন দেখে ওকবা নিজের চাদর দড়ির মত করে তা হযরতকে পেঁচিয়ে অনবরত মোড়াতে থাকত। এর ফলে মহানবী (সা.)-এর ঘাড় বেঁকে শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। ঘটনাক্রমে সে সময় হযরত আবু বকর (রা.) সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে কোনোক্রমে রক্ষা করেন। এরূপ ভাবে প্রতিদিনই তাকে লাঞ্ছনা ও নির্যাতন চালাতে থাকত। কখনো কখনো দল বেঁধে লোকজন তাঁকে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করত ও গাল দিত। কখনও তাঁর খাদ্য দ্রব্যে জীব-জন্তুর মলমূত্র মিলিয়ে দিত। কখনো বা ঘৃণ্য আবর্জনাদি তাঁর দেহে নিক্ষেপ করত। এমনিভাবে তারা হযরতকে কষ্ট দিতে লাগল।

পিতৃব্যের বিয়োগ, সহধর্মিনীর বিচ্ছেদ, মাতৃহারা কন্যাগণের বিষাদময় ম্লান-মুখ, সর্বোপরি নরপিশাচগণের এ সকল অকথ্য অত্যাচার, সবকিছুর একত্র সমাবেশে তিনি বিচলিত হয়ে পড়লেন। তাই তিনি ভক্ত ও পালিত পুত্র হযরত যায়েদকে সঙ্গে নিয়ে সত্য ধর্ম প্রচারের মানসে তায়েফ যাত্রা করার জন্য স্থির করলেন। মক্কা থেকে ৭০ মাইল দূরে তায়েফ নগরী অবস্থিত। সেখানে গমন করে তিনি দশদিন অবস্থান করে তায়েফবাসীদেরকে সত্য ও ন্যায়ের পথে আনয়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু নির্বোধ নগরবাসী তাঁর আহ্বানে কর্ণপাত না করে তাঁকে নির্মমভাবে লাঞ্ছিত ও প্রস্তরাঘাতে রক্তাক্ত করে তাড়িয়ে দেয়।

রাসুল (সা.) পথে বের হলে তারা হৈ চৈ করে চারিদিকে সমবেত হতে থাকত। পথ চলতে লাগলে ইট পাথর মারতে মারতে তাঁর পিছু ছুটত। অনেক সময় তাঁরা পথের দুধারে সারি বেঁধে বসে পড়ত এবং প্রত্যেক পদ নিক্ষেপে হযরতের চরণ যুগলের ওপর দুদিক থেকে প্রস্তর বর্ষণ করত। ফলে হযরতের পদদ্বয় রক্তে রঞ্জিত হয়ে যেত। এহেন নৃশংস অত্যাচারেও হযরতের হৃদয় একটুও দমিত হয়নি।

তায়েফবাসীগণ রাসুল (সা.)-কে এত কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁদের ওপর অসন্তুষ্ট হননি। বরং তাদের জন্যে দোয়া করেন– 'হে আল্লাহ, হে আমার প্রভু! অপরাধীরা আজ বুঝে না যে গুরুতর অপরাধ করেছে, সেজন্যে তুমি দয়া করে তাদেরকে শাস্তি দিও না, বরং ক্ষমা করে দাও। তাদের কোনো দোষ নেই। সে আমারই দুর্বলতা, আমারই অক্ষমতা। এ দুর্বলতার জন্য তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।'

মক্কা থেকে তায়েফ গমন করেও রাসুল (সা.) তায়েফবাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে পুনরায় মক্কায় ফিরে আসলেন। মক্কার অনতিদূরে নাখলা স্থানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে লাগলেন। নাখলায় উপস্থিত হলে হযরত যায়েদ তাঁকে মক্কার কুরাইশদের অত্যাচারের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিকার করার পরামর্শ দিলেন। তাই হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সরাসরি মক্কায় প্রবেশ না করে মুতুইম ইবনে আদীর আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আরবের প্রথানুসারে মুতইম হযরতকে আশ্রয় দিয়ে মক্কায় পৌছে দেন।

কাফেররা হযরতকে কিছুই বলেনি। মুতইম-এর এ উপকারের কথা হযরত চিরকালই কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করেছেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মুতইম ইবনে আদীর আশ্রয়ে আসার পর আরও ব্যাপক আকারে ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগ আরম্ভ করেন। সাধারণ জনসভায় ও হজ্জের সময় সমাগত লোকদের নিকট ইসলামের বাণী পৌঁছাতে থাকেন।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর মিরাজ শরীফ গমন

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর সংগ্রামী জীবনের সবচেয়ে বিস্ময়কর, তাৎপর্যপূর্ণ ও আলৌকিক ঘটনা হল মি'রাজ। এ প্রসঙ্গে আমীর আলী বলেন, মহানবি (সা.) তাঁর প্রিয়তমা জীবন সঙ্গিনী বিবি খাদিজাতুল কুবরা (রা.) ও পিতৃব্য আবু তালিবকে হারিয়ে যখন শোকে মোহ্যমান হয়ে পড়লেন, তখন আল্লাহ তায়ালা মহানবি (সা.)-এর হৃদয়ের সুপ্ত বেদনাগুলো প্রশমিত করার জন্য ৬২০ খ্রিষ্টাব্দে নবুয়তের দশম বছরে রজব মাসের ২০ তারিখে সোমবার নবি (সা.) কে নিজের একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে যান। সোমবার দিবাগত রাতে রাসুল (সা.) জমজম ও মাকামে ইবরাহীমের মাঝখানে ঘুমিয়ে ছিলেন, জাগ্রত হয়ে দেখেন জিবরাইল (আ.) কর্তৃক আনিত বোরাকে চড়ে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসায় গমন করেন। সেখানে গিয়ে রাসুল (সা.) ওযু করে নেন এবং সকল নবি ও রাসুলদেরকে সাথে নিয়ে নিজ ইমামতিতে দুই রাকাত নামাজ আদায় করলেন। তারপর রাসুল (সা.) বোরাকে চড়ে জিবরাইল (আ.) এর সাথে উর্ধ্বাকাশে গমন করে একেক করে প্রত্যেক আকাশে প্রত্যেক পয়গম্বরের সাথে কথোপকথন শেষ করে সিদরাতুল মুনতাহায় গিয়ে পৌঁছলেন। তখন জিবরাইল (আ.) রাসুল (সা.) কে প্রার্থনার সুরে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ (সা.), আমি আর এক বিন্দু সামনে অগ্রসর হতে পারব না। কেননা অগ্রসর হলে আল্লাহর নূরের তাজাল্লীতে আমি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাব। তখন রাসুল (সা.) জিবরাইল (আ.) ও বোরাক ত্যাগ করলেন। তৎক্ষণাৎ আল্লাহর তায়ালার পক্ষ হতে রফরফ নামক বোরাক এসে রাসুল (সা.) কে আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন। তখন রাসুল (সা.) এবং আল্লাহ তায়ালার মধ্যে সালাম ও কুশলাদি বিনিময় শেষে আল্লাহতায়ালা তাঁর হাবীবকে জান্নাত ও জাহান্নাম পরিদর্শন করান। সর্বশেষ উম্মাতে মুহাম্মদীর জন্য ৫ ওয়াক্ত নামাজের নির্দেশ নিয়ে রাসুল (সা.) পুনরায় ফিরে আসেন। হযরতের এই ভ্রমণে মাত্র রাতের কিয়দাংশ সময় ব্যয় হয়েছিল। এতে প্রমাণিত হয় রাসুল (সা.) এর মি'রাজ স্বশরীরে হয়েছিল। আর এ ঘটনাটি শোনামাত্র সর্বপ্রথম বিশ্বাস করেছিলেন হযরত আবু বকর (রা.)। পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত এরূপ অভিনব ঘটনা আর দ্বিতীয়টি কখনো হয়নি, হবেও না। ফলে মি'রাজের মাধ্যমে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য এক অপূর্ব বৈপ্লবিক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়েছে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মদিনাবাসীদের মধ্যে ইসলাম প্রচার

হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সা.) যখন কুরাইশদের নিকট ইসলাম প্রচার করে নিরাশ হলেন তখন তিনি আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকদের মধ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন। হজ্জের সময় আরবের বিভিন্ন গোত্র হতে মক্কায় হজ্জের উদ্দেশ্যে এবং বাণিজ্যের জন্যে যারা আসত তিনি তাদের কাছে গমন করে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। সে সময় মদিনায় আরবের দুটি বিখ্যাত গোত্র আউস ও খাজরাজ বসবাস করত। তাদের আদিবাস ছিল ইয়ামেনে। আউস ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছিল। আউস ও খাজরাজের গোত্রের লোকেরা শেষ নবির আগমনের কথা জানত এবং তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে তারা একজন নেতারও সন্ধান করছিলেন। তাঁরা মদিনার ইহুদিদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিল যে, শেষ নবির আবির্ভাবের সময় সমাগত।

আকাবার প্রথম শপথ

নবুয়তের দশম বছরে হজ্জের মৌসুমে খাজরাজ গোত্রের কয়েকজন লোক মক্কায় এসে শুনতে পেল যে, এক ব্যক্তি নবুয়তের দাবি করছেন। মক্কা হতে একটু দূরে আকাবা নামক স্থানে ছয়জন লোক আলাপ-আলোচনা করছিলেন। হযরত তাঁদের নিকট উপস্থিত হয়ে জানতে পারলেন যে, তাঁরা মদিনাবাসী খাজরাজ বংশীয় লোক। হযরত তাঁদেরকে ইসলামের শিক্ষা ও সভ্যতার দিকে আহ্বান করলেন এবং কুরআন শরিফের কয়েকটি আয়াত পাঠ করে তাঁদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করলেন। তাঁরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং মদিনায় পৌঁছে আল্লাহর মহত্ত্ব প্রচার করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করলেন। এটিই ইসলামের ইতিহাসে আকাবার প্রথম শপথ অর্থাৎ বাইয়াত আল আকাবা (بَيْعَةُ الْعَقَبَةِ) নামে পরিচিত। হযরত মুসআব (রা.) নামক এক সাহাবিকে ধর্ম শিক্ষা দানের জন্যে ইয়াসরিব তথা মদিনায় প্রেরণ করলেন। হযরত মুসআব (রা.) ও নবদীক্ষিত মুসলমানদের প্রচেষ্টায় ইয়াসরিবে ইসলাম ধর্মের প্রচারে নতুন দিগন্তের সূচনা করে। ইয়াসরিববাসী স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে।

আকাবার দ্বিতীয় শপথ

নবুয়তের একাদশ বছরে আউস ও খাজরাজ গোত্রের ১২ জন মদিনাবাসী পূর্ব কথিত আকাবা নামক স্থানে হযরতের সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলামের শপথ গ্রহণ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার সময় তাঁদের আবেদনে ধর্মীয় আহকাম শিক্ষা দেওয়ার জন্যে দু'জন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এটি আকাবার দ্বিতীয় শপথ নামে খ্যাত।

আকাবার তৃতীয় শপথ

নবুয়তের দ্বাদশ বছর আকাবার দ্বিতীয় শপথের পর সকলে মদিনায় ফিরে আসেন। সেখানে হযরত মুসআব (রা.) ইমামতি করতেন। সে বছর হযরত মুসআব (রা.) ও হযরত ওয়াইমের (রা.) এর হাতে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে উসায়েদ ইবনে হোযায়ের এবং হযরত সাদ ইবনে খাইসাম (রা.) ছিলেন। এ দু'ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের ফলে আউস গোত্রের সকল নর-নারী মুসলমান হয়ে যান। এভাবে মদিনায় দ্রুতগতিতে ইসলাম প্রসার লাভ করতে থাকে। ঐ বছর মদিনায় রাসুলুল্লাহর সুখ্যাতি ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁদের মধ্যে থেকে ৭৩ জন নারী পুরুষ একসাথে হযরত হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর সাথে আকাবা নামক স্থানে শপথ গ্রহণ করেন। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করবেন না। তাঁরা ইসলামের আদর্শ ও রীতি মেনে চলবেন ও তা রক্ষার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। হযরতকে সর্বপ্রকার সাহায্য করতে দ্বিধা করবেন না। সেই রাতে কঠিন শপথের পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ইসলাম প্রচার ও দীনি তালিমের জন্যে তাঁদের মধ্য হতে বারোজন নকীব বা প্রচারক নিযুক্ত করেন। ইসলামের ইতিহাসে এটি আকাবার তৃতীয় শপথ নামে খ্যাত।

আকাবার শপথের মূল বিষয়: হযরতের নিকট আকাবা নামক স্থানে মদিনাবাসীগণ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে যে প্রতিজ্ঞা করেন তা নিম্নে উদ্ধৃত হলোঃ–

১. আমরা এক আল্লাহর এবাদত-বন্দেগী করব, তাঁকে ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে ইলাহ বলে স্বীকার করব না এবং কাউকেও আল্লাহর সাথে শরিক করব না।

২. আমরা চুরি, ডাকাতি বা অন্য কোনো প্রকারের অন্যায় কাজে লিপ্ত হব না।

৩. আমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হব না।

৪. আমরা কোনো অবস্থায় সন্তান হত্যা বা বলিদান করব না।

৫. আমরা কারো প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করব না।

৬. আমরা প্রত্যেক সৎকর্মে হযরতের অনুগত থাকব, কোনো ন্যায় বিচারে অবাধ্য হবো না।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে হত্যার ষড়যন্ত্র

মক্কার কুরাইশগণ যখন জানতে পারল যে, হযরত মুহাম্মাদ(সা.) আকাবায়ে মদিনাবাসীদের সাথে গোপনীয়তার সাথে শপথ নিয়েছেন এবং তাঁদেরকে মদিনায় ফিরে গিয়ে ধর্ম প্রচার চালাতে নির্দেশ দিয়েছেন। কুরাইশদের শত অত্যাচার, নির্যাতন ও প্রলোভন সত্ত্বেও যখন তাঁরা হযরতকে ইসলাম প্রচার থেকে বিরত রাখতে পারে নি তদুপরি হযরত মুহাম্মাদ(সা.) ইয়াসরিববাসীদের আমন্ত্রণে সেখানে চলে যাবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং ইয়াসরিবকে নিরাপদ আশ্রয় স্থল হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তখন তারা তাকে হত্যা করার মনস্থ করে। এদিকে মুসলমানদের উপর অত্যাচার শুরু হলে তাঁরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে ইয়াসরিবের দিকে যেতে থাকেন। আবিসিনিয়া হতে প্রত্যাগত ২০০ জন মুসলমানকেও তিনি ইয়াসরিবে আশ্রয় গ্রহণ করতে বলেন। শুধু হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত আলী (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সাথে মক্কায় অবস্থান করতে লাগলেন। হিংস্র কাফেররা আবু জাহলের নেতৃত্বে স্থির করে যে, প্রত্যেক গোত্র থেকে এক এক জন যুবক নিয়ে হত্যাকারী দল গঠন করবে। তারা একত্রে তরবারির আঘাতে হযরতকে হত্যা করবে। কুরাইশরা তাঁর গৃহ অবরোধ করলে আল্লাহর প্রত্যাদেশে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) আলী (রা.) কে স্বীয় বিছানায় শায়িত করে হযরত আবু বকর (রা.) কে সঙ্গে নিয়ে দুটি উটের পৃষ্ঠে আরোহণ করে তিনি ইয়াসরিব অভিমুখে যাত্রা করলেন। রাসুল (সা.) কে গৃহে না পেয়ে মুশরিকরা তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করলে তিনি হযরত আবু বকর (রা.) সহ পথিমধ্যে সওর নামক পর্বত গুহায় আত্মগোপন করে তিন দিন অবস্থান করেন। গুহায় অবস্থানকালে হযরত আবু বকর (রা.)-এর পুত্র আবদুল্লাহ এবং কন্যা আসমা তাঁদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করতেন। চতুর্থ দিনে তাঁরা গিরিগুহা হতে বের হয়ে ইয়াসরিবের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। মক্কা থেকে ইয়াসরিবের দূরত্ব ২৫০ মাইল। পথে অনেক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তাঁরা ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ সেপ্টেম্বর (১২ রবিউল আউয়াল) তারিখে মদিনার নিকটবর্তী কুবা নামক স্থানে এসে পৌছান। হযরত আলী (রা.) পরে তাঁদের সাথে যোগ দেন। ইয়াসরিবে আগমন করে তিনি এর নাম পরিবর্তন করে মদিনাতুন্নবী বা নবির শহর রাখেন এবং এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

মক্কা হতে মদিনায় মহানবী (সা.) এর এ সুপরিকল্পিত প্রস্থানকে ইতিহাসে হিজরত বলা হয়। মক্কা হতে মদিনায় আগমন ইসলামের ইতিহাসে একটি নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। রাসুল (সা.)এর এই হিজরতকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৭ বছর পর হযরত উমর (রা.) চন্দ্র বছরের প্রথম মাস মহররম এর প্রথম দিন (১৬ই জুলাই) হতে হিজরি সালের প্রবর্তন করেন। নিঃসন্দেহে ইসলামের ইতিহাসে এটি একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা।

হিজরতের কারণ

১. প্রাকৃতিক প্রভাব : মদিনা ছিল শস্য-শ্যামল ও উর্বর ভূমি। সেখানে স্বাস্থ্যকর ও সুশীতল আবহাওয়া বিরাজমান ছিল। তাই সেখানকার লোকদের আচার-আচরণ ছিল নম্র, ভদ্র ও মার্জিত। তাঁরা ছিল দয়ালু ও পরোপকারী। তাই, সেখানে ইসলামের দাওয়াত সহজ ও গ্রহণীয় হবে ধারণা করে রাসুল (সা.) মদিনায় হিজরত করেন।

২. ইসলাম প্রচারের অনুকূল পরিবেশ : আউস ও খাযরাজ গোত্রের লোকজন হজ্জের মৌসুমে আকাবায় মিলিত হয়ে হযরতের নিকট শপথ করে ইসলাম গ্রহণ করলে মদিনায় ইসলামের বিস্তৃতি লাভ করে। এছাড়া, হযরত মুহাম্মাদ(সা.) হযরত মুসআব (রা.) কে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য মদিনায় প্রেরণ করেন। এর ফলে দ্বিতীয় আকাবায় শপথ গ্রহণে কমপক্ষে ৭১ জন পুরুষ ও ২ জন মহিলা হযরতের সাথে মিলিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এরপর মদিনায় ইসলাম ধর্ম প্রচারের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি হলে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) তথায় হিজরত করার ইচ্ছা পোষণ করেন।

৩. মনস্তাত্ত্বিক কারণ : হযরত মুহাম্মাদ(সা.) অতীতের নবি রাসুলদের ইতিহাস থেকে জানতে পেরেছেন যে কোন নবি-রাসুলই নিষ্কন্টভাবে তাঁর জন্মভূমিতে দ্বীন প্রচারে সক্ষম হননি। তদুপরি মক্কায় ইসলাম প্রচার করতে গিয়ে জুলুম-নির্যাতন সহ্য করা সত্ত্বেও ইসলামের পরিবেশ সেখানে কায়েম হয়নি। তাই তিনি মানসিকভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন হিজরত করার জন্যে।

৪. আভিজাত্য ও কৌলীণ্যের প্রভাব : ইসলাম সমতার ধর্ম। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মুসলমান ভাই ভাই। উচ্চ-নীচ কোন প্রভেদ নেই। কিন্তু মক্কার কুরাইশদের মধ্যে যে আভিজাত্য ও কৌলিন্য প্রথা মজ্জাগত ছিল তা ইসলামের প্রভাবে উলট-পালট হয়ে যেতে বাধ্য। ঐতিহাসিক যোশেফ হেল বলেন : মক্কার শাসকবর্গ ইসলাম ধর্মের শিক্ষার প্রতি যতখানি শত্রু ভাবাপন্ন ছিল, তার তুলনায় বেশি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ছিল ইসলাম কর্তৃক আনীত সম্ভাব্য সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রতি। ইসলামের শিক্ষা হল বংশ, জন্ম, আভিজাত্য বা পৌরহিত্যের জন্যে মানুষ কোন বিশেষ অধিকার লাভ করতে পারে না। যে কারণে তারা ইসলামকে গ্রহণ করতে পারে নি। ইসলামের শিক্ষা তাদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। ফলে তারা বিরোধীতার তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

৫. পুরোহিতদের বিরোধিতা : মক্কার পুরোহিতরা ছিল পৌত্তলিক। কাবা-গৃহে তখন মূর্তি রাখা হয়েছিল এবং সেগুলোর পূজা হত। তাই, কাবা গৃহের একচ্ছত্র অধিকার ছিল মক্কার পুরোহিতদের। মূর্তিপূজার বিরোধী ইসলামের শিক্ষা হল আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো সত্ত্বার এবাদত করা যাবে না। মক্কার পুরোহিতদের কায়েমি স্বার্থ-বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা বিরোধিতা করতে থাকে। ফলে সেখানে ইসলামের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়ায় হযরত মুহাম্মাদ(সা.) মদিনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নেন।

৬. ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত : মক্কার কুরাইশরা ধর্মান্ধ হয়ে পূর্ব-পুরুষদের চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠানকে আকড়িয়ে ধরে মূর্তিপূজা করত। তারা মূর্তিপূজাকে বর্জন করে তাওহিদের বাণীকে গ্রহণ করে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হতে পারে নি। তাওহীদ পরিপন্থী জড়বাদী ও মূর্তিপূজা ত্যাগ করার মানসিকতা তৈরি করতে পারেনি। তাই, তারা ইসলামের বিরোধিতা করায় রাসুল(সা.) মদিনায় হিজরত করেন।

৭. মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্পতা : নবুয়ত প্রাপ্তির পর তিন বছর গোপনে ও ১০ বছর প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়া সত্ত্বেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। মানুষ মূর্তিপূজা ছেড়ে দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করেনি। আর যারা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদের উপরেও কুরাইশরা প্রতিনিয়ত নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়েছে। ফলে মুসলমানগণ শক্তি সঞ্চয় করতে পারেননি কাফেরদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার। ইসলামের বিস্তৃতি, শক্তি বৃদ্ধি ও কাফিরদের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্যে হযরত মদিনাকে বেছে নিয়ে হিজরত করেন।

৮. মদিনাবাসীদের দ্বন্দ্ব নিরসন : মদিনায় যে সমস্ত লোক বসবাস করত তার মধ্যে খাযরাজ এবং আউস গোত্রদ্বয় প্রসিদ্ধ ছিল। তারা ইয়ামেন থেকে এখানে বসতি স্থাপন করে। অপরদিকে ইহুদি ধর্মাবলম্বী তিনটি গোত্রের লোকজনও এখানে বাস করত। তারা যথাক্রমে বনি কাইনুকা, বনি নাযির এবং বনি কুরাইযা। আউস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকেরা দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত ছিল। তাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এবং শান্তি স্থাপনের জন্য একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করতে থাকে। অতপর হযরতের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সংবাদ পেয়ে তারা তাকে আমন্ত্রণ জানালেন। ফলশ্রুতিতে মহানবি (সা.) মদিনায় হিজরত করেন।

৯. প্রভাবশালী অভিভাবক ও জীবন সঙ্গিনীর অভাব : নবিজীর চাচা আবু তালিব সব সময় তাঁকে আশ্রয় দিয়ে রাখতেন। আর হযরত খাদিজা (রা.) তাঁকে সব সময় পরামর্শ ও সাহস যোগাতেন। তাঁদের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়লেন। কুরাইশদের নির্যাতন আরও বহু গুণ বেড়ে গেল। এমনকি তাঁর প্রাণ নাশের ব্যবস্থা পাকাপাকি করা হল। নবিজী (সা.) জীবনের নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন।

১০. ইহুদিদের আমন্ত্রণ : মদিনার ইহুদিগণ তাওরাত কিতাবের মাধ্যমে জানতে পারল যে, শেষ নবির আবির্ভাব ঘটবে। তাঁরা শেষ নবিকে মদিনায় তাঁদের মধ্যে পাবার একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করল। হিজরতের পূর্বেই মদিনায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। মক্কায় কোনো ইহুদি না থাকায় তাঁরা শেষ নবির আবির্ভাবকে মেনে নিতে পারে নি। তাই তিনি মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন।

১১. আত্মীয়তার সম্পর্ক : হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর পিতা আবদুল্লাহ ও প্রপিতামহ হাশিম উভয়ে মদিনায় বিবাহ করেন। নবিজীর মাতা বিবি আমিনার দিক থেকে মদিনায় আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তাছাড়া তাঁর পিতা আবদুল্লাহর কবরও মদিনার উপকণ্ঠে রয়েছে। সব দিক বিবেচনা করে নবিজীর মনে ধারণা জন্মে মদিনাবাসীদের সাহায্য ও সহযোগিতা তিনি লাভ করবেন। তাই তিনি মদিনায় হিজরত করেন।

১২. আল্লাহর নির্দেশ : ইসলামের উত্থানকে ঠেকানোর জন্যে মক্কার কাফির পৌত্তলিকগণ নির্যাতন, নিপীড়ন চালিয়েও কোন সুফল না পেয়ে আবু জাহেলের নেতৃত্বে 'দারুণ নাদওয়ায়' পরামর্শ সভা ডেকে নবিজীকে হত্যা করার জন্যে হত্যাকারী কমিটি গঠন করে। তখন আল্লাহর প্রত্যাদেশের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে নির্দেশ দেয়া হয় হিজরতের জন্যে। সে অনুসারে তিনি রাতের অন্ধকারে হযরত আবু বকর (রা.) কে সাথে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করেন।

হিজরতের গুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাস ও মহানবি (সা.) এর জীবনে হিজরত এক গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূর প্রসারী ঘটনা। ইসলামের অস্তিত্ব রক্ষা ও ইসলামকে সার্বজনীন ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল হিজরতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। হিজরতের ফলাফল ছিল অত্যন্ত ব্যাপক। নিম্নে হিজরতের ফলাফল ও গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. নির্যাতনের অবসান : হিজরতের ফলে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনে এক নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। তাঁর মক্কা জীবনের লাঞ্ছনা, অবমাননা, ভয়-ভীতি দূর হয়। তিনি নির্বিঘ্নে ইসলাম প্রচারের সুযোগ লাভ করেন। মদিনায় সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী হয়ে মদিনাবাসীদের আপনজন হিসেবে বিবেচিত হন। অপরদিক তাঁর জীবনে নেমে আসা দুর্যোগের অবসান ঘটে। তিনি মক্কার পৌত্তলিকদের নির্যাতন, নিপীড়ন, জুলুম-অত্যাচার ও হতাশার দিনগুলোর অবসান ঘটিয়ে আশা ও আলোর পথ প্রাপ্ত হলেন।

২. সামাজিক ক্ষেত্র : হিজরতের ফলে মদিনায় সামাজিক ক্ষেত্রে এক বিপ্লব সাধিত হয়। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মধ্যে নৈতিকতা ফিরে আসে, দুর্নীতি দূর হয়। খাজরাজ এবং আউস গোত্রদ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘ দিনের ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ ও রক্তপাত বন্ধ হয় এবং সমাজে স্থায়ী শান্তি ফিরে আসে। নবিজী সমাজ থেকে সকল অনাচার-অবিচার দূর করে সমাজকে ইসলামি আদর্শে গড়ে তোলার সুযোগ লাভ করেন। সমাজে ইসলামি অনুশাসনের মাধ্যমে সমতা ফিরিয়ে আনেন।
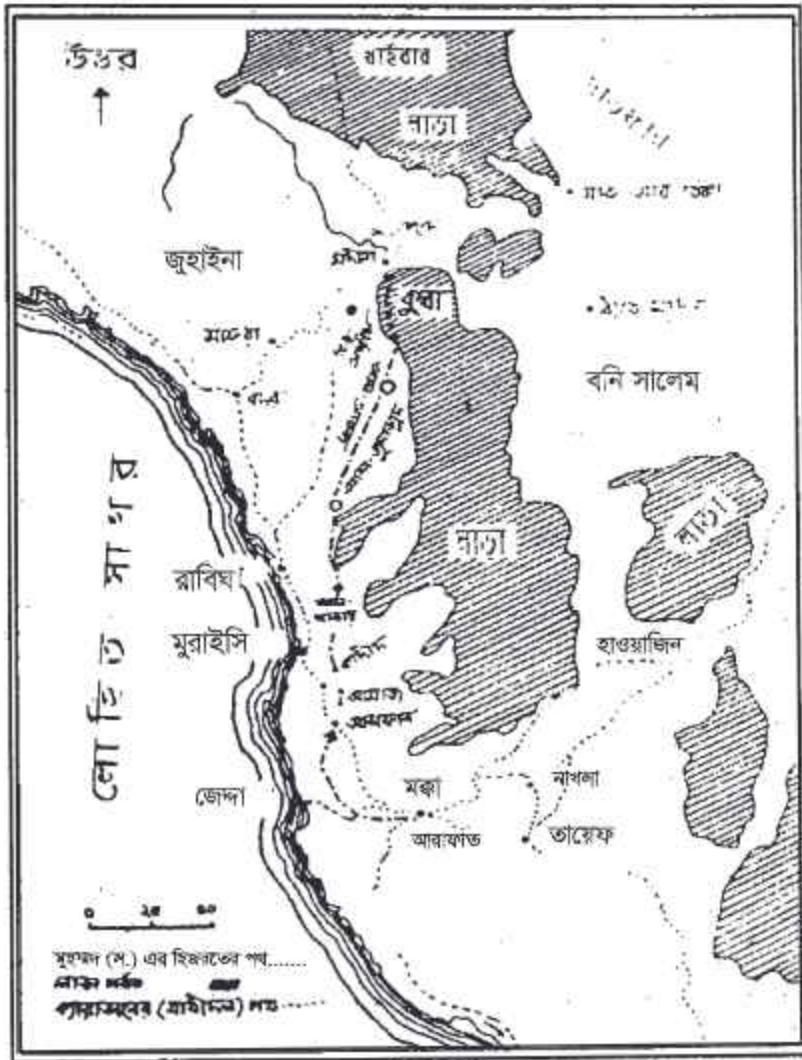
চিত্র : হিজরতের মানচিত্র।

৩. ইসলামের উত্থান : হিজরতের ফলে ইসলাম অপ্রতিহত গতিতে প্রসার লাভ করতে থাকে। ইসলাম প্রচারে মহানবি (সা.) এর উপর কোনো বাধা অবশিষ্ট থাকেনি। ফলে ইসলাম একটি সার্বজনীন ধর্ম ও জীবন-ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। মক্কায় ইসলামের প্রসার ছিল খুবই মন্থর গতিতে এবং কন্টকাকীর্ণ, মক্কায় মুসলমানগণ ছিলেন সংখ্যালঘু। আর হিজরতের ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মে পরিণত হয়। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) প্রকাশ্যভাবে দ্বীন প্রচার ও প্রসারের পরিকল্পনা ও সুযোগ লাভ করেন।

৪. রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ : মদিনায় হিজরতের ফলে মহানবি (সা.) রাষ্ট্রপতি হিসেবে আবির্ভূত হন। তিনি মদিনায় একটি কল্যাণধর্মী ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেন। মক্কায় তিনি কেবল একজন ধর্ম প্রচারক ছিলেন। কিন্তু মদিনায় একাধারে রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসক ও কূটনীতিবিদ ছিলেন। মদিনার এই ক্ষুদ্র ইসলামি রাষ্ট্র পরবর্তী কালের বৃহত্তম ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল।

৫. ইসলামের আন্তর্জাতিক রূপ লাভ : হিজরতের পূর্বে মক্কায় ইসলাম ছিল গণ্ডীবদ্ধ বহু বাধার সম্মুখীন। আর মদিনার হিজরতের ফলে ইসলাম আন্তর্জাতিক রূপ লাভ করে। ইসলামের বাণী দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। মহানবি (সা.) দূত প্রেরণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ইয়ামান, রোম ও পারস্য দেশের শাসনকর্তাদের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত পৌছে দেন। ফলে ইসলাম আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি লাভ করে।

৬. ইয়াসরিবের নতুন নামকরণ : মুহাম্মাদ(সা.) ইয়াসরিবে হিজরত করার পর ইয়াসরিবের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় মদিন্নাতুন নবি বা নবির শহর। হিজরতের পর থেকে ইয়াসরিবকে মদিনা নামে অভিহিত করা হয়। আর এ সময় থেকে হযরত উমর(রা.) পরবর্তীতে হিজরি সালের প্রবর্তন করেন।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন (নমুনা)

১. রহমতপুর গ্রামের চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ে খুবই মেধাবী। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে এখন সরকারি বড় কর্মকর্তা। অন্য দিকে একই গ্রামের রহিম মিয়ার ছেলে গ্রামের কলেজ থেকে পাশ করে কলেজে শিক্ষকতা করছে। রহিম মিয়া তার ছেলের সাথে চেয়ারম্যান সাহেবের মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তা নাকচ করে দেন। তবে চেয়ারম্যান সাহেব সম্পত্তি ভাগের ব্যাপারে এবং মেয়েদের স্বাধীনভাবে লেখাপড়ার ব্যাপারে ছিলেন খুবই উদার।

ক. মিসরীয় সভ্যতা কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল?

খ. আমুল হুযন বলতে কি বুঝ?

গ. চেয়ারম্যান সাহেব ইসলাম পূর্ব যুগের কোন প্রথার অনুসরণে বিয়ের প্রস্তাব নাকচ করে দেন, ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সম্পত্তি ভাগের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে আইয়ামে জাহেলিয়াতের নারীর মর্যাদার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? আলোচনা কর।

২. দশম শ্রেণির শিক্ষক আরমান সাহেব বললেন, মহানবি (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বযুগকে 'আইয়ামে জাহিলিয়া' বা অন্ধকার যুগ বলা হয়। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন তাহলে আইয়ামে জাহিলিয়া বা অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের ব্যাপ্তি কতটুকু? উত্তরে শিক্ষার্থী নাহিদ বললো, স্যার আপনার বক্তব্য অনুযায়ী হযরত আদম (আ.) হতে হযরত মুহাম্মাদ(সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি পর্যন্ত সময়কে অন্ধকার যুগ বলা যেতে পারে। সাঈদ নাহিদের উত্তরের বিরোধিতা করে বললো যে, হযরত ঈশা (আ.) এর তিরোধানের পর হতে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ(সা.)-এর আবির্ভাব পর্যন্ত প্রায় ছয় শতাব্দী কালকে অন্ধকার যুগ বলে চিহ্নিত করা যায়।

(ক) কোন যুগকে 'আইয়ামে জাহিলিয়া ' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়?

(খ) অন্ধকার যুগ সম্পর্কে নাহিদের বক্তব্য যথার্থ নয় কেন? ব্যাখা কর?

(গ) অন্ধকার যুগ সম্পর্কে সাঈদের বক্তব্যের যথার্থতা দেখাও।

(ঘ) অন্ধকার যুগের আরব বলতে হিজাজ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা এবং অন্ধকার যুগ বলতে সে সময়কে বুঝতে হবে কেন? বিশ্লেষণ কর।

৩. ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় জনৈক বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মহানবি (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তি পূর্বযুগ, তাঁর চরিত্র, কর্মকান্ড ও গুণাবলি সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এক পর্যায়ে তিনি তৎকালীন আরবের বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য, গোত্রকলহ ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। পরিশেষে তিনি বলেন তৎকালীন আরবের এসব অবস্থা নিরসনে সর্বশ্রেষ্ঠ নবি রূপে মহানবি (সা.) আবির্ভূত হন।

(ক) মহানবি (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্ব যুগ কী নামে পরিচিত ছিল?

(খ) সে যুগের ব্যাপ্তিকাল কত ছিল?

(গ) উক্ত যুগের মত উদ্ভূত কোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তোমার করণীয় কী? ব্যাখা কর।

(ঘ) 'মহানবি (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবি রূপে বিশ্বে আবির্ভূত হন' – উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৪. আমাদের সমাজে একটা প্রবাদ আছে– তেলে মাথায় তেল দেয়া। কিন্তু শরফুদ্দীন সাহেব এর ব্যতিক্রম। মহল্লায় বসবাস করার সময় তিনি তাঁর এলাকায় অসহায় দরিদ্র ও অত্যাচারিত মানুষের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। চাকুরি থেকে অবসরের পর তিনি 'ক' নামে একটি সেবামূলক সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর এই মহতী কর্মকাণ্ডে অনেকে এগিয়ে আসেন। আমাদের পবিত্র ইসলাম ধর্মেও এরূপ মানবকল্যাণধর্মী কাজ করার ক্ষেত্রে বিশেষ তাগিদ রয়েছে।

(ক) মহানবি (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির নাম কী?

(খ) মহানবি (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত সংগঠনটির উদ্দেশ্যাবলি কী ছিল?

(গ) শরফুদ্দীন সাহেব 'ক' নামের সংগঠনটি গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কেন?

(ঘ) মহানবি (সা.)-এর প্রতিষ্ঠিত সংস্থাটির মাধ্যমে কীভাবে তিনি আরবের মানুষের কাছে পরিচিত লাভের সুযোগ পেয়েছেন বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর।

৫. আবদুল্লাপুর গ্রামে ছোট খাটো বিষয় নিয়ে সর্বদা ঝগড়াঝাটি মারামারি লেগেই থাকত। তাদের মধ্যে নীতি- নৈতিকতার কোন বালাই ছিল না। এমন পরিস্থিতি অবলোকন করে এলাকার যুবক হুমায়ন খুবই মর্মাহত হন। এ পরিস্থিতি থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষার জন্য হুমায়ন কিছু যুবকের সমন্বয়ে একটি ভ্রাতৃসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংঘের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা ও নিঃস্ব অসহায়কে সহায়তা করা। অন্য দিকে গ্রামের মাদরাসা ভবন উদ্বোধন নিয়ে মাতবরদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এমতাবস্থায় হুমায়ন সকল মতবিরোধ অবসান করে সকলকে সাথে নিয়ে মাদরাসা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে সক্ষম হন।

ক. রাসুল (সা.) কত খ্রী. হিজরত করেন?

খ. হিলফ উল- ফুজুল বলতে কি বুঝ?

গ. হুমায়নের প্রতিষ্ঠিত ভাতৃসংঘের সাথে পাঠ্য বইয়ের কোন সংস্থার মিল খুজে পাওয়া যায়? তার উদ্দেশ্যবলী আলোচনা কর।

ঘ. মাদরাসা ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন এর সাথে রাসুল (সা.) এর জীবনের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? তোমার উত্তরের সপক্ষে মতামত দাও।

৬. জহির এলাকার একজন মহতী ছেলে। ছোট বেলা থেকেই তিনি সমাজ সেবার কাজে নিয়োজিত। এলাকাবাসী তাকে পছন্দ করতো ও বিশ্বাস করত। কিন্তু এলাকার কিছু স্বার্থান্বাষী ব্যক্তি তাকে অপছন্দ করে তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। অবস্থা টের পেয়ে তিনি এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র তার আত্মীয়ের বাড়ি চলে যান।

ক. পবিত্র কুরআনে মক্কা নগরীকে কি বলা হয়?
খ. জাজিরাতুল আরব বলতে কি বুঝ?
গ. জহির এর এলাকা ত্যাগ এর ঘটনার সাথে রাসুল (সা.) এর জীবনের কোন ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ইসলামের ইতিহাসে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এর মদিনায় গমন একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা – বক্তব্যটির যথার্থতা প্রমাণ কর।

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। 'উম্মুল কুরা' বলা হয় কোন স্থানকে?

(ক) আরব (খ) মদিনা
(গ) মক্কা (ঘ) বসরা।

আরবভূমি ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের মিলনস্থলে অবস্থিত। এদেশের মাটি পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা। আরব শব্দের উৎপত্তি নিয়ে নানা রকম মতামত রয়েছে।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ২-৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২। আরব শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে–

(ক) মরুভূমি (খ) বাগ্মিতা
(গ) আরাবা (ঘ) আদি নগরী

৩। আরব শব্দের উৎপত্তি হয়েছে–

i. "আরাবা" থেকে
ii. 'ইয়ারা' থেকে
iii. 'আবহার' থেকে

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i এবং iii
(গ) ii এবং iii (ঘ) i,ii এবং iii

৪। আরবের একটি নগরীকে 'উম্মুল কুরা' বলার কারণ–

(ক) ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকার মিলনস্থলে অবস্থিত
(খ) এখানকার মাটি পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা
(গ) অধিকাংশ স্থান মরুময়
(ঘ) প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি

৫। মরুবাসী বেদুইনদের অন্যতম আহার্য কী?

(ক) খেজুর (খ) গরুর মাংস
(গ) উটের মাংস (ঘ) উটের দুধ

শিক্ষক **শ্রেণিকক্ষে** আরব উপদ্বীপের ভৌগোলিক অবস্থা ও সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার প্রণালী নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তিনি সমীরকে জিজ্ঞেস করলেন, ভূ-প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে আরবের অধিবাসীদের কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে? এরপর তিনি সুমাইয়াকে বললেন, মরুবাসী বেদুইনদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলো। উত্তরে সুমাইয়া বললো, আরবরা খুবই অতিথি পরায়ণ। কেননা তারা অতিথি শত্রুকেও আদর আপ্যায়ন করতো। শিক্ষক অবশেষে বললেন মানুষের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও আচার আচরণের উপর ভৌগোলিক প্রভাব ব্যাপক।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬-৮ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৬। শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর সামিরের জবাব কি হবে?

(ক) দুই ভাগে (খ) চার ভাগে
(গ) তিন ভাগে (ঘ) পাঁচ ভাগে।

৭। সুমাইয়ার জবাবের সাথে বেদুইনদের বৈশিষ্ট্য হিসাবে আরো কি যুক্ত হতে পারে?

i. নিষ্ঠুর প্রকৃতির
ii. কওম চেতনা
iii. স্থায়ীভাবে বসবাস

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i এবং ii
(গ) iii (ঘ) i এবং iii

৮। ভৌগোলিক প্রভাবের ফলে মরুবাসী আরবরা মূলত–

(ক) শহরমুখী (খ) ভবিষ্যৎমুখী
(গ) যুদ্ধাংদেহী (ঘ) অতীতমুখী

৯। মেসোপটেমীয় সভ্যতা হচ্ছে–

i. নগর সভ্যতা
ii. আইন শাস্ত্র ভিত্তিক সভ্যতা
iii. নীতি ধর্মভিত্তিক সভ্যতা

মুহাম্মাদ

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii এবং iii
(গ) i এবং ii (ঘ) i এবং iii

রাফি বললো, হযরত মুহাম্মাদ(সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বযুগকে আইয়ামে জাহেলিয়া বলা হয়। রিমি বললো, তবে সমগ্র আরব অঞ্চলকে কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আইয়ামে জাহেলিয়া বলা যায় না।
উপরের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১০-১১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

১০। আইয়ামে জাহেলিয়া সম্পর্কে রাফির বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় কারণ, তাহলে–

i. পূর্ববর্তী সকল নবি রাসুল(সা.)কে অস্বীকার করা হয়
ii. পূর্ববর্তী সকল সভ্য জাতি ও সভ্যতাকে অস্বীকার করা হয়
iii. আরব জাতির কৃতিত্বকে ম্লান করা হয়।

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i এবং iii
(গ) i এবং ii (ঘ) ii এবং iii

১১। রিমির বক্তব্য অনুযায়ী সমগ্র আরবভূমিকে আইয়ামে জাহেলিয়া অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। তাহলে আইয়ামে জাহেলিয়ার অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল কোনটি?

(ক) সমগ্র উত্তর আরব (খ) হিজাজ ও পার্শ্ববর্তী এলাকা

(গ) হীরা নগরী (ঘ) হিমাইয়ারী রাজ্য

১২। হযরত মুহাম্মাদ(সা.) কতো খ্রিষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন–

(ক) ৫২০ (খ) ৫৭৯

(গ) ৫৭০ (ঘ) ৫৮২

১৩। আ-মুল-ফিল বা হস্তি বর্ষ বলা হয় কোন খ্রিষ্টাব্দকে?

(ক) ৫৭০ (খ) ৫৮২

(গ) ৫৭৯ (ঘ) ৬১০

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে মহানবি (সা.) এর জীবন ও কর্ম নিয়ে পূর্ববর্তী পাঠের পুনরালোচনা করছিলেন। শিক্ষকের অনুরোধে ফয়সাল আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বললো, হযরত মুহাম্মাদ(সা.) বাল্যকাল থেকেই আর্ত পীড়িত, অসহায় ও গরীব দুর্বলদের প্রতি জালিম ও ধনীদের অত্যাচারের নিরসন করার চিন্তা ও চেষ্টা করতেন। এজন্য তিনি একটি বিশেষ কমিটি বা সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। শিক্ষক বললেন, সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় তোমরাও মহানবি (সা.)-এর আর্দশ অনুসরণ করতে পার। উপরের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৪ ও ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

১৪। হযরত মুহাম্মাদ(সা.) গঠিত কমিটির নাম কি ছিল?

(ক) হারবুল ফুজ্জার (খ) হিলফ-উল-ফুজুল

(গ) আ-মুল-ফিল (ঘ) সমবায়

১৫। হযরত মুহাম্মাদ(সা.)-এর গঠিত কমিটির উদ্দেশ্য ছিল–

i. নিঃস্ব, অসহায় ও দুর্গতদের সাহায্য করা

ii. অত্যাচারীকে সাহায্য করা

iii. শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i এবং iii

(গ) i এবং ii (ঘ) ii এবং iii

১৬। বর্তমানে তোমার এলাকার কোনো সামাজিক সমস্যা নিরসনকল্পে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এর আদর্শ মোতাবেক তুমি কী করবে?

(ক) অত্যাচারীকে নিজে বাধা দেবে (খ) আইনের আশ্রয় নেবে

(গ) অত্যাচারিতকে সাহায্য করবে (ঘ) কমিটি বা সংগঠন গড়ে তুলবে

নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বেই মক্কাবাসীগণ হযরত মুহাম্মাদ(সা.) কে 'আল-আমীন' নামে ডাকতো। কিন্তু নবুয়ত প্রাপ্তির পর মক্কাবাসি কুরাঈশগণ ইসলামের আহ্বানের প্রচন্ড বিরোধিতা করেছিল। এমন কি তাদের বিরোধিতার কারণে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) কিছুদিন গোপনে ইসলাম প্রচার করেছিলেন।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৭, ১৮ ও ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

১৭। মক্কাবাসিগণ হযরত মুহাম্মাদ(সা.) কে 'আল-আমিন' হিসাবে বিশ্বাস করতো তার প্রমাণ পাওয়া যায়–

(ক) তাঁকে 'আল-আমীন' নামে ডাকায় (খ) মক্কাবাসীগণ ইসলাম গ্রহণ করায়

(গ) হাজরে আসওয়াদ স্থাপনের ঘটনায় (ঘ) তাঁর ওপর কুরআন নাযিল হওয়ায়

১৮। হযরত মুহাম্মাদ(সা.) কত বছর গোপনে ইসলাম প্রচার করেছিলেন?

(ক) ১০ বছর (খ) ৮ বছর

(গ) ৫ বছর (ঘ) ৩ বছর

১৯। মক্কাবাসি কুরাঈশগণ ইসলামের প্রচন্ড বিরোধিতা করেছিল কারণ–

i. তৌহিদ কুরাইশদের নীতি বিরুদ্ধ

ii. অর্থোপার্জন বন্ধের ভয়

iii. গোষ্ঠীগত বিদ্বেষ

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) iii

(গ) i এবং iii (ঘ) ii এবং iii

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর মাদানি জীবন (৬২২-৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)

প্রথম পরিচ্ছেদ

মদিনার অধিবাসী ও সনদ

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর মদিনায় আগমনের পূর্বে মদিনার সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। মদিনায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার মতো কোন কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। এ সময় আউস ও খাযরাজ নামে মদিনার দুটি গোত্র পরস্পর হিংসাত্মক কলহ-বিবাদে লিপ্ত ছিল। মদিনায় বসবাসরত ইহুদিগণ তখন তিনটি শাখায় বিভক্ত ছিল (১) বানু কাইনুকা (২) বানু নাজির ও (৩) বানু কুরাইযা। তাদের স্বার্থপরতা ও চক্রান্তের ফলে মদিনার অন্যান্য অধিবাসী উদ্বেগ ও সংশয়ের মধ্যে দিনাতিপাত করত। এরূপ অবস্থায় হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর মদিনায় আগমনকে মদিনাবাসী আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায়। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর নেতৃত্বে তারা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন জীবন লাভ করে। বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির পরিবর্তে মদিনায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাথমিক কার্যাবলি : হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করলে ইসলামের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। তিনি মদিনায় মসজিদে নববি নামে ইসলামের প্রথম মসজিদ স্থাপন করেন। এর নির্মাণ কাজে তিনি অন্যান্য মুসলমানদের সাথে কাজ করেন। এখানে তিনি ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলি সম্পাদন করতেন এবং সপরিবারে বসবাস করতেন।

মহানবি (সা.) মক্কা থেকে হিজরতকারী মুসলমানদের 'মুহাজিরিন' এবং আশ্রয় দানকারী মদিনার মুসলমানদের 'আনসার' অর্থ সাহায্যকারীরূপে অভিহিত করেন। মদিনায় তখন পাঁচ শ্রেণির অধিবাসী ছিল। যথা মুহাজিরিন, আনসার, ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিক। এ সময় স্বার্থ হাসিলের জন্য অনেকে ইসলাম গ্রহণ করলেও মনেপ্রাণে তারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে গ্রহণ করতে পারেনি। সংকটময় মুহূর্তে তারা তাঁর বিরোধিতা করত। সেজন্য তাদের মুনাফিক (বহুবচনে 'মুনাফিকিন') বলা হত। মদিনা জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাদের কারণে অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং তিনি অত্যন্ত কৌশলে তাদের মোকাবিলা করেন। এ দলের নেতা ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইবনু সালুল।

মদিনার সনদ ও ইসলামি রাষ্ট্র গঠন

সনদের প্রয়োজনীয়তা : মহানবি (সা.) মক্কা হতে ইয়াসরিবে হিজরত করার পর এমন কতোগুলো সমস্যার সম্মুখীন হন যার জরুরি সমাধান অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রথমত মক্কার কুরাইশ মুহাজির এবং স্থানীয় ইয়াসরিববাসী আনসারদের মধ্যকার অধিকার ও কর্তব্যের সীমারেখা টানা, দ্বিতীয়ত মুহাজিরদের বাসস্থান ও জীবিকার সংস্থান করা, তৃতীয়ত কুরাইশদের হাতে ক্ষতিগ্রস্থ মুহাজিরদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, চতুর্থতঃ মদিনার অমুসলমান বিশেষত ইহুদিদের সাথে একটি সমঝোতায় পৌছা, পঞ্চমতঃ মদিনা নগরীর রাজনৈতিক সংগঠন এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করা, ষষ্ঠতঃ মদিনার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় রূপরেখা প্রণয়ন করে মদিনাবাসীদের মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আইনগত

কাঠামো গঠন করা এবং সর্বোপরি ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং মুসলমানদের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার তাগিদে মুসলিম ও অমুসলিম প্রত্যেকের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং অধিকার নিশ্চিতকরণ। এ সমস্ত সমস্যার সমাধানকল্পে নবি করিম (সা.) ইয়সরিবের পৌত্তলিক, ইহুদি, আনসার ও মুহাজিরদের জন্য যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন তা হল 'কিতাব আর রাসুল' বা 'সহিফা রাসুল' সংক্ষেপে মদিনার শাসনতন্ত্র বা মদিনার সনদ।

সনদের গুরুত্বপূর্ণ ধারাসমূহ ঃ

১. সনদের শরীক দলের সকলে অন্যান্য লোকদের থেকে স্বতন্ত্র একটি উম্মাহ বা জাতি।

২. এই সনদে অঙ্গীকারাবদ্ধ লোকদের জন্য ইয়াসরিব উপত্যকা পবিত্র।

৩. মদিনায় অতর্কিত হামলাকারীদের বিরুদ্ধে তারা একে অপরকে সাহায্য করবে।

৪. যে সকল ইহুদি আমাদের অনুসারী হবে তারা আমাদের সাহায্য ও সহানুভূতি পাবে। এ সম্পর্ক ততদিন বর্তমান থাকবে যতদিন তারা মুসলমানদের ক্ষতি করবে না।

৫. ইহুদি সম্প্রদায়ের মিত্রগণও সমান স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা ভোগ করবে।

৬. যুদ্ধের সময় ইহুদিগণ মুসলমানদের সঙ্গে সমভাবে যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করবে।

৭. কোন মুমিন একজন মুশরিকের জন্য একজন মুমিনকে হত্যা করবে না বা কোন মুশরিক মুমিনের বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না।

৮. কেউ কুরাইশদের বা অন্য কোন বহিঃশত্রুদের সাথে মদিনাবাসীর বিরুদ্ধে কোনরূপ ষড়যন্ত্র করতে পারবে না।

৯. কোন ব্যক্তি অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এর জন্য তার সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না।

১০. মুসলমান ও অমুসলমান সকলে নিজ নিজ ধর্ম পালন করবে।

১১. মহানবি (সা.) এর অনুমতি ছাড়া মদিনার কোন সম্প্রদায় কারও বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারবে না।

১২. এই সনদের লোকদের মধ্যে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে তা মীমাংসার জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল মুহাম্মাদ (সা.)এর উপর ন্যস্ত করতে হবে।

১৩. আশ্রিত ব্যক্তি আশ্রয়দানকারীর মতই, যতোক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো অন্যায় বা বিশ্বাসঘাতকতা করবে না।

১৪. এই সনদে যা আছে আল্লাহ তার সত্যতার সাক্ষী এবং রক্ষাকারী।

১৫. আল্লাহ সৎ ও ধর্মভীরুদের রক্ষাকারী এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসুল।

সনদের গুরুত্ব

প্রথম লিখিত সংবিধান : মদিনা সনদ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব প্রথম লিখিত সংবিধান। ইতোপূর্বে শাসকের ঘোষিত আদেশই ছিল আইন। মহানবি (সা.) সর্ব প্রথম জনগনের মঙ্গলার্থে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। রাষ্ট্রীয় শাসনে দেশের সকল সম্প্রদায় ও জনগণের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তিনি এই সনদ প্রণয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন। বস্তুত মদিনার সনদে নাগরিক সাম্যের মহান নীতি, আইনের শাসন, ধর্মের স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা, সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ঘোষিত হওয়ায় এই সনদকে মহাসনদ বলা হয়।

রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় : মদিনা সনদ মুসলিম ও অমুসলিম সম্প্রদায়কে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে হিংসা, দ্বেষ ও কলহের অবসান ঘটায়। বিপদে একে অপরকে সাহায্য করার জন্য তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। মদিনা রাষ্ট্র তথা ইসলামি প্রজাতন্ত্র সংরক্ষণে সকলের সমভাবে যুদ্ধ ব্যয় বহন করার ব্যবস্থা, হযরত মুহাম্মাদ(সা.) -এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক।

সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা : মদিনা সনদ গোত্র প্রথার বিলোপ সাধন করে ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর রাষ্ট্র, সমাজ ও ধর্মীয় অনুশাসন পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করে। অধ্যাপক পি, কে, হিট্টি বলেন, মদিনা প্রজাতন্ত্রই পরবর্তীকালে বৃহত্তম ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল স্থাপন করেন।

ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান : মদিনা সনদ মুসলমান ও অমুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করে। মদিনার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা একে অপরের ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এ শর্ত দ্বারা যে মহানুভবতা ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দেন তা বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই বিরল। সর্বগুণান্বিত, সর্বশ্রেষ্ঠ যুগান্তকারী এ মহাপুরুষ তৎকালীণ বিশ্বে ধর্ম ও রাজনৈতিক সমন্বয়ে যে ইসলামী উম্মাহ বা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন, উত্তরকালে ইহা বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করে।

মদিনার পুনর্গঠন ও মহানবির (সা.) এর শ্রেষ্ঠত্ব : মদিনা সনদের মাধ্যমে মহানবি (সা.) দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত আরব জাহানকে একতাবদ্ধ করার একটি মহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত মদিনা নগরীর পুনর্গঠনের প্রয়াস পান। উপরন্তু এই সনদে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা, কূটনৈতিক দূরদর্শিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিকাশের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ যুগান্তকারী মহাপুরুষরূপে আর্বিভূত হন।

ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা : মদিনা সনদের শর্তসমূহ হতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম সমাজের চরম কর্তৃত্ব আরব গোত্রীয় প্রধানদের নিকট হতে হযরত মুহাম্মাদ(সা.)এর উপর এবং তদূর্ধ্বে আল্লাহ্ তাআলার উপর ন্যস্ত হয়েছে। এই সনদ আল্লাহর সর্বময় প্রভুত্বের ধারণা প্রচারিত করে। এ যাবৎ আরবদের নিকট তা একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। মুসলিম সমাজের জনসাধারণকে তাদের গোত্রীয় স্বাধীনতার একটি বিশেষ অংশ পরিহার করে ঐশী নির্দেশের নিকট আনুগত্য স্বীকার করতে হয়েছিল। সুতরাং মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজ তখন ঐশীতন্ত্রে পরিণত হল। ফলে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত বিধানের আলোকে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনীয় দায়িত্ব নবি হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এর উপর পূর্ণাঙ্গ ভাবে ন্যস্ত হলো। প্রকৃত প্রস্তাবে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য বর্তমান থাকল না। নবজাত মুসলিম রাষ্ট্র ইসলাম ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রে পরিণত হল। বস্তুতপক্ষে, মদিনা সনদের কতোগুলো ধারা হতে প্রতীয়মান হয় যে, মদিনা রাষ্ট্র ছিল একটি কল্যাণকর রাষ্ট্র। সে রাষ্ট্রে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলের নাগরিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার স্বীকৃত ছিল। এ রাষ্ট্রে সকল গোত্রের যোগদানের সুযোগ উন্মুখ ছিল। সে রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ধর্মীয় অধিকার, সামাজিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক মর্যাদাবোধ, আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস এবং নবি ও রাষ্ট্র প্রধান হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ(সা.)- এর নেতৃত্ব স্বীকৃত ছিল। এ রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামোর যে ধাচ মুহাম্মাদ(সা.) তৈরি করেছিলেন এর উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীতে খলিফাগণ যুগোপযোগী নীতিমালা সংযোজন করে অধিকতর কল্যাণকর প্রশাসন কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
যুদ্ধ ও শান্তি নীতি
বদরের যুদ্ধ (মার্চ, ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

হিজরতের পর মদিনায় ইসলামের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও প্রসার, হযরত মুহাম্মাদ(সা.)-এর প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও কর্মকাণ্ডে সাফল্য লাভ এবং মদিনা নগরীর শাসন শৃঙ্খলা উন্নত হওয়ায় মক্কার কুরাইশদের মনে তীব্র অসন্তোষ ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এই ঈর্ষা ও শত্রুতা থেকেই পৌত্তলিক মক্কাবাসী মহানবি (সা.) এর সঙ্গে প্রথম যে সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটায় ইসলামের ইতিহাসে তা 'গাজওয়ায়ে বদর' (غَزْوَةُ بَدْرٍ) বা বদর যুদ্ধ নামে পরিচিত।

বদরের যুদ্ধের কারণ :

মক্কার কুরাইশদের শত্রুতা : মদিনায় ধর্মভিত্তিক ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামকে আন্তর্জাতিকীকরণে মহানবি (সা.) এর প্রচেষ্টায় মক্কার কুরাইশগণ ঈর্ষান্বিত হয়। তারা জন্মভূমি মক্কা হতে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) কে বিতাড়িত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তাঁর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধপ্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

আবদুল্লাহে ইবনে উবাই-এর ষড়যন্ত্র :

হযরত মুহাম্মাদ(সা.) -এর অসামান্য প্রাধান্য খর্ব করার জন্য বানু খাযরাজ বংশীয় আবদুল্লাহ বিন উবাই নামক একজন প্রতিপত্তিশালী মুনাফিক নেতা গোপনে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। কেননা হিজরতের পূর্বে মদিনায় তার শাসকরূপে অধিষ্ঠিত হবার কথা ছিল; কিন্তু ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও মদিনা সনদের পরিপ্রেক্ষিতে তার আশা পূর্ণ হয়নি। এর ফলে সে মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে দুরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপে নিয়োজিত হয় এবং মদিনায় হযরত মুহাম্মাদ(সা.)-এর বিরুদ্ধে প্রচারণা ও বিরুদ্ধাচরণ দ্বারা একটি মুনাফিক দল গঠন করে। ইসলামের প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য স্বীকার করলেও আবদুল্লাহর নেতৃত্বে মুনাফিক দল হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এর বিরুদ্ধে শত্রুতা করেন।

মদিনার ইহুদিদের ষড়যন্ত্র :

মদিনার ইহুদি সম্প্রদায় প্রথমে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) কে সানন্দে বরণ করলেও তাঁর ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি ও সুনাম তাদেরকে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ করে তোলে। মদিনা সনদে তাদেরকে সকল প্রকার ধর্মীয় ও নাগরিক স্বাধীনতা প্রদান সত্ত্বেও ইহুদিগণ কোনদিনই মুসলমানদের প্রতি ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব প্রকাশ করেনি। উপরন্তু মদিনা সনদের শর্ত লংঘন করে তারা কুরাইশদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও গুপ্ত সংবাদ প্রেরণ করে ইসলাম ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিলোপ সাধন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। এমনকি তারা মদিনা আক্রমণের জন্য শত্রুদেরকে প্ররোচিত করতে থাকে। সৈয়দ আমীর আলী যথার্থই মন্তব্য করেন, 'সমগ্র মদিনা বিদ্রোহ ও বিশ্বাসঘাতকতায় ভরে গিয়েছিল।'

আর্থিক কারণ : মক্কা হতে সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বাণিজ্য পথে মদিনা অবস্থিত ছিল। এই জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে মদিনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাণিজ্য পথ ব্যতীত এই পথটি হজ্জ যাত্রীদের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মুহাম্মাদ(সা.) কর্তৃক মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে কুরাইশগণ নির্বিঘ্নে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ হারাতে পারে এ আশঙ্কায় মদিনার ইসলামি রাষ্ট্রের পতন ঘটানোর জন্য তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

কুরাইশদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ : পবিত্র কা'বা গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকায় সমগ্র আরবের পৌত্তলিকদের মধ্যে কুরাইশদের অপরিসীম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মক্কা ও মদিনার বাণিজ্য পথে বসবাসকারী বিভিন্ন আরব গোত্র কুরাইশদের সাথে গোপনে যোগসূত্র স্থাপন করে রাসুল (সা.)এর বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকলে মুসলমানদের নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। মদিনার সীমান্তবর্তী এলাকায় কুরাইশগণ অথবা তাদের সাহায্যকারী আরব গোত্র মুসলমানদের শস্যক্ষেত্র জ্বালিয়ে দিত, ফলবান বৃক্ষ ধ্বংস করত এবং উট ও ছাগল অপহরণ করত। এই প্ররোচণামূলক ও হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য মহানবি (সা.) আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

নাখলার খণ্ডযুদ্ধ : কুরাইশদের ক্রমবর্ধমান আক্রমণ ও লুটতরাজ বন্ধ করার জন্য মুহাম্মাদ(সা.) হযরত আবদুল্লাহ ইবন জাহাশের নেতৃত্বে ১২ জনের একটি গোয়েন্দা দল সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রেরণ করেন। হযরতের নির্দেশ অনুযায়ী তিনদিন পর সীলমোহরকৃত আদেশপত্র উন্মোচন করে হযরত আবদুল্লাহ সঙ্গীদের নিয়ে নাখলার দিকে অগ্রসর হওয়ার এবং মক্কা কাফেলার জন্য অপেক্ষা করার নির্দেশ পেলেন। লক্ষণীয় যে মহানবি (সা.) কাফেলার উপর আক্রমণ করতে আদেশ করেন নি। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ (রা.) ভুলক্রমে চারজন যাত্রীর মক্কার এক কাফেলার উপর আক্রমন করলে নাখলায় একটি খন্ডযুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর ফলে কুরাইশ নেতা আমর বিন হাযরামী নিহত ও অপর দুইজন বন্দী হয়। নাখলার খণ্ড যুদ্ধকে বদরের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু এটি ছিল একটি অজুহাত মাত্র। কেননা তারা অনেকদিন আগ থেকেই ইসলামের উত্তরোত্তর শক্তি বৃদ্ধিতে চিন্তিত হয়ে এর ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হয়।

আবু সুফিয়ানের কাফেলা আক্রমণের মিথ্যা গুজব : ইসলামের ঘোরতর শত্রু আবু সুফিয়ান অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বাণিজ্যের অজুহাতে এক কাফেলা নিয়ে সিরিয়া গিয়েছিল। নাখলা যুদ্ধে বিপর্যস্ত হয়ে কুরাইশগণ মক্কায় কাফেলার নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এসময় এক ভিত্তিহীন জনরব উঠল যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা মদিনার মুসলমান অধিবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। এ গুজবের সত্যতা যাচাই না করেই আক্রমনাত্মক নীতি অনুসরণ করে আবু জাহল ১০০০ সৈন্য নিয়ে আবু সুফিয়ানের সাহায্যার্থে মদিনা অভিমুখে রওয়ানা হয়।

বদর যুদ্ধের ঘটনা

এমতাবস্থায় মহানবি (সা.) ঐশীবাণী লাভ করে অনুপ্রাণিত হলেন। ওহি নাযিল হয় 'আল্লাহর পথে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে'। সাথে সাথে মহানবি (সা.) নেতৃস্থানীয় সাহাবাদের পরামর্শে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় আনসার এবং মুহাজির নিয়ে গঠিত মাত্র ৩১৩ জনের একটি মুসলিম বাহিনী কুরাইশ বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্য বদর অভিমুখে রওনা হয়।

মদিনা থেকে ৮০ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বদর উপত্যকায় ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ মার্চ (১৭ই রমযান, জুমুআবার দ্বিতীয় হিজরি) মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে কুরাইশদের সংঘর্ষ হয়। হযরত মুহাম্মাদ(সা.) স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করেন। আল-ওয়াকিদী বলেন- হযরত মুহাম্মাদ(সা.) মুসলিম সৈন্য সমাবেশের জন্য এমন একটি স্থান বেছে নেন যেখানে সূর্যোদয়ের পরে যুদ্ধ শুরু হলে কোন মুসলমান সৈন্যের চোখে সূর্য কিরণ পড়বে না। প্রথমে প্রাচীন আরব রেওয়াজ অনুসারে মল্লযুদ্ধ হয়। মহানবির নির্দেশে হযরত আমির হামজা (রা.), হযরত আলী (রা.) ও হযরত আবু ওবায়দা (রা.) কুরাইশ পক্ষের নেতা উতবা, শায়বা এবং ওয়ালিদ বিন উতবার সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এতে শত্রুপক্ষীয় নেতৃবৃন্দ শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও নিহত হয়। উপায়ন্তর না দেখে আবু জাহলের নেতৃত্বে কুরাইশগণ মুসলমানদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। তারা মুসলমানদের উপর প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ চালাতে লাগল, কিন্তু প্রতিকূল অবস্থায় সংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল মুসলিম বাহিনীর মোকাবিলা করা কুরাইশদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। অসামান্য রণ-নৈপুণ্য, অপূর্ব বিক্রম ও অপরিসীম নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে মুসলমানগণ কুরাইশগণকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। বদর যুদ্ধে মহান আল্লাহ হাজার হাজার ফেরেশতা পাঠিয়ে মুসলিম বাহিনীকে সাহায্য করেন। এ যুদ্ধে ৭০ জন কুরাইশ

সৈন্য নিহত হয় ও সমসংখ্যক সৈন্য বন্দি হয়। অপরদিকে মাত্র ১৪ জন মুসলিম সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। আবু জাহল এ যুদ্ধে নিহত হয়। হযরত মুহাম্মাদ(সা.) যুদ্ধবন্দীদের প্রতি যে উদার ও মধুর ব্যবহার করেন তা তাঁর মহানুভবতার পরিচয় বহন করে। মুক্তিপণ গ্রহণ করে কুরাইশ বন্দীদেরকে মুক্তি প্রদান করা হয়। মাত্র ৪০০০ দিরহাম মুক্তিপণ নির্ধারিত হয়। যারা মুক্তিপণ দিতে অক্ষম তারা মুসলমানদের বিরোধিতা না করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে ও মুসলমান বালককে শিক্ষাদান করে মুক্তি লাভ করে।

বদর যুদ্ধের গুরুত্ব

সামরিক প্রজ্ঞার পরিচয় : বিশাল কুরাইশ বাহিনী স্বল্পসংখ্যক মুসলিম সৈন্যের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলে অমুসলিমরা ইসলাম ধর্ম ও মদিনা রাষ্ট্রের সামরিক শক্তি সম্বন্ধে ভীত হয়ে উঠে। সৈন্যসংখ্যা যুদ্ধে ভাগ্য নির্ধারণ করে এ ধারণা ভ্রান্তিতে পরিণত হয় এবং মুসলমানদের মনে অসামান্য সাহস, উদ্দীপনা ও আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার করে যা মুসলমানদের ভবিষ্যতের যুদ্ধ জয়ের এক দুর্বার আকাঙ্খায় উদ্বুদ্ধ করে।

ইসলাম প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি : বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিজয় ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সম্প্রসারণের সূচনা করে এবং পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে (৬২৪-৭২৪) ইসলাম পশ্চিমে আফ্রিকা হতে পূর্বে ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। যোসেফ হেল বলেন– পরবর্তীকালে সমস্ত সামরিক বিজয় এ যুদ্ধে সর্বপ্রথম প্রদর্শিত ও বিকশিত আরব গুণাবলির জন্যই সম্ভব হয়। যথা– শৃঙ্খলা ও মৃত্যুর প্রতি অবহেলা। হযরত মুহাম্মাদ(সা.) যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে নির্দেশ দেন, তোমরা কেউ সারি ভেঙে এগিয়ে যেওনা এবং আমার আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করো না।
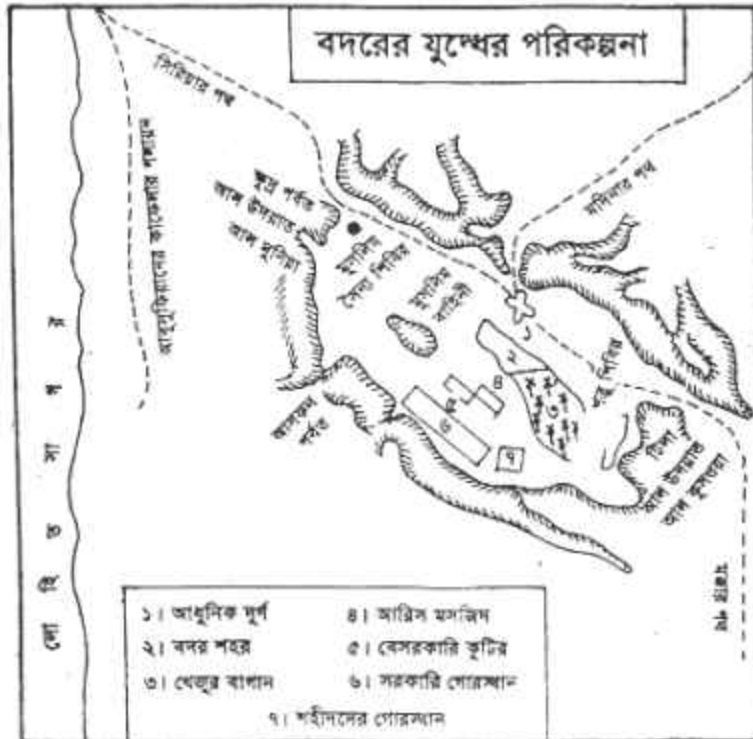
চিত্র : বদরের যুদ্ধক্ষেত্র

চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধ : মক্কার প্রায় এক সহস্র বীর সেনার বিরুদ্ধে তিনশত তের জন মুসলমানের যুদ্ধাভিযান যে অজ্ঞতার বিরুদ্ধে জ্ঞানের, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের সংঘর্ষ তা নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে। এ যুদ্ধে জয়লাভ না করলে ইসলাম শুধু রাষ্ট্র হিসেবেই নহে ধর্ম হিসেবেও পৃথিবীর বুক হতে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি : বদরের যুদ্ধ মুষ্টিমেয় মুসলমানদের মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদের অনুপ্রেরণা প্রদান করে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের সাহায্যকারী। ধর্মযুদ্ধে জীবিত অবস্থায় গাজী ও মৃত্যুতে শহীদ হওয়ার প্রেরণা এবং পারলৌকিক পুরস্কার লাভের বাসনা তাদের পরবর্তী বিজয়গুলোতে প্রভাব বিস্তার করে।

রাজনৈতিক নেতা হিসেবে মুহাম্মাদ (সা.)-এর স্বীকৃতি : বদরের যুদ্ধ বিজয় ইসলাম প্রচারে নব দিগন্তের সূচনা করে। ইসলামের মর্যাদা ও দক্ষতা বৃদ্ধির কথা এবং গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলের কথা চিন্তা করে নিকলসন বলেন, বদরের যুদ্ধ ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় যুদ্ধের অন্যতম। বদরের প্রান্তরে বিজয় লাভের ফলে সকলের দৃষ্টি মুহাম্মাদ(সা.) এর উপর নিবদ্ধ হল। আরবগণ তাঁর ধর্মকে যতই উপেক্ষা করুক না কেন, তাঁকে সম্মান না করে পারল না। এ যুদ্ধ ইসলামকে মদিনা প্রজাতন্ত্রের ধর্ম হতে একটি সুসংঘবদ্ধ রাষ্ট্রের ধর্মে উন্নীত করে।

ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের মনে ভীতি : ইহুদি ও খ্রিষ্টান আরবগণ ইসলামের অসীম ক্ষমতার বিরুদ্ধাচরণ হতে সাময়িকভাবে বিরত থাকল। মুনাফিকগণ ধর্মদ্রোহিতার জঘন্য পাপাচার হতে ক্ষণিকের জন্য নিবৃত্ত রইল। বিধর্মীরা হযরতের ঐশ্বরীক ক্ষমতায় আকৃষ্ট হল এবং মুসলমানগণ বদরের বিজয়কে আল্লাহর প্রতিশ্রুত পুরস্কারস্বরূপ গ্রহণ করে তাওহিদ ও নবুয়তে বিশ্বাস।

বিশ্ব বিজয়ের সূচনা : বদরের যুদ্ধের মহাবিজয় ইসলামকে কেবল আরবেই নয়, অনারব অঞ্চলও সার্বজনীন করে তোলে। এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকার জনৈক লেখক বলেন, বদরের যুদ্ধ শুধু একটি বিখ্যাত যুদ্ধই নয় এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও অপরিসীম। ইহা হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করতেও যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

রাষ্ট্র নায়কের মর্যাদা লাভ : যুদ্ধক্ষেত্র হতে বিজয়ীর বেশে মহানবি(সা.) মদিনায় ফিরে এসে পরাক্রমশালী যোদ্ধা, সুদক্ষ সমরনায়ক ও সুবিবেচক শাসকের পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেন। ঘটনাবলি বিচারে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) একজন যোগ্য ও জনপ্রিয় নেতা তা প্রমানিত হল। এ বিজয়ের ফলে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) একাধারে নবি ও রাষ্ট্র পরিচালকের দায়িত্বভার পরিচালনা করতে থাকেন। মুসলমানদের বদর বিজয় ইসলামের অপরাজেয় শক্তির পরিচায়ক। এর ফলে ইহুদি এবং খ্রিষ্টানগণ ভীত ও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার ও আচার অনুষ্ঠান পালন, রাষ্ট্রীয় কার্য তত্ত্বাবধান, যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা, দূত প্রেরণ দ্বারা বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ইসলামি রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও পরিধি বৃদ্ধি পায় এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে। তবে তাদের বিরুদ্ধাচারণ বন্ধ হয়নি। বদর যুদ্ধের গুরুত্ব সম্পর্কে অধ্যাপক পি.কে হিট্টি বলেন,ইতোপূর্বে রাষ্ট্রীয় ভিত্তি ব্যতিরেকে ইসলাম শুধু ধর্ম মাত্র ছিল। এখন থেকেই ইসলাম একটি রাষ্ট্রের ধর্মে পরিণত হল। বদরের পরে মদিনাতে এটা রাষ্ট্রীয় ধর্মের থেকেও বড় ভূমিকা পালন করেছিল। অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম নিজেই একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। সে সময় এবং সেখান থেকেই ইসলাম পরিণত হয় একটি সংগঠিত রাষ্ট্রে এবং সারা বিশ্ব তাকে সেভাবেই স্বীকৃতি দিয়েছে। এজন্য বদরের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগসন্ধিক্ষণকারী ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত।

উহুদের যুদ্ধ (৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

যুদ্ধের কারণ

বদরের যুদ্ধে কুরাইশগণ আর্থিক, সামরিক ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কুরাইশদের নেতৃস্থানীয় বীর আবু জাহল ও উতবা প্রাণ হারিয়েছিল। বদরের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ান প্রতিজ্ঞা করেন যে, প্রতিশোধ গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি নারী অথবা তৈল স্পর্শ করবেন না। এ সময় মদিনার ইহুদিগণ কুরাইশদের কুমন্ত্রণা দিতে শুরু করে। ইহুদি কবি কা'ব বিন আশরাফ কবিতা রচনা করে দুর্ধর্ষ বেদুইন সম্প্রদায়কেও প্ররোচিত করতে থাকে। মদিনার প্রাধান্য এবং ইসলামের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধিতে কুরাইশগণ আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব হারানোর আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে পড়ে। উপরন্তু হাশেমী গোত্রের হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এর একচ্ছত্র আধিপত্য লাভ এবং তার নেতৃত্ব মদিনার ক্রমোন্নতি গোত্রীর স্বার্থের পরিপন্থী হলে উমাইয়া নেতা আবু সুফিয়ানের গাত্রদাহ দেখা দেয়। বস্তুত কুরাইশ গোত্রের হাশেমী ও উমাইয়া শাখা দুটির পুরনো দ্বন্দ্ব নতুন মাত্রা লাভ করলে যুদ্ধ অবধারিত হয়ে পড়ে।

যুদ্ধের ঘটনা : আবু সুফিয়ান ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে ৩০০ উষ্ট্রারোহী ও ২০০ অশ্বারোহীসহ ৩০০০ সশস্ত্র সৈন্য নিয়ে মদিনার পাঁচ মাইল পশ্চিমে উহুদ উপত্যকায় সমবেত হলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হযরত মুহাম্মাদ(সা.) ১০০ জন বর্মধারী, ৫০ জন তীরন্দাজসহ মাত্র ১০০০ জন মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পথিমধ্যে মোনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ বিন উবাই তার ৩০০ জন অনুচরসহ দলত্যাগ করলে শেষ পর্যন্ত মাত্র ৭০০ জন মুসলিম যোদ্ধা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। মহানবি (সা.) উহুদ পাহাড়ের গোলাকার অংশের বাইরে থেকে যুদ্ধ চালাবার মনস্থির করেন এবং সেভাবে সৈন্য সমাবেশ করেন। মুসলিম শিবিরের পশ্চাতে বাম পাশে একটি গিরিপথ ছিল। পেছন দিক থেকে যাতে শত্রুরা অতর্কিত আক্রমণ করতে না পারে সেজন্য হযরত আব্দুল্লাহ ইবন যুবায়েরের নেতৃত্বে ৫০ জন তীরন্দাজকে গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথটির প্রহরায় নিযুক্ত করেন এবং মহানবি (সা.) এর সুস্পষ্ট নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত এই স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করেন। প্রথমদিকে মুসলমানরা পর পর সাফল্য লাভ করে। শত্রুবাহিনী দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন শুরু করেন। যুদ্ধের প্রাথমিক সাফল্যের উল্লাসে মুসলিম সৈন্যবাহিনী শৃঙ্খলা হারিয়ে ফেলে এবং গিরিপথের রক্ষণাবেক্ষণের পরিবর্তে গনিমাতের মাল সংগ্রহে নিয়োজিত হয়। মুসলিম বাহিনীর এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে দুর্ধর্ষ সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ পেছন থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং দ্রুত পলায়নে বাধ্য করে। স্বয়ং মহানবি (সা.) কুরাইশ গোত্রের ইবন কামিয়ার নিক্ষিপ্ত প্রস্তরাঘাতে আহত হয়ে সংজ্ঞা ও দুটি দাঁত হারান। এই যুদ্ধে বীরকেশরী হযরত আমীর হামজা (রা.) সহ ৭০ জন মুসলিম যোদ্ধা শহীদ হন। আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হামজা (রা) এর হৃৎপিন্ড চর্বণ করে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেয়। অনেক সাহাবি উহুদের যুদ্ধে আহত হন।

মুসলমানদের সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ

উহুদের যুদ্ধে কুরাইশদের সৈন্য সংখ্যা মুসলমানদের তিনগুণ ছিল। কিন্তু বিধর্মীদের সংখ্যাধিক্য যে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ হতে পারে না, ইতোপুর্বে বদর যুদ্ধেই তা প্রমাণিত হয়েছে। তাই এ যুদ্ধে মুসলমানদের সাময়িক পরাজয়ের কারণ অন্যবিধ ছিল।

নেতার আদেশ অমান্য ও শৃঙ্খলার অভাব : উহুদের যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যগণ তাঁদের নেতার আদেশ যথাযথভাবে পালন করেনি। রাসুলুল্লাহর নির্দেশ ছিল 'জয় অথবা পরাজয় কোন অবস্থাতেই মুসলিম তীরন্দাজ বাহিনী যেন গিরিপথ অতিক্রম না করে।' কিন্তু বিজয় নিজেদের করায়ত্ত মনে করে মুসলিম বাহিনী উপরিউক্ত আদেশ লঙ্ঘন করায় তাঁদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। সে সুযোগে শত্রুপক্ষ তাদের আক্রমণ করে। নেতার আদেশ লঙ্ঘন ও শৃঙ্খলার অভাবই ছিল উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের প্রধান কারণ।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিহত হওয়ার গুজব : যুদ্ধে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) নিহত হয়েছেন এমন একটি গুজব উঠলে মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি ছিল যুদ্ধে হযরত মুসআব (রা.) শাহাদাত বরণ করেছিলেন। হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এর সাথে তাঁর চেহারার সাদৃশ্য ছিল।

কর্তব্যে অবহেলা : বিজয় অবশ্যম্ভাবী মনে করে মুসলিম বাহিনী বিপুল উৎসাহে সামরিক আদর্শ রক্ষার পরিবর্তে শত্রুদের ধন-সম্পদ সংগ্রহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তাদের এই কর্তব্য জ্ঞান অপেক্ষা গণিমত লাভ প্রবল হয়ে দেখা দেয়। তাঁরা যদি তাঁদের নিজ নিজ স্থানে দৃঢ় থাকতেন, তাহলে খালিদ বিন ওয়ালিদ পশ্চাৎভাগ হতে মুসলমানদের আক্রমণ করার সুযোগ পেত না।

খালিদের রণকৌশল : মহাবীর খালিদের রণদক্ষতা ও চাতুর্য শত্রুপক্ষের সামরিক বিজয়কে সম্ভব করেছিল। মুসলিম সেনাদল যখন যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ত্যাগ করে গনিমাত সংগ্রহে ব্যস্ত, ঠিক সে মুহূর্তে বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ বিন ওয়ালিদ তাদের উপর মরণপন আক্রমণ চালায়। ফলে মুসলিম সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র হতে পলায়ন করে।

যুদ্ধের ফলাফল

উহুদের যুদ্ধ ছিল মুসলমানদের জন্য ইমান ও ধৈর্যের অগ্নি পরীক্ষা। এ যুদ্ধ তাদের ভক্তি, বিশ্বাস ও আত্ম জিজ্ঞাসার পরীক্ষা। বিজয়োল্লাসী বিধর্মী কুরাইশগণ মুসলিম বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে সাময়িক জয়লাভ করলেও প্রকৃতপক্ষে তারা মানসিক ও শারীরিক শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং এ কারণে তাদের জয় ছিল পরাজয়ের নামান্তর। উহুদের অগ্নি পরীক্ষা ইসলামের দৃঢ় সংকল্প ও আত্মনির্ভরশীলতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। বদরের প্রান্তর ইসলামের সামরিক বিজয়ের প্রতীক ছিল; কিন্তু উহুদের বিপর্যয় মুসলমানদের সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সামরিক জাতিতে পরিণত করে। উহুদের যুদ্ধের পরাজয় থেকে মুসলমানগণ যে শিক্ষা লাভ করেন তা পরবর্তী সময়ের সকল যুদ্ধে তাদের নিকট একটি অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকে।

উহুদের যুদ্ধের পর মহানবি (সা.) ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য ৪০ জন বা ৭০ জন মুসলিম ধর্ম প্রচারককে নজদ পাঠান। বিরে মাউনা নামক স্থানে উপস্থিত হয়ে উক্ত দলটি আমির গোত্রের অন্যতম নেতা আমি ইবনে তোফায়েলের নিকট দূত মারফত মহানবি (সা.) একখানা (ইসলামের) দাওয়াতপত্র পাঠান। পত্র হস্তগত হবার সাথে সাথে তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে দূতকে হত্যা করে বিরে মাউনায় সসৈন্যে গমন করে বাকি ৬৯ জনের মধ্যে ৬৭ জন মুসলমানকে হত্যা করে। বিনা যুদ্ধে এত বেশি শিক্ষিত মুসলমানদের শাহাদাত বরণ ইসলামের প্রাথমিক ইতিহাসে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

চিত্র : উহুদের যুদ্ধ ক্ষেত্র।

খন্দকের যুদ্ধ (৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ)

যুদ্ধের কারণ

কুরাইশদের আশঙ্কা : কুরাইশরা উহুদ যুদ্ধে সাময়িক জয়লাভ করলেও এতে তাদের আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হয়নি। তারা মক্কার সাথে মদিনাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এবং তাদের বাণিজ্য পথের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কোন সেনাবাহিনী মদিনায় রেখে যায়নি। ফলে কুরাইশদের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানগণ নিজেদের সংগঠিত করে পূর্বের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেন। মদিনায় মুসলমানদের এই শক্তি বৃদ্ধিতে মক্কার কুরাইশগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। তারা মনে করল যে, মুসলমানদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে তাদের আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় সুযোগ-সুবিধা চিরতরে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তারা শেষবারের মতো যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণ করল।

বেদুইনদের শত্রুতা : মদিনার শহরতলীতে বসবাসকারী বেদুঈনরা লুটতরাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাদের এ সব কার্যকলাপ বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এমনকি কয়েকবার তাদেরকে এ জন্য শাস্তি প্রদান করেন। সঙ্গত-কারণে মুসলমানদের উপর বেদুঈনরা অসন্তুষ্ট ছিল। প্রতিশোধ গ্রহণের বাসনায় তারাও কুরাইশদের সাথে হাত মিলাল।

ইহুদিদের উসকানি : উহুদ যুদ্ধের পর মদিনা হতে বানু নাজির গোত্রের ইহুদিদের বহিষ্কার করা হয়েছিল। তারা খাইবারের ওয়াদি উল কুরা ও সিরিয়ার বাণিজ্য পথে এবং অন্যান্য জায়গায় বসতি স্থাপন করল। অবিলম্বে এসব ইহুদি স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী লোকদেরকে মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে লাগল। তাদের প্ররোচনায় প্রভাবিত হয়ে সব ইহুদি গোত্রই মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। উপরন্তু তারা মক্কার কুরাইশদের মদিনা পুনরাক্রমণের জন্য অনবরত উত্তেজিত করতে থাকে।

যুদ্ধের ঘটনা : ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ মার্চ আবু সুফিয়ান কুরাইশ, ইহুদি ও বেদুইনদের একটি সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্ব দান করে ১০০০০ সৈন্যসহ মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। মহানবি (সা.) ৩০০০ সৈন্য সংগ্রহ করে এই সম্মিলিত বাহিনীকে প্রতিরোধ করার উপায় উদ্ভাবনের লক্ষ্যে পরামর্শ সভা আহবান করেন। সভায় পারস্যবাসি হযরত সালমান ফারসি (রা.)-এর পরামর্শ গৃহীত হয়। প্রস্তাব অনুযায়ী, শহরের তিন দিকে অরক্ষিত স্থানে পরিখা খনন করা হয়। পরিখা অথবা খন্দক হতেই এ যুদ্ধের নামকরণ হয়েছে 'খন্দকের যুদ্ধ'। ইংরেজি ভাষায় এ যুদ্ধকে Battle of the confederates বা সম্মিলিত শক্তিসমূহের যুদ্ধ বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এটা 'আহযাবের যুদ্ধ' নামে অভিহিত হয়েছে। আত্মরক্ষামূলক এ ব্যবস্থায় শিশু ও নারীদের নিরাপদ দুর্গ ও গম্বুজে আশ্রয় প্রদান করা হয়। উদ্ভাবনী শক্তির প্রতীক ও আত্মরক্ষার বলিষ্ঠ উপায়- এ পরিখা কুরাইশদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। আত্মরক্ষার এ অভিনব কৌশল দেখে বিধর্মী কুরাইশরা বিস্মিত হল। আপ্রাণ চেষ্টা করেও তারা মদিনায় প্রবেশ করতে সমর্থ হল না। তিন সপ্তাহের অধিককাল মদিনা অবরোধ করে অবশেষে তারা রণে ভঙ্গ দেয়। বেদুইন, কুরাইশ ও ইহুদিদের দ্বারা গঠিত ত্রি-শক্তির মধ্যে ঐক্যের অভাব, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মহানবি (সা.) এর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, রণকৌশল, মুসলিম গোয়েন্দা বাহিনীর কর্তব্যনিষ্ঠা এবং মুসলিম বাহিনীর অসাধারণ ঐক্য ও শৃঙ্খলাবোধ শত্রুপক্ষের পরাজয়ের পেছনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল।

খন্দক যুদ্ধের ফলাফল

ইসলামের ইতিহাসে খন্দক যুদ্ধের ফলাফল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

প্রথমত : **ত্রি-শক্তির পরাজয় :** বদরের যুদ্ধের মতো পরিখার যুদ্ধও ইসলামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় যুগান্তকারী ঘটনা। উহুদের যুদ্ধে কুরাইশরা যেরূপ বদরের বিপর্যয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করে তদ্রূপ উহুদের পরাজয়ের গ্লানিকে মুসলমানগণ পরিখার যুদ্ধে মোচনের চেষ্টা করে। বদরের যুদ্ধ অপেক্ষা পরিখার যুদ্ধের গুরুত্ব কোন অংশে কম নহে। কারণ বদরের প্রান্তরে মক্কার পাপিষ্ঠ কুরাইশদের পরাজিত করে ইসলামকে মদিনায় সুপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। অপরদিকে পরিখার যুদ্ধে বেদুইন, ইহুদি ও বিধর্মী কুরাইশদের সম্মিলিত শক্তিকে ধ্বংস করা হয়। এস, এম, ইমাম উদ্দিনের মতে, 'এ সম্মিলিত বাহিনী (আহযাব) ভাঙ্গনের ফলে মক্কাবাসিদের সম্পূর্ণ পরাজয় প্রতিভাত হয়ে ওঠে এবং মদিনায় মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করে। অল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম সমগ্র আরবে তথা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে বিস্তৃতি লাভ করে।'

দ্বিতীয়ত : শৃঙ্খলা ও বিশ্বাসের বিজয় : পরিখার যুদ্ধের গুরুত্ব বিচার করে জোসেফ হেল বলেন, 'পরিখার যুদ্ধের ফলাফল ছিল সংখ্যাধিক্য শক্তির উপর শৃঙ্খলা ও একতার নব বিজয়।' এর ফলে ইসলামের মর্যাদা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। উহুদের যুদ্ধে যে কারণে মুসলমাণ গণ পরাজয় বরণ করে এর পুনরাবৃত্তি হলে পরিখার যুদ্ধে ইসলাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হত। আল্লাহর প্রতি অবিচল বিশ্বাস, একতা, শৃঙ্খলা ও আত্মোৎসর্গের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব মুসলমানগণ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে বিজয় সুনিশ্চিত করেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
ইহুদিদের সাথে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর সম্পর্ক

যদিও বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের মীমাংসিত বিজয়ের ফলে মক্কার কুরাইশদের শক্তি খর্ব হয়ে পড়েছিল, তথাপি হযরত মুহাম্মাদ(সা.) নতুন বিপদের সম্মুখীন হতে লাগলেন। বদর হতে প্রত্যাগত বিজয়ী বীর হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এর শক্তি দেখে ইহুদিগণ অস্থির হয়ে উঠল। তারা আশংকা করছিল যে মুহাম্মাদ(সা.) এর এ অভূতপূর্ব ও অপ্রত্যাশিত বিজয়ের ফলে হয়তো এখন হতে মুসলমানগণ তাদের উপর প্রভুত্ব করবে। প্রথমে ইহুদিগণ মনে করল যে, মদিনাতে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এর ক্ষমতা ঋণাত্মক হবে এবং তারা তাঁকে নিজেদের দলে আনতে পারবে। কিন্তু ইহুদিগণ যখন দেখল তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না, তখন তারা হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এর বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করল। তারা ইসলাম ধর্ম এবং মুসলিম রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। ধীরে ধীরে মুসলমানদের নিকট তাদের চরিত্রের প্রকৃত স্বরূপটি উন্মোচিত করতে লাগল। ব্যাপারটি এতই গুরুতর হয়ে উঠল যে, মহানবি হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এর সঙ্গে স্বাক্ষরিত সন্ধি তারাই প্রথম ভঙ্গ করল।

ইহুদি গোত্রসমূহ

বানু কাইনুকা : মদিনার বানু কাইনুকা ইহুদি সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ছিল। বদরের যুদ্ধের অব্যবহিত পরে এ সম্প্রদায়ের একজন ইহুদি যুবক জনৈক মুসলিম তরুণীকে বাজারে প্রকাশ্যভাবে অপমান করে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একজন মুসলমান ও একজন ইহুদি নিহত হলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে ইহুদিরা যুদ্ধের হুমকি দিলে ইহুদি ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। হযরত মুহাম্মাদ(সা.) স্বয়ং বানু কাইনুকাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ অথবা মদিনা ত্যাগ করার আদেশ প্রদান করেন। মুসলিম প্রজাতন্ত্রের বিশ্বাসঘাতক এ ইহুদি সম্প্রদায় পনের দিন নিজেদের দুর্গে অবরুদ্ধ থাকার পর ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দে (তৃতীয় হিজরি) তাদেরকে মদিনা হতে বিতাড়িত করা হয়। অবশ্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

বানু নাজির : ইহুদিদের প্রকাশ্যে বিরোধিতা, ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপে মদিনার মুসলমানরা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের পরাজয়ের পর মদিনা সনদের শর্ত ভঙ্গ করে বানু নাজির গোত্রের কা'ব ইবন আশরাফ বীর গাঁথা রচনা করে বিধর্মীদের উৎসাহ দান করে। আবু রাফি সাল্লাম নামক একজন নাজির গোত্রীয় ইহুদি সুলাইম ও গাতফান প্রভৃতি আরব বেদুইন গোত্রগুলোকে ইসলামের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে থাকে। হঠকারিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত ইসলামের এ দুই পরম শত্রুকে হত্যা করার আদেশ প্রদান করা হয়। নব-প্রতিষ্ঠিত ইসলামী প্রজাতন্ত্রের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। উপরন্তু উহুদের যুদ্ধে বানু নাজিরের সরদার আবদুল্লাহ বিন উবাই বিশ্বাসঘাতকতা করে সনদের শর্তভঙ্গ করলে মহানবি(সা.) বানু নাজিরের মহল্লায় উপস্থিত হয়ে তাদের অংশের মুক্তিপণ দিতে অনুরোধ জানান। তথায় আমর বিন জাহাশ মহানবি(সা.) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। সৌভাগ্যক্রমে মহানবি(সা.) এ দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরে তাদেরকে মদিনা ত্যাগের নির্দেশ দেন। কিন্তু নির্দেশ অমান্য করে তারা আবদুল্লাহর নেতৃত্বে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে মহানবি(সা.) তাদেরকে অবরোধ করতে বাধ্য হন। অবশেষে তাদেরকে মদিনা হতে বহিষ্কার করা হয়। মদিনা হতে বিতাড়িত হয়ে তারা সিরিয়া ও খাইবারে গিয়ে বসবাস করতে থাকে। হিজরি চতুর্থ বছরে (৬২৬ খ্রিষ্টাব্দে) বানু নাজির গোত্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বানু কুরাইযা: ইহুদিদের অপর প্রভাবশালী গোত্র ছিল মদিনার বিশ্বাসঘাতক বানু কুরাইযা। খন্দকের যুদ্ধে এ ইহুদি গোত্র পৌত্তলিক, কুরাইশ ও বেদুইনদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ত্রি-শক্তির সংঘ গঠন করে এবং ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার সকল প্রকার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু ত্রি-শক্তির সংঘের শোচনীয় পরাজয়ের পর হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এ বিশ্বাসঘাতক বানু কুরাইযাকে সমুচিত শাস্তি প্রদানের জন্য মদিনা ত্যাগ করতে আদেশ দেন কিন্তু আদেশ অমান্য করলে তাদের দুর্গ অবরোধ করা হয়। আত্মসমর্পণ করলে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) ইহুদিদের ইচ্ছানুযায়ী আউস গোত্রের দলপতি সাদ বিন মুয়াজ (রা.) এর উপর বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে বিচার ভার ন্যস্ত করেন। তাঁর বিচারে ইসলামের বিরোধিতাকারী ইহুদিদের প্রায় ২৫০ ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয় এবং নারী ও শিশুদেরকে দাসদাসীতে পরিণত করা হয়।

মূল্যায়ন: ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ ও নিরপেক্ষ সমালোচনায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইহুদিদের বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা তাদের জিঘাংসামূলক ব্যবহার, ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার তুলনায় অতি নগণ্য। ইহুদিদের জঘন্য রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা- (১) মদিনা সনদের পরিপন্থী ইহুদি গোত্র মক্কার কুরাইশদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে মুসলমানদের গুপ্ত খবর কুরাইশদের পরিবেশন করত। গুপ্তচর বৃত্তি বিশ্বাসঘাতকতার অন্যতম দৃষ্টান্ত : (২) কা'ব ইবন আশরাফ বদরের যুদ্ধে কুরাইশদের বিপর্যয়ে মক্কায় গমন করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিধর্মীদের প্ররোচিত করতে থাকে, (৩) মুসলিম তরুণীর শালীনতা হানির চেষ্টা, (৪) আবু রাফি সাল্লাম কর্তৃক আরব বেদুইন গোত্র সুলাইম ও গাতফানকে ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তোলা, (৫) আমর বিন জাহাশ গৃহ চূড়ায় আরোহণ করে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) কে হত্যার চেষ্টা করে, (৬) বিরে মাউনায় আরব বেদুইন গোত্র কর্তৃক মুসলিম ধর্মপ্রচারকের মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল বানু সুলাইম এবং তাতে ইহুদিদের ষড়যন্ত্র ছিল বলে মনে করা হয়, (৭) বিরে মাউনা হতে আত্মরক্ষা করে একজন মুসলমান ভুলক্রমে বানু আমির গোত্রের দুইজনকে হত্যা করেন। হযরত মুহাম্মাদ(সা.) ইহুদি ও মুসলমানদের উভয়কে সনদের শর্তানুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে আদেশ করেন। কিন্তু বানু নজির গোত্র সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদানে অস্বীকার করে। হযরত মুহাম্মাদ(সা.) স্বয়ং ক্ষতিপূরণ আদায় করতে গেলে তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়, (৮) খাইবার হতে বহিস্কৃত হয়ে মদিনার উপকণ্ঠে ইহুদিগণ মুসলমানদের বাড়িঘর লুণ্ঠন করত এবং আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করত, (৯) ইহুদিদের প্রত্যক্ষ ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত খায়বারের যুদ্ধ, (১০) খায়বারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তারা হযরত মুহাম্মাদ(সা.) কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার হীন চক্রান্ত করে।

কুরআন শরীফে বর্ণিত আছে, 'নিশ্চয় মুখে (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) তারা জঘন্য ঘৃণা বা হিংসা প্রকাশ করেছে এবং অন্তরে তাদের (মুসলমানদের বিরুদ্ধে ঘৃণা) আরও অধিক।' হিংসাত্মক ও বিদ্রোহজনক কার্যকলাপের তুলনায় ইহুদিদের প্রতি হযরত মুহাম্মাদ(সা.) খুবই মানবোচিত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ডব্লিউ মুইর বলেন, যে কারণে মুহাম্মাদ(সা.) ইহুদিগণকে শাস্তি প্রদান করেন তা রাজনৈতিক, ধর্মীয় নহে। অতএব ইহুদিদের প্রতি মহানবি (সা.) কঠোর ও অন্যায় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বলে স্প্রেঙ্গার, উইল প্রমুখ ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ যে মন্তব্য করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়।

খ্রিষ্টানদের সঙ্গে সম্পর্ক

ইসলামের প্রথম যুগে খ্রিষ্টানদের সঙ্গে মুসলমানদের সদ্ভাব ছিল। হযরত মুহাম্মাদ(সা.) খ্রিষ্টান আবিসিনীয় সম্রাট নাজ্জাসির সহৃদয়তার কথা বিস্মৃত হননি। কারণ তিনি তার রাজ্যে হিজরতকারী মুসলমানদের আশ্রয় দান করেন। মদিনায় হিজরত করার পর স্থানীয় খ্রিষ্টানগণ হযরতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করত এবং মুসলমানদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলত। খ্রিষ্টানদের সহৃদয়তা ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবে প্রীত হয়ে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) ষষ্ঠ হিজরিতে সিনাই পাহাড়ের সন্নিকটে সেন্ট ক্যাথরিন মঠের সন্ন্যাসিদের এবং অন্যান্য খ্রিষ্টানদের একটি সনদ প্রদান করেন।

এ সনদে খ্রিষ্টানদের সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। সনদের শর্তভঙ্গকারী মুসলমানদের কঠোর শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। খ্রিষ্টানদের জীবন ও ধন সম্পত্তি রক্ষার ভার হযরত মুহাম্মাদ(সা.) স্বয়ং গ্রহণ করেন। এ সনদের মাধ্যমে তিনি নিজে এবং মুসলিম জাতি খ্রিষ্টানদের বাসস্থান, মঠ, গির্জা এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষা ও প্রয়োজনীয় সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি দেন। অতিরিক্ত কর আদায়, স্বধর্ম ত্যাগে বাধ্যকরণ, ধর্মযাজকের পদ হতে বহিষ্কার, গির্জা ধ্বংস করে মসজিদ অথবা মুসলমানদের গৃহ নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়। নির্বিঘ্নে তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করার পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হয়। ধর্মান্তরিত না হয়েও খ্রিষ্টান মহিলাদের মুসলমানকে বিবাহ করার অধিকার প্রদান করা হয়। আরবের বাইরে বসবাসকারী খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমানদের বিরোধ সংঘটিত হলে আরবের খ্রিষ্টানদের উপর কোন অত্যাচার করা হবে না বলে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, খ্রিষ্টানদের প্রতি হযরত মুহাম্মাদ(সা.) যে উদারতা, মহানুভবতা ও সহৃদয়তার পরিচয় এ সনদে প্রদান করেন, তা অসাধারণ সহিষ্ণুতার অত্যুৎকৃষ্ট কীর্তিস্তম্ভ স্বরূপ। বস্তুতপক্ষে, হযরত মুহাম্মাদ(সা.) কর্তৃক খ্রিষ্টান সম্প্রদায়কে প্রদত্ত সনদ পরধর্মের প্রতি তার সীমাহীন সহনশীলতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

হুদায়বিয়ার সন্ধি (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)

সন্ধির পটভূমি : ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে (ষষ্ঠ হিজরীতে) মহানবি (স.) মাতৃভূমি দর্শন ও হজ্জ পালনের জন্যে ১৪০০ সাহাবা নিয়ে হজ্জের পোশাক পরিধান করে ও কুরবানী পশু নিয়ে ভারী যুদ্ধাস্ত্রের পরিবর্তে কেবল খাপেবদ্ধ তরবারিসহ মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। ছয় বৎসর পূর্বে মুহাজিরগণ ঘরবাড়ি, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের মায়া কাটিয়ে ইসলামের জন্য মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিলেন। তাদের মন দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। ইতোমধ্যে মক্কা (বায়তুল্লাহ শরীফ) কিবলা বলে নির্ধারিত হয়েছে। এসব কারণেও স্বপ্নে মক্কায় প্রবেশের ইঙ্গিত পেয়ে তিনি সাহাবিদের নিয়ে মক্কায় রওনা হন। পবিত্র জিলকদ মাসে প্রাচীন আরব প্রথানুযায়ী যুদ্ধ বিগ্রহ নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কুরাইশগণ কর্তৃক খালিদ ও ইকরামার নেতৃত্বে একদল সৈন্য হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এর গতিরোধের জন্য প্রেরিত হল। কেননা, কুরাইশদের ধারণা হল এটি আরব গোত্রসমূহের সামনে তাদের পদমর্যাদাকে অবনমিত করার একটি চাতুর্যপূর্ণ চালমাত্র। মক্কার সন্নিকটে খুজাহ গোত্রের বুদাইল বিন ওয়াকার নিকট কুরাইশদের যুদ্ধাভিযানের সংবাদ পেয়ে মহানবি(সা.) পথ পরিবর্তন করে মক্কার নয় মাইল অদূরে হুদায়বিয়া নামক স্থানে শিবির স্থাপন করেন। 'হুদায়বিয়া' নামক একটি কূপের নামানুসারে অঞ্চলটি হুদায়বিয়া নামে পরিচিত।

কুরাইশদের দূরভিসন্ধি জানতে পেরে হযরত বুদাইল (রা.)কে দূতরূপে পাঠিয়ে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) কুরাইশদের জানালেন যে, তারা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, যুদ্ধ করতে মক্কায় আসেনি। শুধু হজ্জ বা পবিত্র কা'বাগৃহ পরিদর্শন করতে এসেছেন। হযরতের সততায় বিশ্বাস করে কুরাইশগণ ওরওয়া বিন মাসুদকে সন্ধির প্রস্তাব দিয়ে মহানবি (সা.) এর নিকট পাঠান। সাহাবিদের বিশ্বস্ততা ও সদিচ্ছার প্রতি কটাক্ষ করে ওরওয়া কটূক্তি করলে সন্ধি চুক্তির প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মহানবি (সা.) প্রথমে হযরত খারাশ বিন উমাইয়া আল খোযাঈকে এবং পরে হযরত উসমান (রা.) কে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে কুরাইশদের নিকট প্রেরণ করেন। হযরত ওসমান (রা.) এর প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব হলে মুসলিম শিবিরে রব উঠল যে, মুশরিকরা হযরত উসমানকে হত্যা করেছে। ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে এবং বীর মুসলিম যোদ্ধাগণ নিরস্ত্র হলেও দীপ্তকণ্ঠে শপথ গ্রহণ করলেন যে তাঁরা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন। এ শপথকে'বাইয়াতুর রিদওয়ান'অথবা বৃক্ষের নিচে শপথ গ্রহণ করা হয় বলে'বাইয়াতুশ শাজারা'বলে অভিহিত করা হয়। মুসলমানদের দৃঢ় শপথে শঙ্কিত হয়ে কুরাইশগণ হযরত উসমান (রা.) কে মুক্তি দিয়ে সুহাইল বিন আমরকে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে পাঠান। অনেক বাকবিতণ্ডার পর মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। ইসলামে এটাই'হুদায়বিয়ার সন্ধি'নামে পরিচিত।

হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রধান শর্তাবলি

মুসলিম ও কুরাইশদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হুদায়বিয়ার সন্ধির প্রধান শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. এই বছর (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে) মুসলিমগণ হজ সম্পাদন না করে মদিনা প্রত্যাবর্তন করবে।

২. কুরাইশ ও মুসলিমদের মধ্যে আগামী দশ বছর পর্যন্ত যে কোন প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ থাকবে।

৩. যদি মুসলিমগণ ইচ্ছা করে তা হলে তিনদিনের জন্য পরের বছর (৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে) মক্কায় হজ পালনের উদ্দেশ্যে আগমন করতে পারবে। মুসলিমদের অবস্থানকালে কুরাইশগণ মক্কা নগরী ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিবে।

৪. আগমনকালে মুসলিমগণ শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য কোষবদ্ধ তরবারি ব্যতীত অন্য কোন মরণাস্ত্র আনতে পারবে না।

৫. হজের সময় মুসলিমদের জান মালের নিরাপত্তা বিধান করা হবে এবং মক্কার বণিকগণ নির্বিঘ্নে মদিনার পথ ধরে সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে পারবে।

৬. চুক্তির মেয়াদকালে জনসাধারণের পূর্ণ নিরাপত্তা রক্ষিত হবে এবং একে অপরের ক্ষতি সাধন করবে না। কোনো প্রকার লুণ্ঠন অথবা আক্রমণ চালাবে না।

৭. আরবের যে কোনো গোত্রের লোক মুহাম্মাদ (সা.) অথবা কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে।

৮. কোন মক্কাবাসী মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করলে কুরাইশরা চাইলে মদিনার মুসলিমগণ তাকে ফেরত দিবে, পক্ষান্তরে কোন মুসলিম মদিনা হতে মক্কায় আগমন করলে মক্কাবাসী তাকে প্রত্যার্পণে বাধ্য থাকবে না।

৯. মক্কার কোনো নাবালক তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুসলিমদের দলে যোগদান করতে পারবে না, করলে তাকে ফেরত দিতে হবে।

১০. সন্ধির শর্তাবলি উভয় পক্ষকে পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে।

হুদায়বিয়া সন্ধির তাৎপর্য ও গুরুত্ব

ইসলামের ইতিহাসে হুদায়বিয়া সন্ধির তাৎপর্য ও গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী

দীর্ঘমেয়াদী যুদ্ধাবস্থার অবসান ঃ হুদায়বিয়ার সন্ধির তাৎপর্য আলোচনা করলে প্রতীয়মান হবে যে, এতে বিধর্মী ও মুসলিমদের মধ্যে অন্ততপক্ষে দশ বছরের জন্য নিরবচ্ছিন্ন শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা করা হয়। যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে কুরাইশ ও হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর সদিচ্ছা প্রকাশ পায়। কুরাইশগণ যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। বিরামহীন যুদ্ধে তাদের ব্যবসায় বাণিজ্যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। অন্যদিকে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও সুসংহতকরণের জন্য শঙ্কামুক্ত ও উদ্বেগহীন কিছু সময় মুসলিমদেরও প্রয়োজন ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধি উভয়পক্ষকে স্ব স্ব কাজে সময়ের সদ্ব্যবহারের সুযোগ এনে দেয়। মহানবি (সা.) ১৪০০ জন বিশ্বাসী নিয়ে মাতৃভূমিতে গমন করেন এবং মক্কাবাসী ও মুসলিমদের সমঅধিকারের ভিত্তিতে হুদায়বিয়ার চুক্তি সম্পাদিত করেন। এ চুক্তির মাধ্যমে নিজস্ব গোত্র কুরাইশদের সঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) যুদ্ধবিরতির সূচনা করেন।

মহাবিজয় : হযরত মুহাম্মাদ(সা.) -এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রতিভার পরিচায়ক এ হুদায়বিয়ার সন্ধিকে মহগ্রন্থ কুরআনে ফাতহুম মুবিন বা প্রকাশ্য বিজয় বলে অভিহিত করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, আলোচ্য সন্ধিপত্র আপাতত মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী এবং অপমানজনক বলে প্রতীয়মান হলেও এটা ছিল ইসলামের নিরঙ্কুশ বিজয়ের সংকেতসরূপ। এই সন্ধি মহানবি (সা.) এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় বহন করে। ঐতিহাসিক যহুরীর বর্ণনা মতে, ইসলামের পূর্ববর্তী এমন কি পরবর্তী কোন বিজয়ই এর চেয়ে বৃহত্তর ছিল না। এনসাইক্লোপেডিয়ার লেখক বলেন– আপাত দৃষ্টিতে মনে হল যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) লজ্জাজনকভাবে পশ্চাৎপদ করেছিলেন, কিন্তু শিগ্‌গির প্রতিভাত হলো যে, সুবিধাগুলো মুহাম্মাদ(সা.) এর পক্ষেই ছিল। বাস্তবিক এই সন্ধি ছিল কৌশলপূর্ণ পশ্চাৎপদ কিন্তু রণচাতুর্যপূর্ণ বিজয়।

আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি : চুক্তির অন্যতম শর্ত ছিল যে, অনুমতি ব্যতীত কোনো কুরাইশ মদিনায় আশ্রয় গ্রহণ করলে হযরত মুহম্মদ (সা.) তাকে ফিরিয়ে দেবেন এবং কোনো মুসলমান মক্কায় আসলে কুরাইশগণ তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে না। বিবেচনা করে দেখলে প্রমাণিত হয় যে, মুসলমানগণ ইসলামে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন এবং হযরত মুহাম্মাদ(সা.) তাদের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন। চুক্তি মোতাবেক দেশত্যাগী মদিনার মুসলমানগণ মক্কায় প্রত্যাবর্তন না করায় কুরাইশগণ বিস্মিত হয়েছিল।

রাষ্ট্র হিসেবে মদিনার স্বীকৃতি লাভ : এই সন্ধির দ্বারা সমগ্র আরবের দৃষ্টিতে মদিনা রাষ্ট্র মক্কা রাষ্ট্রের সমপর্যায়ে উন্নীত হল। এই চুক্তির ফলে কুরাইশগণ সর্ব প্রথম মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং মুহাম্মাদ(সা.) কে এর নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হল। ইতোপূর্বে আরবের রাজনীতি মক্কাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। এখন থেকে মদিনাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে লাগল।

ধর্ম হিসেবে ইসলামের সাফল্য : হুদায়বিয়ার সন্ধির অন্যতম প্রধান তাৎপর্য ছিল, ইসলামের বিস্তৃতি ও প্রসারতা। শর্তগুলো ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরিপন্থী ছিল না। বরং পরোক্ষভাবে প্রেরণাদায়ক ছিল। আরবের যে কোনো গোত্র হযরত মুহাম্মাদ(সা.) অথবা কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হতে পারবে– এ শর্তটির ফলে হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এর পক্ষে গত আঠার বছরে যা করা সম্ভব হয়নি তা মাত্র দুবছরে সম্ভব হয়েছিল। এ শর্ত মোতাবেক বানু খুযায়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। মুসলমানদের সঙ্গে বেদুইন গোত্রের অবাধ মেলামেশার সুযোগ থাকার ফলে ইসলামের পরিসর বৃদ্ধি পায়। সন্ধির শর্তানুযায়ী নিজ নিজ ধর্মবিশ্বাস প্রচারে অবাধ সুযোগ লাভ করলে বিশেষ করে যুদ্ধে লিপ্ত পৌত্তলিক আরববাসীরা ইসলামের অন্তর্নিহিত গুণাবলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। হুদায়বিয়ার সন্ধির গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে আমরা যেরূপ জয়ী হয়েছিলাম সেরূপ কখনো হয়নি।

শ্রেষ্ঠ বীরদের ইসলাম গ্রহণ : এ সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার পর খালিদ বিন ওয়ালিদ এবং আমর ইবনুল আসের মতো শ্রেষ্ঠ বীরদ্বয় ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইবনে হিশাম বলেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) যেখানে ১৪০০ সাহাবি নিয়ে হুদায়বিয়ায় গমন করেছিলেন দু বছর পর মক্কা বিজয়ে ১০০০০ সাহাবী তাঁর আনুগত্য করেছিল। আঠার বছর কঠোর ত্যাগ ও পরিশ্রমের ফলে শিষ্যসংখ্যা দাঁড়ায় ১৪০০ তে, কিন্তু এ চুক্তির ফলে মাত্র দু বছরে (৬২৯-৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে) মুসলমানদের সংখ্যা হয়েছিল ১০,০০০। নিঃসন্দেহে এটি মহাবিজয়।

দূত প্রেরণ (৬২৮ খ্রিষ্টাব্দ)

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে মহানবি (সা.) নিম্নলিখিত দূতদের তাদের নামের পাশে উল্লিখিত রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট ধর্ম প্রচারার্থে প্রেরণ করেন।

১. হযরত দাহিয়্যা ইবনে খলিফা কালবী (রা.) : রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস।

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রা.) : ইরানের সম্রাট কিসরা (খসরু পারভেজ)

৩. হযরত আমর ইবনে উমাইয়া যামরী (রা.) : আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশী।

৪. হযরত হাতিব ইবনে আবু বালতাআ (রা.) : মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার সম্রাট মুকাওকিস।

৫. হযরত সালীত ইবনে আস সাহমী (রা.) : ওমানের বাদশাহ জায়কর।

৬. হযরত সালীত ইবনে আমর (রা.) : ইয়ামামার সরদার হাইজা ইবনে আলী।

৭. হযরত আলা ইবনে হাযরামী (রা.) : বাহরাইনের শাসক মুনজির ইবনে সাবী

৮. হযরত শুজা ইবনে ওয়াহাব আসাদী (রা.) : গাসসানের শাসক হারিছ গাসসানী।

৯. হযরত মুহাজির ইবনে উমাইয়া মাখযুমী (রা.) : ইয়ামেনের শাসক হারিছ হিমইয়ারী।

আবিসিনিয়ার নৃপতি নাজ্জাশী নবি করীম (সা.) এর পত্র পেয়ে ইসলাম কবুল করেন। রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস রাজনৈতিক কারণে ইসলাম গ্রহণে অপারগতার কথা জানান। অগ্নি উপাসক পারস্য রাজা দ্বিতীয় খসরু রাসুলুল্লাহর পত্র ছিড়ে ফেলে। ইহা শ্রবণ করে রাসুল(সা.) বলেন যে, আমার পত্রকে যেমন সে ছিড়ে ফেলেছে ঠিক তেমনি মুসলমানদের হাতে তার রাজ্যও ছিন্ন ভিন্ন হবে। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে সমগ্র ইরান সাম্রাজ্য মুসলমানদের দখলে আসে। রাজনৈতিক কারণে আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা মুকাওকিস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। গাসসানের শাসনকর্তা হারিছ এবং ইয়ামামার শাসনকর্তা হাইজা মুসলিম দূতকে জঘন্যভাবে অপমানিত করেন। রোমান সামন্তরাজ সুরাহবিল মুসলিম দূতকে হত্যা করে। এর ফলে খ্রিস্টান জগতের সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

খাইবারের যুদ্ধ (৬২৮ খ্রিস্টাব্দ)

ইসলামের বিরুদ্ধে সর্বদা ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত ইহুদি সম্প্রদায় মদিনা হতে বিতাড়িত হয়ে সিরিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী খাইবার নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। বানু নাজির ও বানু কুরাইযা গোত্রের ইহুদিগণ ইসলামকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মুনাফিক দলের নেতা আবদুল্লাহ বিন উবাই এবং গাতফান ও অন্যান্য বেদুইন গোত্রের সঙ্গে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তারা খন্দকের যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে বেদুইন গোত্রের সহযোগিতায় ৪০০০ সৈন্যের একটি সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে। এ সংবাদ শুনে ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে (৭ম হিজরির মহররম মাসে) হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ইহুদিদের সমূলে ধ্বংস করার জন্য ২০০ অশ্বারোহীসহ ১,৬০০ মুসলিম যোদ্ধা নিয়ে খাইবারের দিকে যাত্রা করেন। ইহুদিদের অবরুদ্ধ করা হয়। আল কামুস দুর্গসহ ইহুদিদের সকল দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হয়। হযরত আলী (রা.) বীরবিক্রমে এ যুদ্ধ করেন বলে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাকে আসাদুল্লাহ (আল্লাহর সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁকে বিখ্যাত জুলফিকার তরবারি প্রদান করেন।

এই যুদ্ধে ইহুদি সম্প্রদায় আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। মহানবি (সা.) তাদেরকে ক্ষমা করে নির্বিঘ্নে তথায় বসবাস করার অনুমতি দিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক ইহুদিগণ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে। হারিছের কন্যা জয়নব খাইবারের যুদ্ধে পিতার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে বিষ প্রয়োগে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে হত্যা করার চেষ্টা করে। খাদ্যে বিষ প্রয়োগের ফলে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর এক সাহাবি নিহত হলেন। কিন্তু বিষ মিশ্রিত সামান্য খাদ্য মুখে দেওয়ায় সৌভাগ্যক্রমে

মহানবি (সা.)এর জীবন রক্ষা পায়। সাহাবির মৃত্যুর জন্য জয়নবকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। কিন্তু সমগ্র ইহুদিদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হয়নি। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)এর মহানুভবতার এটি একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ঐতিহাসিক তাবারীর মতে, জয়নবকে ক্ষমা করা হয়। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, নবির জীবন রক্ষা পেল কিন্তু বিষের ক্রিয়া তার শরীরে বিস্তৃতি লাভ করায় পরবর্তী জীবনে এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইহুদিদের বিপর্যয়ের পর তাদের উপর বাধ্যতামূলক কর প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়। কর প্রদান পূর্বক ইহুদিদের পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ এবং জানমালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করা হয়।

মুলতবী ওমরাহ

হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ৬২৯ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে' ৭ম হিজরীর জিলকদ মাসে ২০০০ সাহাবি নিয়ে কাযা ওমরাহ পালনের জন্য মক্কায় যাত্রা করেন এবং তিনদিন অবস্থানের পর মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। মুইরের বর্ণনায় মক্কার উপত্যকায় সংঘটিত ইহা (ওমরাহ পালন) একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে ইহা সত্যি অসাধারণ দৃশ্য ছিল। মক্কার উচ্চ ও নীচ সকল নাগরিক স্ব স্ব বাসস্থান ত্যাগ করে তিনদিনের জন্য প্রাচীন শহরের বাইরে চলে যায়। অন্যদিকে মুহাজিরগণ বহুদিন পর জন্মভূমিতে আসেন। শৈশবের রেলাভূমি পরিদর্শন করলেন এবং নির্ধারিত স্থানে কাযা ওমরাহ পালন করলেন। মক্কাবাসীরা মুসলমানদের ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও প্রতিশ্রুতি রক্ষার অপূর্ব বৈশিষ্ট্য দর্শন করে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মুতার যুদ্ধ (৬২৯ খ্রিস্টাব্দ)

হুদায়বিয়ার সন্ধি (মার্চ ৬২৮ খ্রিস্টাব্দ) থেকে মক্কা বিজয় (জানুয়ারি ৬৩০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত সময়ে মুসলমানগণ যে ১৭টি অভিযান পরিচালনা করে তন্মধ্যে মুতা অভিযান ছিল অন্যতম। রোমান সামন্তরাজ সুরাহ্‌বিল বিন আমর মহানবি (সা.)এর প্রেরিত দূত হযরত হারিস বিন উমাইয়াকে মুতায় নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ বিশ্বাসঘাতকতামূলক হত্যার উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ৩০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী গঠন করে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশত এ বাহিনী নেতৃত্ব প্রদান করা হয় তার দত্তক পুত্র হযরত জায়িদ বিন হারিস (রা.) কে। আরব উপজাতিও বায়জান্টাইনদের সমন্বয়ে গঠিত প্রায় এক লক্ষাধিক সৈন্যের বিশাল বাহিনীর সম্মুখীন হয়ে মুসলমানগণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। একের পর এক তাদের প্রিয় সেনাপতি হযরত জায়িদ বিন হারিস, হযরত জাফর ইবনে আবু তালিব ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.) শহীদ হন। সমূহ বিপর্যয় হতে মুসলিম বাহিনীকে রক্ষা করেন বীরশ্রেষ্ঠ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.)। অসীম বীরত্ব ও দক্ষতা প্রদর্শন করে খালিদ মুতার যুদ্ধে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর তেজস্বিতা ও বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'সাইফুল্লাহ' অর্থাৎ আল্লাহর তরবারি খেতাবে ভূষিত করেন।

মক্কা বিজয় (৬৩০ খ্রিস্টাব্দ)

পটভূমি : ৬২৪ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত বদরের যুদ্ধ হতে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে মক্কার অভ্যন্তরীণ অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। বদরের যুদ্ধ কুরাইশ গোত্রকে দুটি দলে বিভক্ত করে। বদরের যুদ্ধে মখজুম গোত্রের সাফওয়ানের সঙ্গে আব্দুস শামস গোত্রের আবু সুফিয়ানের যে বৈরীভাবের উদ্ভব হয়, উহুদের যুদ্ধে তা আরও প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। মূলত আভ্যন্তরীণ গোত্রীয় দ্বন্দ্ব ও

রাজনৈতিক অনৈক্যের ফলে কুরাইশদের শক্তি হ্রাস পেতে থাকে। ৬২৮ খ্রি. মক্কাবাসীরা সাফওয়ান, সুহাইল এবং আবু জাহলের পুত্র ইকরামার নেতৃত্বে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)কে হজ পালনে বাধা দান করে। পরিশেষে তারা সন্ধি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু এই সন্ধি সম্পাদনে আবু সুফিয়ানের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ লক্ষ করা যায়নি। আবু সুফিয়ানের নিষ্ক্রিয়তার মূলে ছিল তার কন্যা উম্মে হাবিবার ইসলাম ধর্ম গ্রহণ এবং হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর ক্রমবর্ধমান শক্তি ও প্রভাব। পরবর্তীকালে উম্মে হাবিবা (রা.) মহানবি হযরত (সা.) এর সহধর্মিনী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধি শুধুমাত্র হজ পালনের নিশ্চয়তা দান করে নি, মক্কা বিজয়েরও সূচনা করে। মক্কার পৌত্তলিকগণ পিতৃধর্মকে পরিত্যাগ করতে পারিনি। কিন্তু অপেক্ষাকৃত তরুণ মক্কাবাসীগণ মহানবি(সা.) এর সত্য প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। বিশেষ করে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.), হযরত আমর ইবিনুল আস (রা.) ও হযরত উসমান বিন তালহা (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ বিধর্মীদের মনে প্রভাব বিস্তার করে।

মক্কা বিজয়ের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল হুদায়বিয়ার সন্ধি চুক্তির অবমাননা। বানু খুযায়া নবিজীর সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবন্ধ ছিল। আবার বানু বকর কুরাইশদের প্রতি অনুগত ছিল। এ বানু খুযায়ার প্রতি বকর গোত্রের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার মক্কা অভিযান এবং বিজয়কে ত্বরান্বিত করে। বকর গোত্রের একজন কবি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর অবমাননা করলে বানু খুযায়া লোকেরা তাকে হত্যা করে। এর ফলে নওফিল বিন মুয়াবিয়া গোপনে কুরাইশদের সাহায্যে বানু খুযায়াকে আক্রমণ করে। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে স্বাক্ষরকারী সাফওয়ান, সুহাইল ও ইকরামা প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্যভাবে বানু বকরকে সহায়তা করলে সন্ধির শর্ত ভঙ্গ হয়। এ পরিস্থিতিতে মহানবি (সা.) হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী বানু খুযায়াকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

অবশ্য যুদ্ধ এড়াবার জন্য মহানবি(সা.) কুরাইশদের নিকট তিনটি প্রস্তাব সম্বলিত একটি পত্রসহ শান্তিদূত প্রেরণ করেন। প্রস্তাবগুলো ছিল (১) অন্যায়ভাবে নিহত বানু খুযায়ার লোকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে অথবা (২) বানু বকর সম্প্রদায়কে সকল প্রকার সাহায্য প্রদানে বিরত থাকতে হবে। (৩) হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তাবলি বাতিল বলে ঘোষিত হবে।

মহানবি (সা.) এর দূত মক্কা হতে মদিনায় ফিরে এসে জানালেন যে, কুরাইশগণ তৃতীয় প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছেন। এর ফলে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বহু আকাঙ্ক্ষিত মক্কা অভিযানের সমস্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলেও মক্কা বিজয় ব্যতীত আরবে ইসলাম সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইত্যবসরে মক্কাবাসীদের বিভেদ ও বৈষম্যের কথা উপলব্ধি করে আবু সুফিয়ান স্বয়ং মদিনায় গমন করে শান্তি প্রস্তাব করলে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তা প্রত্যাখান করেন এবং ১০,০০০ সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী নিয়ে ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি (১০ই রমজান, অষ্টম হিজরি) মক্কা বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

মক্কা বিজয়ের ঘটনা

মহানবি (সা.) মক্কার উপকণ্ঠে শিবির সন্নিবেশ করেন। তাঁর এই বিশাল বাহিনীকে কুরাইশগণ সরাসরি বাধা প্রদান করতে সাহস পেল না। আবু সুফিয়ান দুজন অনুচরসহ মুসলিম শিবিরের পরিস্থিতি দেখতে এসে হযরত উমর (রা.) কর্তৃক বন্দি হয়ে মহানবি(সা.) এর নিকট প্রেরিত হন। মহানবি(সা.) তাকে ক্ষমা করে দিলে তিনি বিমুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর মহানবি(সা.)

তাঁর প্রিয় জন্মভূমি মক্কায় প্রবেশ করেন। আবু সুফিয়ান তাঁকে মক্কায় স্বাগত অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। সাফওয়ান, ইকরামা এবং সুহাইল একত্রিত হয়ে মাখযুম গোত্রের লোকজনসহ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে বাধা প্রদানে অগ্রসর হয়। পথিমধ্যে হযরত আব্বাস (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে মক্কায় গমন করেন এবং কুরাইশদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করে বলেন, অবরুদ্ধ মক্কা নগরীর দক্ষিণাংশে খালিদ, উত্তরাংশে জুবাইর এবং আল্লাহর রাসুল (সা.) স্বয়ং আনসার ও মুহাজিরিন এবং বানু খুযায়া দ্বারা গঠিত সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করেছেন। আবু সুফিয়ানও আত্মসমর্পণের জন্য কুরাইশদের উদ্বুদ্ধ করেন। মুসলমানগণ যখন নগরে প্রবেশ করতে থাকেন, তখন ইকরামার নেতৃত্বে কিছু সংখ্যক কুরাইশ বিক্ষিপ্তভাবে মক্কার দক্ষিণ ফটকে বাধা দান করেন। কিন্তু হযরত খালিদ (রা.) বীরবিক্রমে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর করেন। প্রায় বিনা বাধায় ও বিনা রক্তপাতে দীর্ঘ আট বছর পর মুসলমানগণ মক্কা বিজয় করেন। মহানবি (সা.) মক্কাবাসীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে বলেন, (১) যে অস্ত্র ত্যাগ করবে তার জন্য ভয় নেই (২) যে কাবায় প্রবেশ করবে সে নিরাপদ (৩) যে নিজেকে গৃহে আবদ্ধ রাখবে সেও নিরাপদ (৪) যারা আবু সুফিয়ানের গৃহে প্রবেশ করবে তারাও অভয়প্রাপ্ত। মহানবি (সা.) কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা মহানুভবতার এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত।

মক্কা বিজয়ের তাৎপর্য ও গুরুত্ব: প্রিয় মাতৃভূমি মক্কা হতে নির্বাসিত হযরত মুহাম্মাদ (সা.) দীর্ঘ আট বছর পর বিজয়ীর বেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। অধ্যাপক পি.কে.হিট্টি মক্কা বিজয়কে প্রাচীন ইতিহাসে একটি তুলনাবিহীন মহাবিজয় বলে অভিহিত করেন। সীজার, আলেকজান্ডার ও নেপোলিয়ানের দেশ জয় নিরীহ জনসাধারণের রক্তপাতের ইতিহাস। কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নির্বিঘ্নে ও বিনা প্রতিবন্ধকতায় মদিনা হতে অভিযান করে মক্কা বিজয় করেন। মক্কা বিজয় সমগ্র আরব দেশ বিজয়ের সমতুল্য ছিল।

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় গুরুত্ব: মক্কা বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে মক্কা বিজয় দ্বারা ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠার বীজ নিহিত ছিল। এছাড়া হযরত মুহাম্মাদ (সা.) উপলব্ধি করেন যে, নব প্রতিষ্ঠিত ধর্মের শক্তি বৃদ্ধি করতে হলে মক্কার সামরিক শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে এবং মক্কা আয়ত্তে আসলে বহির্বিশ্বেও তাঁর ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। উদারতা, মহানুভবতা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা হযরত (সা.) বিধর্মী কুরাইশদের মন জয় করেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মক্কায় প্রবেশ করে পবিত্র হারাম শরীফ গমন করে সাতবার কা'বা তাওয়াফ করেন এবং সেখানে অবস্থিত ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্তি অপসারণ করার আদেশ দেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সা.) একখানি লাঠি দিয়ে দেব মূর্তিগুলোর সম্মুখে গেলেন এবং সেই লাঠির অগ্রভাগের আঘাতে মূর্তিগুলো ভূপাতিত হতে লাগল। সে সময় হযরত (সা.) 'সত্য উপস্থিত হয়েছে অসত্য লোপ পেয়েছে, নিশ্চয়ই অসত্য লুপ্ত হবে' এ আয়াতটি পড়তে লাগলেন। হযরত আব্বাস (রা.) বলেন, যেদিন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মক্কা জয় করেন, সেইদিনই তিনি কাবাগৃহে রক্ষিত ৩৬০টি মূর্তি ধ্বংস করেন। আরববাসিগণ ঐ দেব-মূর্তির পূজা করত এবং তাদের নিকট বলি দিত। দেব মূর্তি ছাড়া কা'বা গৃহের দেয়ালে অঙ্কিত বিভিন্ন ছবিও মুছে ফেলা হয়। পবিত্র কাবা শরীফ হতে পৌত্তলিকতার সর্বশেষ চিহ্নগুলো দূরিভূত হলে আল্লাহর একত্ববাদের নীতি সুদৃঢ়রূপে হারাম শরীফ তথা মক্কা ও আরবদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হল।

ইসলামের ব্যাপক প্রসার : মক্কা বিজয়ের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ আরব গোত্রের বেদুইনগণ দলে দলে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হল। ধর্মীয় অপেক্ষা রাজনৈতিক প্রতিপত্তি এবং অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগের জন্যই বেদুইনগণ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করল। নিকলসন বলেন, পবিত্র নগরীর আত্মসমর্পণে আরব দেশে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)এর আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। তাঁর কার্য সমাধা হল। বিভিন্ন বেদুইন গোত্রের প্রতিনিধিগণ বিজেতার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল। ফলশ্রুতিতে মহানবি (সা.) এর রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি, ইসলামের দ্রুত প্রসার ও আন্তর্জাতিকীকরণ সহজতর হয়। জোসেফ হেল বলেন : এইরূপে মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর আকাঙ্ক্ষার চরম সীমায় উপনীত হন।

হুনাইনের যুদ্ধ (৬৩০ খ্রিস্টাব্দ)

মক্কা বিজয়ের পর মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী অঞ্চলে হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্রদ্বয় ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। পৌত্তলিকতার পরাজয়ের পর কাবা মুসলমানদের আওতাভুক্ত হলে বিধর্মী গোষ্ঠি ইসলামকে উচ্ছেদ করে মূর্তি পূজা পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করে এবং পবিত্র আল্লাহর ঘর পুনরায় দখলের চেষ্টা করে। বেদুইনদের সহযোগিতায় এ দুই গোত্র মক্কার তিন মাইল দূরবর্তী হুনাইন উপত্যকায় ২০,০০০ সৈন্য সমাবেশ করে। ৬৩০ খ্রিস্টাব্দের ২৭ শে জানুয়ারি (৮ম হিজরি ৬ই শাওয়াল) মুসলমান ও কুরাইশদের একটি সম্মিলিত বাহিনী মক্কা ত্যাগ করে। মক্কায় অবস্থানের তিন সপ্তাহের মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে এক বিশাল শত্রু বাহিনীর সম্মুখীন হতে হয়। মুসলমানের পক্ষে মোট ১২,০০০ সৈন্য হুনাইনের প্রান্তরে শত্রুর মোকাবিলা করে। যুদ্ধের প্রথমদিকে মুসলমানগণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। অবশেষে মহানবি (সা.) এর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সেনাপতি হযরত খালিদ (রা.) এর বীরত্বের কারণে মুসলিম বাহিনী জয় লাভ করে। যুদ্ধে প্রায় ছয় হাজার শত্রু সৈন্য বন্দী হয়। বিপুল সংখ্যক গবাদি পশু, প্রচুর পরিমাণ রৌপ্য ও সমরাস্ত্র মুসলমানদের হস্তগত হয়।

তায়েফ বিজয় (৬৩০ খ্রিস্টাব্দ)

হুনাইনের যুদ্ধে পরাজিত শত্রু সৈন্যগণ তায়িফের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে পুনরায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযানের পরিকল্পনায় মেতে উঠে। সংবাদ পেয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আবু মুসার অধিনায়কত্বে একটি বিশাল মুসলিম বাহিনী তায়েফে প্রেরণ করেন। তিন সপ্তাহ অবরুদ্ধ থাকার পর তায়িফবাসী মহানবির নিকট আত্মসমর্পণ করে। মহানবি (সা.) তাদের ক্ষমা করেন এবং সকলের সাথে সদয় ব্যবহার করেন। যে তায়িফবাসী একদিন মহানবি (সা.) কে প্রস্তর দ্বারা আঘাত করেছিল, মুসলিম বাহিনীর আক্রমণে তারা ভীত ও জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ল এবং মদিনার শাসনাধীনে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)এর আনুগত্য স্বীকার করল। তায়েফবাসী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল।

তাবুক অভিযান (৬৩০ খ্রিস্টাব্দ)

আরবের ইহুদিগণ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর হাতে কয়েকবার পরাজয় বরণ করে সিরিয়া সংলগ্ন খাইবার অঞ্চলে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত ছিল। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের দরবারে দূত পাঠান। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর হুনাইন ও তায়িফে ইসলামের বিজয়ে হেরাক্লিয়াস ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে। তদুপরি মুতার যুদ্ধে খ্রিস্টানদের পরাজয় এবং ইহুদিদের প্ররোচনা তাকে উত্তেজিত করে তোলে। ঘাসসানীদের সহযোগিতায় ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে লক্ষাধিক সৈন্যসহ বায়জানটাইন বাহিনী মদিনার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এ সংবাদ পেয়ে সিরিয়া গমনের বাণিজ্যের পথটিকে নিরাপদ রাখার জন্য সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত তাবুক নামক স্থানে শত্রুপক্ষের গতিরোধ করেন।

মুসলিম বাহিনীতে পদাতিক সৈন্য ছিল ৩০,০০০ এবং অশ্বারোহী ১০,০০০। এ যুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সমস্ত সম্পত্তি, হযরত ওমর (রা.) তাঁর অর্ধেক সম্পত্তি এবং হযরত উসমান (রা.) ১,০০০ স্বর্ণমুদ্রা, ১,০০০ উট এবং ৭০টি অশ্ব যুদ্ধ তহবিলে দান করেন। বিশেষ কোনো যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন হয়নি কারণ মুসলমানদের যুদ্ধে জয়লাভ অবশ্যম্ভাবী মনে করে বায়জান্টাইন বাহিনী সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে পলায়ন করে।

মহানবি (সা.) ২০ দিন তাবুকে অবস্থান করে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর আমলে ছোট বড় সর্বমোট ২৭টি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তন্মধ্যে তাবুক ও অন্যান্য ৮টি যুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। তাবুকই ছিল মহানবি (সা.) এর জীবনের শেষ অভিযান। মুসলমান সৈন্যবাহিনী তাবুক গমনকালে পথিমধ্যে গ্রীষ্মের সূর্যের প্রচণ্ড কিরণ ও প্রখর তাপে এবং পানির অভাবে ভয়ানক কষ্ট পায়।

প্রতিনিধি প্রেরণের বছর

নবম হিজরি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনে এবং বিশেষ করে ইসলামের ব্যাপক প্রসারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইবনে হিশাম বলেন যে, এ বছর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) অসংখ্য প্রতিনিধিকে (ইসলাম ধর্ম গ্রহণের উদ্দেশ্যে) সাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন বলে উক্ত বছরকে প্রতিনিধি প্রেরণের বছর বা আমুল উফুদ বলা হয়। ওমান, হাজরামাউত, নাজরান, মাহরা, বাহরাইন প্রভৃতি যে সমস্ত অঞ্চলে কোন প্রকর অভিযান প্রেরণ করা হয়নি, সে সমস্ত অঞ্চল হতে প্রতিনিধি মদিনায় প্রেরিত হল। মক্কা বিজয়ের অব্যবহিত পরে হযরতের আমন্ত্রণক্রমে এ সমস্ত প্রতিনিধিরা ইসলামের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস স্থাপন করল। ইয়ামেনের অনেক গোত্রও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। মাহরা এবং ইয়ামেনের খ্রিষ্টানগণ ইসলামে দীক্ষিত হয়। খ্রিষ্টান গোত্র বানু হানিফা, বানু তাগলিব, বানু হারিস, বানু কিনদা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে বাৎসরিক কর প্রদানের অঙ্গীকার করে।

তাবুক হতে বায়জান্টাইন বাহিনীর পলায়নের পর আইলাহের খ্রিষ্টান শাসনকর্তা এবং মাকনী আজরুহ ও জারবা মরুদ্যানের ইহুদি সম্প্রদায় মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে। এ অঞ্চলের খ্রিষ্টান ও ইহুদি সম্প্রদায় মুসলমানদের নিকট হতে নিরাপত্তা লাভ করে বাৎসরিক নির্দিষ্ট হারে কর জিযিয়া প্রদানের প্রতিশ্রুতি দান করে। কুরাইশদের মিত্র বানু আসাদ ছাড়া বানু কা'বাও হযরতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে। এরূপে গোত্রের পর গোত্র হযরতের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করে পৌত্তলিকতার পরিবর্তে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। প্রত্যেক গোত্রকে একখানি লিখিত সন্ধিপত্র প্রদান করা হয় এবং ইসলামের আদর্শ শিক্ষা দানের জন্য একজন মুয়াল্লিম নিযুক্ত করা হয়।

আমুল উফুদ বা প্রতিনিধি প্রেরণের বছর ইসলামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য যে, তা কেবল ইসলামের প্রচারেই সহায়তা করেনি, সমগ্র আরব জাতিকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তিতে সুসংঘবদ্ধ করে শক্তিশালী বায়জান্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ দান করে। ইবন ইসহাকের মতে, বিভিন্ন গোত্র হতে প্রেরিত প্রতিনিধিদের প্রতি মহানবি (সা.) এর সৌজন্যমূলক ব্যবহার, তাদের অভিযোগের প্রতি সজাগ দৃষ্টি, বিরোধ নিষ্পত্তি করার মতো বিচক্ষণতা সমগ্র উপদ্বীপে তাকে জনপ্রিয় করে তোলে এবং মহান, সদাশয় ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে।
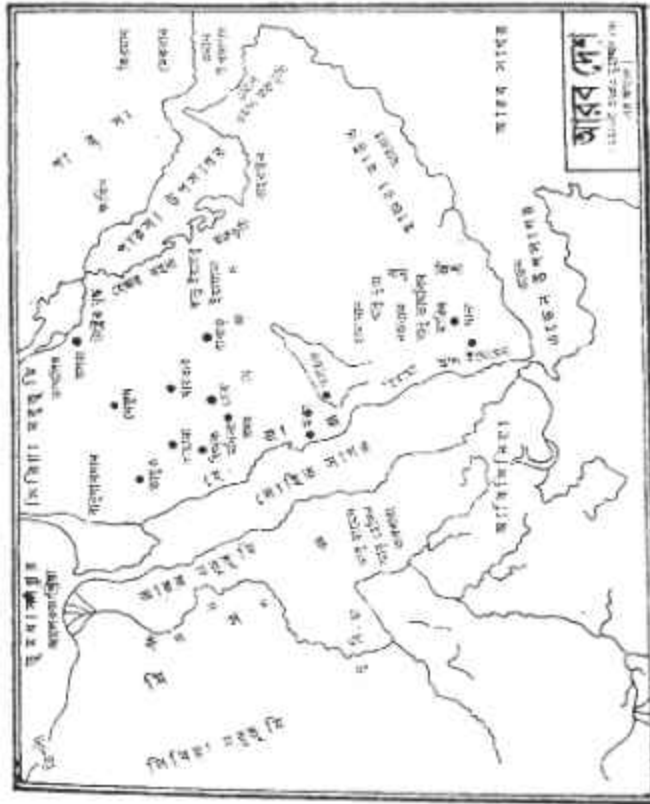
চিত্র ঃ আরব দেশ (মহানবী (সা.) -এর সময়)

বিদায় হজ (৬৩২ খ্রিস্টাব্দ)

দশম হিজরিতে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) উপলব্ধি করলেন যে,তাঁর জাগতিক কর্তব্য শেষ হয়েছে এবং জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হওয়ার সময়ও আসন্ন। তাই হজ্জব্রত পালনের উদ্দেশ্যে ২৫ শে জিলকদ, ১০ হিজরী অর্থাৎ ২৩ শে ফেব্রুয়ারি, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে তিনি অগনিত সাহাবি সহকারে মক্কার পথে রওয়ানা হলেন। ইতোপূর্বে মহানবি (সা.) দুবার ওমরাহ পালন করেছেন। কিন্তু তখনও পর্যন্ত হজ্জব্রত পালনের সুযোগ হয়নি। হজ্জব্রত পালন এবং মুসলমানদের এতদসংক্রান্ত বিধি বিধান সম্পর্কে সরাসরি অবহিত করাও ছিল মহানবি (সা.) এর এবার হজে যাওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য। এটি ছিল মহানবি (সা.) এর জীবনের শেষ হজ্জব্রত পালন। এজন্য এ হজকে 'হুজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ বলা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, ৬৩১ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে সূরা তওবাহ নাজিল হওয়ার পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আরবের সমস্ত গোত্রকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য ৪ মাস সময় প্রদান করেন এবং বলেন যে, এ সময় অতিবাহিত হবার পর আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.) কোনো প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন না। এর ফলে পরের বছর ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে হযরত (সা.) হজ উপলক্ষে ১,১৪,০০০ জন সাহাবাসহ মক্কায় গমন করতে সক্ষম হন। এ যাত্রায় তাঁর সকল সহধর্মিনী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। কুরবানী দেওয়ার জন্য তিনি ১০০টি উট সঙ্গে নেন।

যাত্রার দশদিন পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছয় মাইল অদূরে যুল হুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছেন এবং সেখান থেকে সাহাবিদের নিয়ে হজের পোশাক পরিধান করে(ইহরাম বেঁধে) একাদশ দিনে মক্কায় প্রবেশ করেন। কা'বা গৃহের চর্তুদিকে সাতবার প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মাকামে ইব্রাহিম নামক স্থানে নামাজ আদায় করেন। অতঃপর সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে সাতবার দৌড়ালেন। জিলহজ মাসের অষ্টম দিনে তিনি মিনায় এবং নবম দিনে আরাফাত ময়দানে পৌঁছান। হজ সম্পন্ন করে তিনি আরাফাতের পর্বত শিখরে দাঁড়িয়ে উপস্থিত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এক অবিস্মরণীয় ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর এ উপদেশবাণী মুসলমানদের হৃদয়ে চিরকাল সমুজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

বিদায় হজের ভাষণ

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করে সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সমবেত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে বলেন :

হে মুসলমানগণ, মনোযোগ সহকারে আমার বাণী শ্রবণ কর। কারণ, তোমাদের সাথে পুনরায় মিলিত হবার সুযোগ আল্লাহ আমাকে নাও দিতে পারেন। এ দিন এ মাস সকলের জন্য যেরূপ পবিত্র, সেরূপ তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি মহান সৃষ্টিকর্তার সাথে সাক্ষাতের পূর্ব পর্যন্ত পরস্পরের নিকট পবিত্র এবং হস্তক্ষেপের অনুপযুক্ত।

"স্মরণ রেখ, প্রতিটি কাজের জন্য তোমাদেরকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহি করতে হবে।"

"হে সাহাবিগণ, সহধর্মিনীদের উপর তোমাদের যেরূপ অধিকার আছে, তোমাদের উপরও তাদের অধিকার অনুরূপ। আল্লাহকে সাক্ষী রেখে তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ এবং তাঁর আদেশমত তাদেরকে তোমাদের জন্য বৈধ করে নিয়েছ। তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে।

"সর্বদা, অন্যের আমানত হেফাজত করবে এবং পাপ কার্য এড়িয়ে চলবে।

"সুদ গ্রহণ নিষিদ্ধ করা হলো। খাতকের নিকট হতে কেবল আসলই ফেরত নিবে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরব জাতির রক্তের বদলে রক্ত নীতি এখন হতে নিষিদ্ধ হলো।"

"দাসদাসীদের সঙ্গে হৃদয়পূর্ণ ও আন্তরিক ব্যবহার করবে। তোমরা যা আহার কর, যা পরিধান কর, তাদেরকেও অনুরূপ খাদ্য ও বস্ত্র দান কর। তারা যদি ক্ষমার অযোগ্য কোনো ব্যবহার করে তা হলেও তাদের মুক্তি দান করবে। স্মরণ রেখ, তারাও আল্লাহর মাখলুক এবং তোমাদের মতো মানুষ।"

"তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কারও অংশীদার করো না, অন্যায়ভাবে নরহত্যা করো না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ো না।"

"হে মানবমন্ডলি, মনোযোগ সহকারে আমার বাণী অনুধাবন করতে চেষ্টা কর। স্মরণ রেখ, সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই এবং তোমরা একই ভ্রাতৃত্বে ও বন্ধনে আবদ্ধ। পৃথিবীর সকল মুসলিম একই অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃ সমাজ। অনুমতি ব্যতীত কেউ কারও কোনো কিছু জোর করে কেড়ে নিতে পারবে না।"

"স্মরণ রেখ, বাসভূমি ও বর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলমান সমান। আজ হতে বংশগত কৌলিন্য প্রথা বিলুপ্ত করা হল। সেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে কুলিন, যে স্বীয়কার্যের বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে আগ্রহী। পরস্পরের প্রাধান্যের একমাত্র মাপকাঠি হলো খোদাভীতি বা সৎকর্ম।"

'পথপ্রদর্শক হিসেবে তোমাদের জন্য আল্লাহর কালাম (কুরআন শরীফ) ও তাঁর প্রেরিত সত্যের বাহক রাসুল করিমের চরিত্রাদর্শ (হাদিস) রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা কুরআন ও হাদিসের অনুশাসন মেনে চলবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না।'

'হে আমার উম্মতগণ, যারা এখানে সমবেত হয়েছে, তারা অনুপস্থিত মুসলমানদের নিকট আমার উপদেশ পৌঁছে দিবে, আমার উপদেশের কথা বলবে। উপস্থিত ব্যক্তিগণের চেয়ে তারাই অধিক স্মরণ রাখতে সক্ষম হবে।'

নবি করিম (সা.) ভাষণ প্রদানের এ পর্যায়ে উর্ধ্বে হাত তুলে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বললেন, "হে প্রভু, আমি কি তোমার বাণী সঠিকভাবে জনগণের নিকট পৌঁছাতে পেরেছি?" উপস্থিত উম্মতগণ গগনভেদী আওয়াজ করে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পেরেছেন।'

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ধর্ম হিসেবে ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম।' (সূরা মায়িদাঃ ৩)

পরিশেষে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আবেগভরা কণ্ঠে আবার সমবেত ভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমরা সাক্ষী, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি বিদায়, আল-বিদা।'

হযরত আবু বকর (রা.) এই আয়াত শুনে কেঁদে ফেলেন। কারণ তিনি তাঁর ইমানী প্রজ্ঞা দ্বারা বুঝে ফেলেছিলেন, রিসালাতের মিশন যখন সম্পন্ন হয়ে গেছে, আল্লাহ তাআলা অদূর ভবিষ্যতে মহানবি (সা.) কে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিবেন।

মহানবি (সা.) আরাফাত থেকে মুযদালিফায় রওয়ানা দেন। সেখানে রাত্রি যাপন করেন। ফজরের নামাযের পর তিনি মুযদালিফা থেকে মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথে জামারায় কংকর নিক্ষেপ করেন। মিনায় পৌঁছে নিজের তাঁবুতে অবস্থান করেন। মহানবি (সা.) মদিনা থেকে কুরবানীর জন্য ১০০ উট নিয়ে এসেছিলেন। ৬৩টি উট নিজের তরফ থেকে কুরবানী করেন। এই হিসেবে ছিল তাঁর বয়সের প্রতি বছরের জন্য একটি করে। অবশিষ্ট ৩৭টি হযরত আলী (রা.) কুরবানী করেন। অতঃপর মহানবি (সা.) পবিত্র মাথা মুন্ডন করেন। তাতে করে ইহরাম (হজের পোষাক) খুলে তিনি হজের সকল আনুষ্ঠানিকতা থেকে মুক্ত হন।

এই হজকে কেউ কেউ 'হুজ্জাতুল বিদা' বা বিদায় হজ বলেন। কেউ কেউ হুজ্জাতুল ইসলাম, আবার কেউ কেউ হুজ্জাতুল বালাগ নামে অভিহিত করেন। মূলত তিনটি নামই এই হজের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে। এটা ছিল মহানবি (সা.) এর শেষ হজ। এই হিসেবে একে বিদায় হজ বলা যায়। কারণ এরপর আর কখনও মহানবি (সা.) হজ করার সুযোগ পাননি।

বিদায় হজের তাৎপর্য

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর বিদায় হজের অভিভাষণ মুসলিম উম্মাহর জন্য সর্বকালের পথ প্রদর্শক। এই অমূল্য ভাষণে তিনি একটি আদর্শ মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থার চিত্র জনগণের নিকট তুলে ধরেন। তাদেরকে তিনি তমসাযুগের অসাম্য, প্রতিহিংসা, নিষ্ঠুরতা, শ্রেণি বৈষম্য, সুদ প্রথার মাধ্যমে শোষণ-নির্যাতন, নারী ও দাসদাসীর প্রতি অন্যায়-অবিচার, কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন রীতিনীতি প্রভৃতি অসামাজিক কার্যকলাপ অবসানের আহ্বান জানান। মহানবি(সা.) এর বিদায় হজের ভাষণ ইসলামি রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও মানবিক অধিকারের মূলনীতি বিষয়ক একটি দলিল। এই ভাষণে মানবজীবনের আধ্যাত্মিক ও বাস্তব উভয় শিক্ষার সুস্পষ্ট প্রতিফলন রয়েছে। বস্তুত এই শিক্ষাতেই মানবজাতির মুক্তি ও শান্তি নিহিত। হযরত (সা.) এর এই বক্তব্যের আদর্শ বাস্তবায়িত হলে বর্তমানে সংঘাতময় বিশ্বে মানবজীবন নিঃসন্দেহে শান্তিময় হয়ে উঠবে।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর ওফাত (৮ জুন, ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ)

সাহাবিদের সঙ্গে হজ সমাপনান্তে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এখানে অতিবাহিত করেন এবং শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে নব-প্রতিষ্ঠিত ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। বিদায় হজের দু'মাস পর মহানবি (সা.) হযরত ওসামা বিন জায়েদের নেতৃত্বে সিরিয়ার একটি শাস্তিমূলক অভিযান প্রেরণের নির্দেশ দেন। কেননা, ইতোপূর্বে সেখানে একজন মুসলিম দূতকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু মহানবি (সা.) আকস্মিক অসুস্থতার সুযোগে আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে তোলায়হা, মুসায়লামা প্রমুখ ভণ্ড নবির আবির্ভাব ঘটায় এই অভিযান আপাত স্থগিত ঘোষণা করা হয়। ক্রমে ক্রমে হযরত (সা.) এর শিরঃপীড়া বাড়তে থাকে, স্বাস্থ্যহানি ঘটে। একদা মধ্যরাত্রে তিনি, 'জান্নাতুল বাকি' নামক সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে তাঁর মৃত সাহাবিদের জন্য পারলৌকিক শান্তি কামনা করেন। পিতৃব্য আব্বাসের পুত্র হযরত ফজল এবং আবু তালেবের পুত্র হযরত আলী (রা.) এর কাঁধে ভর দিয়ে তিনি শেষবারের মতো মসজিদে উপস্থিত হলেন।শেষ নামাজ আদায় করে তিনি সমবেত মুসল্লিগণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে মুসলমানগণঃ যদি আমি তোমাদের কারও প্রতি অন্যায় আচরণ করে থাকি, তাহলে এখন তার জবাবদিহি করতে রাজি আছি। যদি আমি তোমাদের কারও নিকট ঋণ করে থাকি, তাহলে সে যেন আজ আমার সম্পত্তি থেকে তা নিয়ে নেয়।' তিনি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। অবশেষে ৬৩ বৎসর বয়সে ১১ হিজরির ১২ রবিউল আউয়াল (৬৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৮ জুন) সোমবার হযরত আয়েশা (রা.)-এর গৃহে তিনি ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিয়ুন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

হযরত মুহাম্মাদ(সা.) এর কৃতিত্ব ও সংস্কারসমূহ

ইসলামি জীবন বিধান কোনো মানুষের চিন্তার ফল নয় তা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ব্যবস্থা। এ জীবন ব্যবস্থার বিধি-বিধান মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ওহির মারফত প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যে সকল কার্যকরী সংস্কার ও ব্যবস্থার মাধ্যমে মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পতনোন্মুখ আরব জাতির মধ্যে জাগরণ আনয়ন করেন,একটি ঘৃণিত ও অজ্ঞাত আরব জাতিকে সম্মানের উচ্চাসনে সমাসীন করেন, লুণ্ঠনকারী আরব জাতিকে অপরের সম্পদ হিফাজত ও রক্ষণাবেক্ষণে দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলেন, মদ্যপানে আসক্ত আরব জাতিকে মদ্যপানে নিরাসক্ত করে তোলেন, জ্ঞানান্ধ ও মূর্খ আরব জনতাকে জ্ঞান-পিপাসু করে গড়ে তোলেন, আরবের মুশরিকদেরকে তৌহিদবাদীতে রূপান্তরিত করেন, দাস প্রথার বিলোপ সাধনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং সভ্যতা বিবর্জিত আরব জাতিকে একটি উন্নয়নশীল সুসভ্য জাতিরূপে গড়ে তোলেন-সে সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

রাজনৈতিক সংস্কার : প্রাক-ইসলামি আরবে কোনো সুষ্ঠু রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল না। এজন্য বিচ্ছিন্ন গোত্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত আরববাসীদের মধ্যে কোন রাজনৈতিক বন্ধন গড়ে ওঠেনি। দেশে কোনো বিধিবদ্ধ নিয়ম-কানুন ও শৃঙ্খলা না থাকায় অসংখ্য গোত্র ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত আরবদের মধ্যে কলহ-বিবাদ ছিল চিরাচরিত ঘটনা।

তাদের দস্যুবৃত্তি রাজনৈতিক অঙ্গনে অশান্তি ও অনর্থের সৃষ্টি করে। মহানবি (সা.) শতধা-বিভক্ত ও বিবদমান আরব জাতির গোত্র ভিত্তিক রাজনীতির অবসান ঘটান। তার প্রদত্ত মদিনা সনদ গোত্র প্রথার বিলোপ সাধন করে ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে একটি নতুন জাতি (উম্মাহ) প্রতিষ্ঠা করে। গোত্র ব্যবস্থার অবসানে তিনি আরবদেরকে একই রাজনৈতিক ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ করে মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে মহানবি (সা.) বিভিন্ন অমুসলিম গোত্রগুলিকেও একই রাজনৈতিক গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ করেছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর এ প্রচেষ্টা পরবর্তীকালের বৃহত্তর ইসলামি সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল।

একমাত্র ধর্ম ও ঈমানের দ্বারাই তিনি মদিনার রাজনৈতিক অঙ্গনে শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্টি করেন। ফলে নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব পৌত্তলিকতার স্থান দখল করে নেয়। মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এই রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো তৈরিতে মনোনিবেশ করেন। শাসন ব্যবস্থায় তিনি ঐশীতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সমন্বয় সাধন করায় ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হতে থাকে। বসওয়ার্থ যথার্থই বলেছেন, 'যদি কেহ ঐশ্বরিক বিধান সম্মত শাসনবিধি প্রতিষ্ঠার গৌরব দাবি করতে পারেন,তবে তিনি মুহাম্মাদ(সা.) ছাড়া আর কেউ নন।' মদিনায় হিজরতের পর মহানবি (সা.) সেখানে সর্বপ্রথম একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ক্রমে এই মসজিদই ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বস্তুত এই মসজিদ ছিল মহানবি (সা.) এর প্রার্থনাগার, শিক্ষায়তন, সভাগৃহ, সরকারি কার্যালয় এবং গোত্রীয় প্রতিনিধি ও বৈদেশিক দূতদের সাথে মিলনের কেন্দ্র। এখানেই বসে তিনি পবিত্র কুরআনের নির্দেশ, সাহাবীদের পরামর্শ ও স্বীয় বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। রাষ্ট্রাধিনায়ক হিসাবে মুহাম্মাদ (সা.) এর কার্যকলাপ আগামী দিনের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে কাজ করে।

শাসনকার্যের সুবিধার্থে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সমগ্র আরব উপদ্বীপকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করেন। যেমন- মদিনা, খাইবার, মক্কা, তায়িফ, ইয়ামেন, সানা, হাযরামাউত, ওমান ও বাহরাইন। প্রদেশের শাসনকর্তার উপাধি ছিল 'ওয়ালী'। তিনি শুধু রাষ্ট্রনায়কই ছিলেন না, একাধারে তিনি ছিলেন ইমাম, প্রধান সেনাপতি ও বিচারক। শাসন পদ্ধতির কেন্দ্রীয়করণের ফলে দেশে শান্তি ও সমৃদ্ধির শুভ সূচনা হয়।

সামাজিক সংস্কার : হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন একজন যুগান্তকারী সমাজ সংস্কারক। তাঁর প্রবর্তিত সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব আরব সমাজে যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠা বৈষম্যের প্রাচীর ভেঙ্গে ধুলিস্যাৎ করে দেয়, তিনি একটি আধুনিক ও উন্নত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এক অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেন। আভিজাত্যের অহংকার ও বংশমর্যাদার দম্ভ বিলোপ করে তিনি মানুষে মানুষে সকল অসাম্য ও ভেদাভেদের মুলোচ্ছেদ করেন। তিনি মানবতার ভিত্তিতে সমাজ এবং ইসলামি বুনিয়াদের উপর একটি জাতি গঠন করতে সচেস্ট হন। তিনি ঘোষণা করেন, 'সকল মানুষ সমান। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম সেই ব্যক্তি যিনি আল্লাহর প্রতি সর্বাধিক অনুগত এবং মানুষের সর্বাধিক কল্যাণকামী।' এরূপ সাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই তিনি আরব সমাজ থেকে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র ও সাদা-কালো পার্থক্য দূরীভূত করেন।

নারীজাতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও সমাজ জীবনে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর সমাজ সংস্কারের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত কোন ধর্মই নারীকে সমাজে তার প্রাপ্য মর্যাদা দান করেনি। এতকাল তারা ভোগের সামগ্রীরূপে গণ্য হত। মহানবি (সা.) সমাজে নারী জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে নিরলসভাবে কাজ করে যান। তিনি বলেন, 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে তার স্ত্রীর প্রতি সর্বোত্তম ব্যবহার করে।' 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত' এই বাণীর মাধ্যমে নারী জাতির প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধের গভীরতা প্রকাশ পায়। তাঁরই প্রচেষ্টায় পুরুষের পবিত্র আমানত ও কল্যাণময়ীরূপে নারী সমাজে

স্থান করেছে। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পারিবারিক ও বৈবাহিক আইন সংশোধন করে নারী জাতিকে ভোগের সামগ্রীর পরিবর্তে অর্ধাঙ্গিনী ও জীবনসঙ্গিনীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি তাদেরকে পিতা ও মৃত স্বামীর সম্পদে অধিকার এবং বিয়েতে সম্মতি প্রকাশের স্বাধীনতা প্রদান করেন। আরব সমাজে কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর জীবন্ত প্রোথিত করার যে বর্বর রীতি প্রচলিত ছিল, তিনি তা চিরতরে রহিত করেন। মোট কথা, নারীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শন ও তার মর্যাদা বৃদ্ধি মহানবি (সা.) এর প্রচারিত জীবন-দর্শনের এক অপরিহার্য অংশ ছিল।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আরবে তথা প্রায় সমগ্র বিশ্বে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ক্রীতদাস প্রথার মূলে কুঠারাঘাত করেন। সত্য যে, সে সময়ের বিরাজমান পরিস্থিতির জন্য তিনি অবশ্য দাস প্রথার মূলোচ্ছেদ করতে পারেননি, তবে তিনিই তাদেরকে সর্বপ্রথম মানুষের মর্যাদায় উন্নীত করেন। দাসদাসীর জীবন মরণ নির্ভর করত প্রভুদের মর্জি ও খেয়াল-খুশির উপর। ফলে মনিবগণ ক্রীত দাসদাসীদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করত। তারা হাটে-বাজারে এবং যত্রতত্র পণ্যদ্রব্যের ন্যায় ক্রয়-বিক্রয় হত। মানুষ হিসেবে সমাজে তাদের কোনো অধিকার ছিল না। প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে তাদের বিয়ে করা পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। মানুষের প্রতি মানুষের এরূপ নির্দয় আচরণে মহানবি (সা.) অত্যন্ত মর্মাহত হন। তাই তাদের মুক্তির পথ নির্দেশ করে তিনি ঘোষণা করেন, দাসদাসীদের মুক্তিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর কাজ আল্লাহর নিকট আর কিছুই নেই। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি স্পষ্টভাবে দাসদাসীদের প্রতি সদাচারণ ও উদার ব্যবহারের উপদেশ দেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি অনেক দাসদাসী ক্রয় করে মুক্ত করেন এবং অনেকে এই কাজে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। বহু দাসকে উচ্চ পদমর্যাদা দান করে তিনি আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাদের প্রতি তাঁর সদাচরণ এবং তাদেরকে উচ্চ পদে নিয়োগ ও সামাজিক মর্যাদা দানের ফলে ক্রমান্বয়ে দাস প্রথার বিলুপ্তির পথ সুগম হয়।

ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবদের নৈতিক জীবন বলতে কিছুই ছিল না। মহানবি (সা.) তাদের নৈতিক অবস্থার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে হত্যা, মদ্যপান, জুয়াখেলা, সুদ খাওয়া, পর ধন হরণ, রাহাজানি, ব্যভিচার, পুরুষের সংখ্যাতীত স্ত্রী গ্রহণ এবং স্ত্রীলোকের বহুবিবাহ প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এরূপে তিনি আরব সমাজ থেকে সর্বাধিক পাপাচার, অনাচার কুসংস্কার দুরীভূত করে এক যুগান্তকারী ও সুদূরপ্রসারী বিপ্লব সাধন করেন।

ধর্মীয় সংস্কার : ফন ক্রেমার বলেন, 'নিকৃষ্ট ভক্তিযোগ্য বস্তুপূজা হতে কঠিন এবং অনমনীয় একেশ্বরবাদ ছিল ইসলামের ধর্মীয় সংস্কার'। পৌত্তলিকতা, ধর্মীয় কুসংস্কার, বস্তুপূজা প্রভৃতি যখন আরবের ধর্মীয় জীবনকে কলুষিত করেছিল, ঠিক সে সময় হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বাণী নিয়ে আবির্ভূত হলেন। তৌহিদবাদের অমোঘ বাণী ঘোষিত হল– 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই; হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তার প্রেরিত রাসুল।' তৌহিদবাদের মূলমন্ত্রে রাসুলুল্লাহ (সা.) সমগ্র ইসলাম জগৎকে একটি ভ্রাতৃসংঘে আবদ্ধ করেন। তিনি তাদেরকে যে ধর্মগ্রন্থ দেন তা সকল দেশের, সকল যুগের এবং সকল মানুষের জন্য একটি সুস্পষ্ট দিক দর্শন। অধ্যাপক পি. কে. হিট্টির ভাষায়, 'মুহম্মদ এমন একটি গ্রন্থের বিশ্বাসযোগ্য উপলক্ষ হয়েছেন, গোটা মানবজাতির এক-ষষ্ঠাংশ যে গ্রন্থটিকে সমস্ত বিজ্ঞান, জ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বের মূর্ত প্রকাশ বলে আজও গণ্য করে'। যথার্থ অর্থে ইসলামের বিজয় ধর্ম তথা তাওহিদেরই বিজয়।

স্যাভারী সত্যই বলেছেন,'বিশ্বের সকল ধর্ম প্রচারকগণের মধ্যে মুহাম্মাদ (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের অধিকারী। জারোস্ট্রার ধর্মের দ্বিত্ববাদ, হিন্দুধর্মের ত্রিত্ববাদ (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) এবং খ্রিস্টান ধর্মের ত্রিত্ববাদ-এর উপর সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হল, আল্লাহ সম্বন্ধীয় ধারণার যথার্থ মর্যাদা দান এবং এর বিশুদ্ধীকরণ।' ইপিকিউরাস বলেন, দেবতা-ভীতি হতে মুক্ত হতে না পারলে মানবজাতি কখনও স্বাধীন হতে পারে না। আরবের তথা বিশ্বের মানুষকে মুহাম্মাদ (সা.) এই দেবতা-ভীতি হতে মুক্তি দান করেন।

ধর্মীয় অনুশাসন : হযরত মুহাম্মাদ (সা.) মদিনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুশাসন প্রবর্তন করেন। প্রকাশ্যে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে মুসল্লিদের আহ্বানের জন্য হযরত উমর (রা.) এর পরামর্শক্রমে কোন উচ্চস্থান হতে আযান দেয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। হযরত বিলাল (রা.) ইসলামের প্রথম মুয়াজ্জিন নিযুক্ত হন। নামাজের পূর্বে আযান ও ওযু এবং জামায়াতে নামাজ পড়ার প্রথা হিজরির প্রথম বছর অর্থাৎ ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে নির্ধারিত ও প্রচলিত হয়।

মদিনার মসজিদে মুসলমানগণ সর্বপ্রথম জেরুজালেমের দিকে ফিরে নামায পড়তেন। কিন্তু হিজরির দ্বিতীয় বছর আল্লাহর ঐশীবানী লাভ করে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) জেরুজালেমের পরিবর্তে কা'বাকে ইসলামের কিবলা হিসেবে নির্ধারণ করলেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, 'হে মুহাম্মদ! আমি আপনাকে উর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করতে দেখেছি, সুতরাং অবশ্যই আমি আপনাকে ফিরিয়ে দেব সেই কিবলার দিকে যাতে আপনার সন্তুষ্টি রয়েছে। এখন আপন মুখ ফিরিয়ে নিন মসজিদে হারামের দিকে' (২:১৪৪)। আরনল্ড বলেন, 'আপাত দৃষ্টিতে মনে না হলেও নামাজের মধ্যে কিবলা পরিবর্তনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এটাই ছিল ইসলামের জাতীয় জীবনের প্রথম পদক্ষেপ ও ইহা মক্কার কা'বাকে সমগ্র মুসলিম জাতির ধর্মীয় কেন্দ্রে পরিণত করে। কিবলা নির্ধারণ ছাড়াও রোজা, ইদুল ফিতর, ইদুল আযহা, যাকাত ও হজ পালনের প্রত্যাদেশ মহানবি (সা.) লাভ করেন।

অর্থনৈতিক সংস্কার : হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্বে আরবে কোন সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না। নগরবাসী ও স্থায়ীভাবে বসবাসকারী আরবগণ ব্যবসায়-বাণিজ্য ও কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। তাদের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু মরুচারী বেদুইনগণ যাযাবর বৃত্তি ও লুণ্ঠন দ্বারা জীবিকার সংস্থান করত। তারা দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত ছিল। ঘৃণ্য কুসীদ প্রথা ও অন্যান্য শোষণমূলক ব্যবস্থা চালু থাকায় দেশের সম্পদ মুষ্টিমেয় কতিপয় পুঁজিপতিদের হাতে কুক্ষিগত হয়েছিল। মহানবি (সা.) তাঁর অন্যান্য সংস্কারের ন্যায় সমতার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সংস্কার চালু করেন। তিনি কুসীদ প্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। দরিদ্র অভাবগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করার ও ধন সম্পদের সমবণ্টনের জন্য তিনি মুসলিম সমাজে যাকাত, সাদকাহ ও ফিতরা প্রবর্তন করে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মূলে আঘাত হানেন। রাষ্ট্রীয় আয়ের উৎস হিসেবে তিনি আল গণিমাহ, যাকাত, জিজিয়া, খারাজ ও আল-ফাই-এর পরিমাণ নির্ধারণ করে দেন। বায়তুলমাল স্থাপন করে তিনি রাষ্ট্রের অর্থসম্পদে জনসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং দীন-দুঃখীদের সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। মহানবি (সা.) কায়িক পরিশ্রম, কৃষি ও বাণিজ্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে সদুপায়ে অর্থোপার্জনে উৎসাহ দিতেন। জুয়া খেলার মাধ্যমে অর্থ রোজগারকে তিনি নিষিদ্ধ করেন। এককথায়, তিনি আরবের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনকে নৈতিকতার গণ্ডিতে আবদ্ধ করেন। তিনি বলেছেন, সমাজে কারও স্থান অর্থসম্পদের মাপকাঠিতে নির্ধারিত হবে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি বিশ্বস্ততার ভিত্তিতেই তার স্থান নির্ধারিত হবে। এভাবে দারিদ্র্য পীড়িত আরবদের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা সুষ্ঠু গতিপথ খুঁজে পায়।

রাজস্ব ব্যবস্থা : হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবিতকালে নিম্নলিখিত উৎস হতে রাজস্ব আদায় করা হত :

(ক) আল-গণিমাত (যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদি), (খ) যাকাত, (গ) জিযিয়া, (ঘ) খারাজ (ভূমি রাজস্ব) এবং (ঙ) আলফাই (রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি)

১. গনিমাহ বা যুদ্ধ-লব্ধ দ্রব্যাদি : অস্ত্র-শস্ত্র এবং অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তিই যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদির অন্তর্ভুক্ত। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু কর্তৃক পরিত্যক্ত এই সমস্ত অস্ত্র-শস্ত্র ও রসদপত্র অধিকার করে নেওয়া হত। যুদ্ধবন্দী কাফেরগণকে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত করা হত। উক্ত বন্দীদেরকে মুসলমান সৈন্যের দাস হিসেবে বিতরণ করা হত। যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যের চার-পঞ্চমাংশ যোদ্ধাগণের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হত এবং অবশিষ্ট এক-পঞ্চমাংশ মহানবি (সা.) এর জন্য নির্ধারিত ছিল।এই অংশকে 'খুমুস' বলা হয়।

২. যাকাত : কুরআন শরীফে নামাজের পরেই যাকাত প্রদানের নির্দেশ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক সংগতিসম্পন্ন মুসলমানের একান্ত কর্তব্য দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করার উদ্দেশ্যে যাকাত প্রদান করা।

নিম্নলিখিত দ্রব্যাদির উপর যাকাত ধার্য করা হত। যথা–

(ক) খাদ্য-শস্য, ফল-ফলাদি ও খেজুর,

(খ) উট, ভেড়া, মেষ, ছাগল, গো-মহিষ ইত্যাদি,

(গ) স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং

(ঘ) বাণিজ্যিক দ্রব্যাদি ও নগদ অর্থ।

পূর্ণ এক বছরকালের জন্য সংসারের আবশ্যকীয় খরচাদি বাদ দিয়ে বাকি সম্পত্তির (নিসাব) উপর যাকাত ধার্য করা হয়। বিভিন্ন সম্পত্তির নিসাব বিভিন্ন রকম।

৩. জিযিয়া বা নিরাপত্তামূলক সামরিক কর : এই কর অমুসলমান প্রজাদের উপর ধার্য হতো। এর পরিবর্তে তাদেরকে যুদ্ধে যোগদান হতে রেহাই দেওয়া হতো এবং মুসলিম রাষ্ট্র তাদের জান-মালের নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করত। অমুসলমানকে রক্ষা করতে না পারলে মুসলমানগণ তাদের প্রদত্ত জিযিয়া কর ফিরিয়ে দিত। মহানবি (সা.) এর জীবিতকালে প্রত্যেক সামর্থবান অমুসলমান প্রজাকে বাৎসরিক এক দিনার হিসেবে জিযিয়া কর দিতে হত। জিজিয়া নতুন কর নয় তৎপূর্বে এই কর পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যে যথাক্রমে 'গেজিট' এবং 'ট্রাইবিউটম ক্যাপিটিস' নামে প্রচলিত ছিল। আয়কৃত অর্থ সম্পূর্ণরূপে মুসলমান সৈন্যদের ব্যয়ভার নির্বাহের ক্ষেত্রে ব্যয় করা হত।

৪. খারাজ : অমুসলমান প্রজাগণকে নিজ নিজ ভূখণ্ডের উপর 'খারাজ' নামক এক প্রকার ভূমি-রাজস্ব প্রদান করতে হতো। উক্ত কর পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের যথাক্রমে 'খারাগ' ও'ট্রাইবিউটম সলি' নামে পরিচিত ছিল। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) খারাজ ধার্য করেছিলেন উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক হিসেবে।

৫. আলফাই : মহানবি (সা.) এর শাসনাধীনে 'আল-ফাই' নামক কিছু রাষ্ট্রীয় ভূমি ছিল। রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হতে আদায়কৃত অর্থ সম্পূর্ণভাবে মুসলমান জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করা হত।

সাংস্কৃতিক সংস্কার : আরববাসীরা কাব্যামোদী এবং কাব্য রচনা ও বর্ণনায় পারদর্শী হলেও তাদের রচনার বিষয়বস্তু অশ্লীল, শ্লেষপূর্ণ ও ব্যঙ্গাত্মক ছিল। আধুনিক যুগে শিক্ষা বলতে যা বুঝায়, তা আরবদের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড তা উপলব্ধি করে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) জ্ঞানার্জনকে প্রত্যেকের জন্য বাধ্যতামূলক করেন।

মহানবি (সা.) এর উপর সর্বপ্রথম কুরআনের যে বাণী অবতীর্ণ হয় তা হচ্ছে, পড়ুন আপনার প্রতিপালকের নামে। কুরআনের এ পবিত্র বাণীর উপর ভিত্তি করে তিনি জ্ঞানার্জনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেন–

১. শিক্ষিত লোকেরা নবিদের উত্তরাধিকারী। যারা শিক্ষার পথে বের হয়, তারা গৃহে না ফেরা পর্যন্ত আল্লাহর পথে থাকেন।

২. পণ্ডিতদের কলমের কালি শহীদের রক্ত অপেক্ষা অধিক পবিত্র।

৩. এক মুহূর্তের জ্ঞান-চিন্তা সারা রজনীর উপাসনা অপেক্ষা শ্রেয়।

প্রশাসনিক সংস্কার ঃ মদিনায় ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে রাসুলে করিম (সা.) এমন একটি প্রশাসনিক কাঠামো সৃষ্টি করেন যার উপর ভিত্তি করে ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে থাকে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি যে ভূমিকা পালন করেন তা পরবর্তীকালের জন্য উদাহরণস্বরূপ। কুরআনের নির্দেশ, স্বীয় বিচারবুদ্ধি এবং ধার্মিক ও শিক্ষিত মুসলিম সমাজের পরামর্শ অনুযায়ী তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বিশ্বের সর্বপ্রথম মসজিদ মদিনায় স্থাপন করে সেখানে রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় কার্য সমাধা করতেন। এ মসজিদই ছিল তাঁর বিদ্যালয়, প্রার্থনাগার, সরকারি দফতর, সভাগৃহ এবং বৈদেশিক দূত ও গোত্রীয় প্রতিনিধিদের সাথে মিলনের স্থান।

শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সমগ্র আরব দেশকে কয়েকটি প্রদেশে ভাগ করা হয়; যেমন– খাইবার, তায়িফ, মক্কা, ইয়ামেন, তায়ামা, সানা, ওমান, হাজরামাউত ও বাহরাইন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে 'ওয়ালি' বলা হত। তিনি কেবল ইমামই ছিলেন না, প্রধান সেনাপতি, বিচারক এবং প্রশাসকের দায়িত্বও পালন করতেন। শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রীয়করণের ফলে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়।

জাতি গঠনকারী হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর কৃতিত্ব

ইসলামের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে এডওয়ার্ড গীবন বলেন, 'ইসলাম এমন একটি স্মরণীয় বিপ্লব যা পৃথিবীর সমস্ত জাতির উপর একটি নতুন এবং চিরস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে।' ইসলামের মহান ভ্রাতৃসংঘ এবং প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে তিনি মদিনায় যে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন তা তাঁর দূরদর্শিতার পরিচায়ক। মদিনার সনদে রাষ্ট্রনায়ক এবং সংগঠক হিসেবে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার ছাপ রয়েছে। বিবদমান আরব জাতিকে সুসংঘবদ্ধ করে তিনি একটি নতুন জাতিতে পরিণত করেন। কৌলীন্যের পরিবর্তে ধর্মীয় বিশ্বাসে তিনি একটি সমাজ গঠন করেন। তাঁর নিকট গোত্র-প্রীতির স্থলে ইসলামি ভ্রাতৃত্ববোধ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মহানবি (সা.) ছিলেন বিশ্বশান্তির পথিকৃৎ। সহিষ্ণুতা, মহানুভবতা ও শান্তির বাণী তাঁর জীবনের কার্যাবলিকে সার্থক করে তুলেছে। তিনিই একমাত্র মহামানব যিনি তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর কার্যের সফলতা অবলোকন করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হুদায়বিয়ার সন্ধিকে 'ফাতহুম মুবিন' অথবা 'প্রকাশ্য বিজয়' বলা হয়েছে। এ চুক্তিটি মুসলমানদের একটি রাজনৈতিক মর্যাদা প্রদান করে। এর ফলেই রাসুল (সা.) ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে বিভিন্ন দরবারে দূত প্রেরণ করে ইসলামের প্রতি বিধর্মীদের আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেন। এভাবে মদিনার ধর্মভিত্তিক সমাজ হতে উত্তরকালে বিশাল ইসলামি সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। অধ্যাপক পি.কে হিট্টি বলেন, 'সংক্ষিপ্ত নশ্বর জীবনে মুহাম্মদ সম্ভাবনাহীন উপাদান থেকে এমন এক জাতির উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, যারা আগে কখনও ঐক্যবদ্ধ ছিল না। আর তাদের মাধ্যমে এমন একটি দেশের সৃষ্টি করেছিলেন, যা আগে কেবল একটি ভৌগোলিক সীমানাকেই বোঝাত, কিন্তু এর জাতীয় চরিত্র বলতে কিছু ছিল না। বিরাট একটি অঞ্চল জুড়ে খ্রিস্ট ধর্ম ও ইহুদি ধর্মের অবসান ঘটিয়ে তিনি একটি নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং মানবজাতির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও সে ধর্ম অনুসরণ করে।'

মহানবি (সা.) ছিলেন 'রহমাতুল্লিল 'আলামিন' অর্থাৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের রহমত বা আশীর্বাদস্বরূপ। তাঁর প্রতিটি কথা ও কার্যকলাপ ভবিষ্যৎ মুসলিম জীবনের পাথেয়। এ কারণে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, 'একটি মহান কার্য চমৎকার এবং বিশ্বস্ততার সাথে সুসম্পন্ন করার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হচ্ছে তাঁর (পূত-পবিত্র) জীবন।'

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবনী ও আদর্শ সার্বিকভাবে বিবেচনা করলে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি যে, তেইশটি বছরের কর্ম মুখরিত জীবন তিনি নিয়োজিত করেন মানবজাতির পরিপূর্ণ জীবন ধারা এবং ধর্মনীতির সুসংহত শৃঙ্খলা বিধানে। তিনি একদল শিক্ষিত কর্মী রেখে যান। যারা 'সাহাবা' নামে পরিচিত। তাঁরা তাঁর জ্বলন্ত কর্মপ্রেরণা ও জীবন্ত উচ্চাদর্শের জন্য যে কোন সময় জানমাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিলেন। ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে আদর্শ ত্রাতা, ধর্মপ্রবর্তক, রাষ্ট্র নায়ক, সংস্কারক, আইন প্রণেতা, বিচারক, জাতি গঠনকারী এবং সর্বোপরি আল্লাহর প্রেরিত রাসুল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) পার্থিব জীবন শেষ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে যাত্রা করেন। নিঃসন্দেহে বিশ্বের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কারক হিসেবে মহানবি (সা.) এর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) চারিত্রিক গুণাবলি

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি: আল্লাহর প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। এখানে তাঁকে নবুয়তের সীলমোহরও বলা হয়। তিনি কেবল সর্বশেষ নবি নহেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবিও ছিলেন। প্রখ্যাত ইউরোপীয় চিন্তাবিদ কার্লাইল, ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গীবন, এইচ. জি. ওয়েলস মহানবি (সা.) এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। মানব চরিত্রের সকল প্রকার মহৎ গুণের অনন্য সমন্বয় ছিল মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর পবিত্র জীবনে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাঁর সম্বন্ধে বলেন, 'হে মুহাম্মদ! নিশ্চয়ই আপনি অনুপম চরিত্রের অধিকারী। তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্রে সকল প্রকার গুণ ও মহত্ত্বের ছাপ পরিস্ফুটিত হয়েছে। তার স্বভাবজাত সদাচার, কোমলতা, মহানুভবতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায়পরায়ণতা ও সহিষ্ণুতা ছিল সত্যিই বিস্ময়কর। তিনি ছিলেন একাধারে শিশুদের খেলার সাথী, স্নেহবৎসল পিতা, প্রেমময় স্বামী, বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী, রিক্তের বন্ধু, সত্যের দিশারী, ন্যায়পরায়ণ বিচারক, দক্ষ সমরকুশলী ও চিন্তাশীল দার্শনিক। বস্তুত তাঁর জীবনাদর্শ গোটা মানবকুলের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ।

আল্লাহর উপর অবিচল বিশ্বাস: আল্লাহর প্রতি অবিচলিত ইমানের মূর্ত প্রতীক ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)। সুদৃঢ় ইমানই ছিল তাঁর মহৎ চারিত্রিক গুণাবলির উৎস। তাঁর প্রতিটি কাজে আল্লাহর নির্দেশের প্রতিফলন ছিল। কুরাইশদের হাতে তিনি অশেষ যাতনা ভোগ করেছিলেন, লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে তাঁকে সর্বক্ষণ সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু কখনও তিনি আল্লাহর নির্দেশিত সত্য পথ হতে বিচ্যুত হন নি; বরং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছিলেন, 'তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনেও দেয়, তথাপি মহাসত্যের সেবা ও স্বীয় কর্তব্য হতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হব না।'

আত্মপ্রত্যয়, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা: চরম বিপদের সম্মুখীন হয়েও মহানবি (সা.) কোন দিন ধৈর্যহারা হননি বা আত্মবিশ্বাস হারাননি। তাওহিদের বাণীকে বিশ্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে তিনি বিরোধী শক্তি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অমানুসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছেন, লাঞ্ছিত হয়েছেন, এমনকি প্রাণনাশের ভীতিপ্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি তার দৃঢ়বিশ্বাস ও উৎসাহ-উদ্দীপনা হতে এতটুকুও-বিচ্যুত হননি। তিনি সর্বদাই বিপদগ্রস্ত মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্র সংশোধনের সাফল্য সম্পর্কে আশাবাদী ছিলেন। তিনি অন্য ধর্মের প্রতিও সহিষ্ণু ছিলেন, জোরপূর্বক কাউকেও স্বধর্মে দীক্ষিত করেননি।

সততা ও সত্যবাদিতা: নবুয়ত প্রাপ্তির বহু পূর্ব হতেই মহানবি (সা.) তাঁর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার জন্য আরব সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। সেই জাহেলিয়া যুগেও তিনি ছিলেন অন্যান্য আরববাসী হতে একটি ব্যতিক্রম চরিত্র। তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে আরবগণ তাঁকে 'আল-আমিন' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। কাবাঘরে কৃষ্ণপাথরকে কেন্দ্র করে বিবদমান বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যে ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল যুবক মুহাম্মাদ (সা.) শান্তিপূর্ণভাবে এবং সকলকে সন্তুষ্ট করে এর সমাধান করেছিলেন। এ ধরনের গোত্রীয় কলহ ও সামাজিক অরাজকতা দমনের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কার নিঃস্বার্থ যুবকদের নিয়ে

'হিলফ-উল-ফুজুল' নামে শান্তি সংঘ গঠন করেছিলেন। মদিনায় হিজরতের পরও তিনি ইহুদি ও পৌত্তলিকদের বহু বিবাদ-বিসংবাদের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা করেন। তিনি জীবনে কোনোদিন প্রতারণা, প্রবঞ্চনা ও মিথ্যার আশ্রয় নেন নি। হুদায়বিয়ার সন্ধির অঙ্গীকার রক্ষা করতে গিয়ে তিনি মক্কা হতে মদিনায় আগত মুসলমানদেরকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন।

বদান্যতা ও নম্রতা : হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আর্তের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর বদান্যতার অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বিপদে ধৈর্য, দয়া-দাক্ষিণ্য, অনুকম্পা তাঁর চরিত্রের ভূষণ ছিল। তিনি বলতেন, "আমি শাস্তি প্রদানের জন্য আবির্ভূত হই নি, শান্তির দূত হিসেবে এসেছি।' তিনি ছিলেন নম্র ও মিষ্টভাষী। তিনি কাউকে আঘাত দিয়ে কখনও কথা বলেন নি। দাসদাসীদের প্রতিও তিনি সদয় ব্যবহার করতেন।

ক্ষমার প্রতীক : হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন ক্ষমার মূর্ত প্রতীক। তাঁর সংস্পর্শে আগত শত্রুমিত্র সকলেই তাঁর নম্র বিনয়ী ও অমায়িক ব্যবহারে বিমুগ্ধ হয়েছে। তিনি কোনোদিন রূঢ় আচরণ দ্বারা কাউকে মনঃকষ্ট দেন নি। যুদ্ধবন্দীদের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ও উদার ব্যবহার দ্বারা তিনি শত্রুর মন জয়ের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন তা তুলনাহীন। স্বীয় ঘাতককে তিনি ক্ষমা প্রদর্শনে দ্বিধা করেন নি। মক্কা ও তায়েফ বিজয়ের সময় তিনি যে ক্ষমার আদর্শ প্রদর্শন করেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। উইলিয়াম মুইরের মতে, 'যে মক্কাবাসীরা এতদিন ধরে মুহাম্মাদ (সা.) কে ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করেছিল তাদের প্রতি তাঁর এ উদার ব্যবহার সত্যই প্রশংসনীয়।' বিদায় হজ উপলক্ষে তিনি আরাফাত ময়দানে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা সর্বকালে সর্বদেশের জন্য একটি 'মানবিক সনদ' হয়ে থাকবে। কৌলীন্য, দাসপ্রথা, নরহত্যা প্রভৃতি ও অসামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করে তিনি সাম্য ও মৈত্রীর এক নবযুগের সূচনা করেন।

সরল ও অনাড়ম্বর জীবন : মহানবি (সা.) সরল, সাধারণ এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। স্বহস্তে তিনি গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম এমনকি দুগ্ধদোহন, ঘরবাড়ি পরিষ্কার, জুতা মেরামতও করতেন। তার বেশভূষায় আড়ম্বরতা প্রকাশ পায় নি। বস্তুতপক্ষে সাদাসিধে জীবনযাত্রার আদর্শ দ্বারা তিনি ধর্ম ও কর্ম এবং ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনধারার আদর্শ সমন্বয় সাধন করেন।

নির্যাতিত মানবতার ত্রাণকর্তা : আরবের অধিবাসীরা যখন জুলুম ও অবিচারে নির্যাতিত– নিষ্পেষিত, তখন হযরত মুহাম্মাদ (সা.) দুনিয়ায় এসেছিলেন মজলুম মানুষের ত্রাণকর্তা হিসেবে। মাত্র বাইশ বছর সময়ের মধ্যে তিনি সভ্যতা বিবর্জিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পৌত্তলিক আরব জাতিকে এক সুসভ্য জাতিতে পরিণত করে তাদেরকে নৈতিক ও আত্মিক পতনের অন্ধকূপ হতে তাওহিদ, নীতিবোধ ও ন্যায়পরায়ণতার উচ্চতম স্তরে উন্নীত করেছিলেন। সকল গোত্রীয়-কলহ দূরীভূত করে গোটা আরব জাতিকে তিনি ঈমানভিত্তিক ঐক্যের বন্ধনে বেঁধেছিলেন। তাঁর দৃষ্টিতে ও তার প্রণীত আইনের কাছে আপন-পর, মুসলিম-অমুসলিম সকলেই ছিল সমান। মহানবি (সা.) ছিলেন দরিদ্র, অসহায়, দুর্বল ও মজলুমের বন্ধু। তিনি মানুষের হাসি-কান্নার শরীক ছিলেন। শোকার্ত ও দুঃখপীড়িত মানুষকে তিনি আন্তরিক সমবেদনা প্রদর্শন করতেন এবং তাদের দুঃখ ভোগের সঙ্গী হতেন। অভাবের সময় তিনি ক্ষুধার্তকে নিজ খাদ্যের ভাগ প্রদান করতেন এবং প্রতিবেশী প্রত্যেকটি মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আন্তরিকভাবে কামনা করতেন। তিনি দাসদাসী ও অধীন লোকদের প্রতি সর্বাধিক মানবোচিত আচরণ করতেন।

পরিশেষে বলা যায়, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, পাপাসক্ত ব্যভিচারে লিপ্ত আরবদের সত্যপথে পরিচালিত করে পৃথিবীর ইতিহাসে একটি সুসংবদ্ধ, দিগ্বিজয়ী জাতিতে পরিণত করাই হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর কৃতিত্ব। মূলত তাঁর জীবনাদর্শ সর্বদেশে, সর্বযুগে ও সর্বমানুষের নিকট গ্রহণযোগ্য। তাঁর সীমাহীন প্রতিভা শুধু আরবদের স্থানীয় কার্যাবলিতেই প্রতিফলিত হয়নি, বহির্বিশ্বে ও আন্তর্জাতিক সমস্যাদির ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। স্বীয় চরিত্রের মাধুর্য ও তুলনাহীন কীর্তি-কলাপের জন্য তিনি ছিলেন বিশ্বের অনন্ত

কল্যাণ, মানবজাতির পরম আদর্শ ও স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)এর চরিত্রের ভূয়সী প্রশংসা করতে গিয়ে যোসেফ হেল বলেন, ' মুহাম্মাদ (সা.) এমনই একজন মহাপুরুষ ছিলেন, যাঁকে না হলে বিশ্ব অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তিনি নিজেই নিজের তুলনা। তাঁর কৃতিত্বময় ইতিহাস মানব জাতির ইতিহাসে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে।'

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন (নমুনা)

১। সাদি ও মাহদি এলাকায় প্রভাবশালী ব্যক্তি। ইসলামের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সাদি বলল, মহানবি (সা.) একটি যুদ্ধে মাত্র ৩১৩ জনের সৈন্য বাহিনী নিয়ে বিজয় অর্জন করেছিলেন। এ বিজয়ই ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। মাহদি বলল, এ বিজয়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন হাজার সৈন্যের বাহিনী পুনরায় মুসলমানদের আরেকটি যুদ্ধ করতে বাধ্য করে। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর জন্য কয়েকটি শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

ক. মদিনা সনদের ধারা কয়টি?
খ. বদর যুদ্ধের নামকরণ এমন হলো কেন?
গ. সাদি কোন যুদ্ধের কথা বলতে চেয়েছিল? এ যুদ্ধের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
ঘ. মাহাদির বিবৃত যুদ্ধের ফলাফল ইসলামের ইতিহাসের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

২। রাশেদ ও যায়েদ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রাশেদ রহিমাবাদ গ্রামের অধিবাসী। ছোট বেলা থেকেই তিনি সমাজ সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। এলাকাবাসী তাকে বিশ্বাস করে তার কাছে আমানত রাখতো। তাকে বিবাদ মীমাংসার জন্য ডাকতো। তার সুনামে ঈর্ষান্বিত হয়ে এলাকার প্রভাবশালী লোকেরা তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল। অবস্থা বুঝতে পেরে তিনি এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যান। পাঁচ বছর পর অবস্থার পরিবর্তন হলে তিনি এলাকায় এসে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী সকলকে ক্ষমা করে দেন। রাশেদের বন্ধু যায়েদ রূপনগরের মেয়র নির্বাচিত হয়ে এলাকার হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মধ্যে সহ অবস্থান নিশ্চিত করেন। দীর্ঘদিনের বিরোধ-মিটানোর জন্য একটি গ্রহণযোগ্য নীতিমালা প্রণয়ন করেন। যা এলাকার সকলের মধ্যে স্বস্তি ফিরিয়ে আনে।

ক. মুহাজির অর্থ কী?
খ. আনসার বলতে কী বোঝায়?
গ. রাসুল (সা.) -এর জীবনের কোন ঘটনার সাথে রাশেদের কার্যক্রমের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. যায়েদের কার্যক্রমের ফলাফল মদিনা সনদের আলোকে মূল্যায়ন কর।

৩। পাংশা উপজেলার নোমান বাহিনী ও হাসান বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে নোমান বাহিনী বিজয়ী হয়। এ সংঘর্ষের বদলা নিতে হাসান বাহিনী প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে উভয় বাহিনীর মধ্যে আবার সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষে নোমান বাহিনী জয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু নোমান বাহিনীর সদস্যদের শৃঙ্খলার অভাব, নেতার আদেশ অমান্য, নোমান সাহেবের মৃত্যুর গুজব, হাসান বাহিনীর সেনাপতির যুদ্ধকৌশল প্রভৃতি কারণে নোমান বাহিনী পরাজয় বরণ করে।

ক) বদরের যুদ্ধ কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল?

খ) গনিমাত বলতে কী বুঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ) উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যপুস্তকের যে যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সে যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

ঘ) উক্ত যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ কর।

৪. বদরের যুদ্ধে পরাজিত হলেও কাফিররা দমে যায়নি। তাদের লক্ষ্য ছিল ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংস করা। কিন্তু মহানবি (সা.)-এর নেতৃত্বে তাদের সকল ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। মদিনাকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের শক্তি ও সামর্থ দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়। তখনিই মহানবি (সা.) এর সাথীগণ মাতৃভূমিতে গিয়ে হজ পালন করার ইচ্ছা পোষন করেন। মক্কায় যাওয়ার পথে যাতে কোনো অসুবিধায় পড়তে না হয় সে জন্য মহানবি (সা.) কুরাইশদের সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন এবং মিলেমিশে সবাই তাদের কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে। মহানবির এই উদারতায় দলে দলে অনেকে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। কায়েম হয় ইসলামি হুকুমাত।

ক. মুতার যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল?

খ. উহুদের যুদ্ধের কারণটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত চুক্তিটিতে ইসলামের কোন সন্ধির বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত সন্ধিই বিধর্মী ও মুসলমানদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে- বিশ্লেষন কর।

৫. ইসলামের ইতিহাসে মহানবির (সা.) এর একটি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটিতে তিনি আল্লাহর কাছে মানুষের জবাবদিহিতা, নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি অধিকতর আমানতের গুরুত্ব, সুদ প্রথা, দাস-দাসীদের প্রতি ব্যবহার, নরহত্যা, ব্যাভিচার, শ্রেনি বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়ে সমবেত জনসমুদ্রের উদ্দেশ্যে উপদেশ প্রদান করেন। তার এ বক্তব্যে বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আজ মুসলমানগণ ভ্রাতৃত্বের অভাবে বিশ্বজুড়ে অবহেলিত ও অত্যাচারিত।

ক. মুলতবী ওমরাহ কী?

খ. খন্দকের যুদ্ধের কারণটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ঘটনাটি ইসলামের ইতিহাসের কোন ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিফলন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. নারী অধিকার আদায়ে উদ্দীপকের ঘটনার আলোকে করনীয় ব্যাখ্যা কর।

৬. হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন যুগান্তকারী সমাজ সংস্কারক। যুগ যুগ ধরে চলে আসা মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বিলুপ্ত করে সাম্যের এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালীন আরব জাহানে নিগৃহীত নারী জাতিকে তিনি পূর্ণ সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ভোগের পরিবর্তে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী ও জীবন সঙ্গিনী রূপে মর্যাদা পায় নারী।

ক. খাইবারের যুদ্ধ কত খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল?

খ. সাম্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর হাদিসটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত হযরত মুহম্মদ (স.) কে যুগান্তকারী সমাজ সংস্কারক বলার কারণটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ভোগের পরিবর্তে অর্ধাঙ্গিনী ও জীবন সঙ্গিনী রূপে মর্যাদা পায় নারী'– উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১. মক্কা থেকে হিজরতকারী মুসলমানদের মহানবি (সা.) কী হিসেবে অভিহিত করেন?

ক) আনসার খ) মুশরিক

গ) মুহাজিরিন ঘ) ইয়াসরিব

২. মদিনায় মহানবি (সা.) এর আগমনের ফলে মদিনাবাসী–

i. সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়

ii. বিভিন্ন গোত্রে পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়

iii. ইহুদিদের সাথে সমঝোতায় উপনীত হয়।

কোনটি সঠিক?

ক) i এবং ii খ) ii এবং iii

গ) i এবং iii ঘ) i, ii এবং iii

৩. যুদ্ধ বিধ্বস্ত মদিনা নগরীর পুনর্গঠনে মহানবি (সা.) কর্তৃক প্রণীত মদিনা সনদ কী প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখে?

ক) আইনের শাসন খ) সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব

গ) অমুসলিমদের অধিকতর সুযোগ সুবিধা ঘ) মহানবিকে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের রূপে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪-৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

হিজরতের পর মহানবি (সা.) মদিনায় ইসলাম ধর্মকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হলে মক্কার কুরাইশ গোত্রসহ আরব বিশ্বের বিভিন্ন অমুসলিমদের নিকট থেকে প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে অমুসলিম ও মুসলমানদের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টা করা হয় পরে মক্কা বিজয়ে ইসলামের প্রসারতা আরও বৃদ্ধি পায়। মহানবি (সা.) মক্কা বিজয়কে অধিক তাৎপর্য বলে মনে করেন।

৪. ইসলামকে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহানবি (সা.) বিধর্মীদের কাছ থেকে প্রথম প্রতিরোধের সম্মুখীন হন–

ক) উহুদের যুদ্ধে
খ) বদরের যুদ্ধে
গ) নাখলার খন্ড যুদ্ধে
ঘ) খন্দকের যুদ্ধে

৫. মহানবি (সা.) এর মহানুভবতায় ইসলামের তাওহিদে দীক্ষিত হন খ্রিস্টান গোত্র–

i. বানু হানিফা
ii.বানু নাজির
iii. বানু হারিস

কোনটি সঠিক?

ক) i এবং ii
খ) ii এবং iii
গ) i এবং iii
ঘ) i, ii এবং iii

৬. ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মহানবি (সা.) মক্কা বিজয়কে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন কেন?

ক) মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে
খ) মক্কার গোত্র কলহ দূর হবে
গ) মুসলিম ও বিধর্মীদের মধ্যে সহাবস্থান বৃদ্ধি পাবে
ঘ) ইসলাম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে

৭. বিদায় হজের অমূল্য ভাষণে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) আহ্বান জানান–

i. ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হবার
ii. বংশগত কৌলীন্য প্রথা বিলুপ্ত করা
iii. শ্রেণি বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার

কোনটি সঠিক?

ক) i
খ) ii
গ) i এবং iii
ঘ) ii এবং iii

৮. হিলফ-উল-ফুজুলের উদ্দেশ্য কী ছিল?

ক) আরবদের গোত্রীয় কলহ দূর করা
খ) আরবদের সুসভ্য জাতিতে পরিণত করা
গ) আল্লাহর বাণী পৌঁছানো
ঘ) ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা

তৃতীয় অধ্যায়
খুলাফায়ে রাশেদিন
প্রথম পরিচ্ছেদ
খলিফার পরিচয়, যোগ্যতা ও নির্বাচন

খুলাফায়ে রাশেদিনের পরিচয়: খলিফা শব্দের অর্থ প্রতিনিধি। পবিত্র কুরআনের ভাষায় প্রত্যেক মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর খলিফা। কিন্তু ইসলামের ইতিহাসে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহর নেতাকে খলিফা বলা হয়। এ খিলাফত হচ্ছে মিনহাজুন নবুওয়্যাত বা নবুয়তের পদ্ধতি। ব্যাপকার্থে খিলাফত হচ্ছে ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। ইসলামের সরকার পদ্ধতিকে খিলাফত বলা হয়। ইসলামি জীবন ব্যবস্থার পরিপূর্ণ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন হয়েছিল খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে। আর তাঁদের ত্রিশ বছরের (৬৩২-৬৬১ খ্রি.) খিলাফত কালই ছিল ইসলামি শাসন ব্যবস্থার আদর্শ সোনালী যুগ। মহান আল্লাহ সর্বপ্রথম হযরত আদম (আ.) কে পৃথিবীর খিলাফত দান করেছিলেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যেও এ খিলাফত পুরুষানুক্রমে চলতে থাকে– যা বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করেছে। মুসলমানদের জনমতের ভিত্তিতে তাদের যে নেতা নির্বাচিত হয়, তাকে ইমাম বা খলিফা বলে। কারণ তিনি পৃথিবীতে আল্লাহর নবির প্রতিনিধি এবং মুসলমানদের নেতা।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর ইন্তেকালের পর যে চারজন বিশিষ্ট সাহাবি আল্লাহ ও রাসুলের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুযায়ী ইসলামি রাষ্ট্রের শাসন কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে গেছেন, তাঁরা খুলাফায়ে রাশেদিন বা সত্যপথগামী খলিফা নামে পরিচিত। তাঁরা হলেন–

১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)

২. হযরত উমর ফারুক (রা.)

৩. হযরত উসমান (রা.) এবং

৪. হযরত আলী (রা.)

মহানবি (সা.) এই খিলাফতের অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে– 'তোমাদের উপর আমার আদর্শের অনুসরণ ও খুলাফায়ে রাশেদিনের আদর্শের অনুসরণ অত্যাবশ্যক।' খুলাফায়ে রাশেদিনের জীবন ও তাঁদের ত্রিশ বছরের খিলাফত যুগের নজিরবিহীন কৃতিত্বের প্রমাণ নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে অনুমান করা যায়।

প্রশাসন : খলিফা ছিলেন প্রশাসনিক সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। শূরা বা উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। ইবনে খালদুনের মতে, 'খিলাফত হচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠান যা মহানবি (সা.) -এর মিশনের প্রতিনিধিত্ব করে'। সে কারণে খলিফার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং সাধারণভাবে রাষ্ট্রনীতি সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখা।

নির্বাচন পদ্ধতি : খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন পদ্ধতি ছিল গণতান্ত্রিক। খুলাফায়ে রাশেদিনের খলিফাগণ

যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। প্রাথমিক পর্যায়ে খলিফাদেরকে তিনটি উপাধিতে আখ্যায়িত করা হতো। তা হলো খলিফা, ইমাম ও আমিরুল মু'মিনীন। আল মাওয়ারদীর মতে, খলিফা পদের জন্য প্রাথমিক ৭টি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে। তাঁকে কুরাইশ বংশোদ্ভুত, মুসলমান, পুরুষ, প্রাপ্ত বয়স্ক, চরিত্রবান, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, শাসন কার্য পরিচালনার উপযোগী এবং কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তদুপরি তাঁকে মুসলিম রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য উপযুক্ত সাহসের অধিকারী হতে হবে।

এ যুগের নির্বাচন পদ্ধতি ছিল দুটো। একটি সরাসরি নির্বাচন যেমন হযরত আবু বকর (রা.) প্রথম খলিফা হিসেবে জনগণের সরাসরি সমর্থনে নির্বাচিত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় হলো নির্বাচকমন্ডলী কর্তৃক মনোয়ন দান। উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, শিক্ষিত, ন্যায়বান, আদর্শবান কয়েকজন ব্যক্তিত্বকে নিয়ে খলিফাগণ মৃত্যুর পূর্বে একটি নির্বাচকমন্ডলী গঠন করতেন। খলিফার মৃত্যুর পর তাঁরা পরবর্তী যোগ্য লোকদের মধ্য থেকে খলিফা নির্বাচন করতেন। এ পদ্ধতিতে হযরত উমর (রা.), হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। আদর্শবান ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ একজন খোদাভীরু, সৎ, যোগ্য, পদের প্রতি লোভহীন, সাহসী, কর্মঠ, সংযমী, উদ্ভাবনীয় ও বিশ্লেষণী শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে খলিফা হিসেবে নিযুক্ত করতেন। সকলে তাঁর হাতে হাত রেখে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করতেন। প্রশাসক বা কোন দায়িত্বশীল নিয়োগের ক্ষেত্রে সে আমলে মনোনয়ন দান করা হত সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে। কারণ জাতীয় স্বার্থকেই তাঁরা বড় করে দেখতেন।

খলিফাদের বেতন ভাতা : খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়ে খলিফাদের কোনো বেতন দেয়া হতো না। সরকারি অর্থে বা বাইতুল মালে তাদের কোনো প্রকার দাবি ছিল না। সাধারণ মুসলমানগণের মতো সরকারি ভাতা গ্রহণ করে তারা সরকার পরিচালনার কাজ করতেন। অবশ্য তাঁরা অনেকেই এ ভাতা মৃত্যুর আগে নিজ সম্পত্তি থেকে বাইতুল মালে ফেরত দিয়ে গেছেন।

জীবনযাত্রা : খুলাফায়ে রাশেদিনের আমলে খলিফাদের জীবনযাত্রা ছিল সাধারণ ও অনাড়ম্বর। খলিফাগণ মসজিদে বসেই রাজকার্য পরিচালনা করতেন।

খুলাফায়ে রাশেদিনের নির্বাচন : সাম্যবাদের মূর্ত প্রতীক হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কাউকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যাননি। তার কোনো পুত্র সন্তানও তাঁর ইন্তিকালের সময়ে জীবিত ছিলেন না। এ কারণে মুসলিম উম্মাহর মধ্য থেকে যোগ্যতার ভিত্তিতে খলিফা নির্বাচনের ব্যবস্থা চালু হয়। খুলাফায়ে রাশেদিনের চারজন খলিফা কিভাবে কোন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন তার একটি বিবরণ নিচে তুলে ধরা হল।

হযরত আবু বকর (রা.) এর খলিফা নির্বাচন: হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর ইন্তিকালের পর আনসারগণ সাকিফা নামক মিলনায়তনে একত্রিত হন এবং খিলাফত সম্পর্কে আলোচনা করেন। আনসারগণ চেয়েছিলেন- খলিফা দু'জন হোক। একজন আনসারদের মধ্য থেকে অন্যজন মুহাজিরদের মধ্য থেকে। এ কথা সুস্পষ্ট যে, খলিফা দু'জন হলে তা সাংঘাতিক মতানৈক্যের কারণ হতো। শুধু আনসারদের মধ্যে থেকেও খলিফা নির্বাচন করা সম্ভব ছিল না।

খিলাফতকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হয়। মহানবি(সা.) এর চাচাত ভাই ও জামাতা হিসেবে একদল মুহাজির হযরত আলী (রা.) কে রাসুলের উত্তরাধিকারী বলে প্রচারণা চালান। এদিকে আনসারগণ সা'দ বিন আবু উবায়দাকে খলিফা নির্বাচনের দাবী জানান। এই বিষয়ে যখন বাক-বিতন্ডা শুরু হলো তখন হযরত আবু বকর (রা.) খুবই উত্তম পন্থায় আনসারদের বুঝাতে সক্ষম হলেন। হযরত উমর (রা.) এর উদ্দীপনায় সবাই এ ব্যাপারে একমত হলেন যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর উপর

খিলাফতের দায়িত্ব অর্পণ করা হোক। অতপর মুহাজিরদের মধ্য হতে সর্বপ্রথম হযরত উমর (রা.) এবং আনসারদের মধ্য হতে হযরত বাসির ইবনে সা'দ (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) এর হস্ত ধারণ করে বাইআত গ্রহণ করলেন। তারপর উপস্থিত জনতা বাইআত গ্রহণ করেন। মোট কথা এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সাধ্যসম্মতভাবে সমাধা হয়ে গেল এবং মুসলমানগণ হযরত নবি করিম (সা.) এর কাফন-দাফনে মনোনিবেশ করেন।

বয়োজেষ্ঠ্যতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সুক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি, নিস্বার্থ আত্মত্যাগ, সামাজিক কার্যকলাপ ও ব্যক্তিগত প্রভাবের জন্য ইসলামি রীতিতে হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। তাকে খলিফা নির্বাচনে রাসুল(স.)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশ না থাকলেও পরোক্ষ ইঙ্গিত ছিল। খলিফা নির্বাচিত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের সাম্যবাদ ও ভ্রাতৃত্ববোধে মুসলিম জাহানকে উদ্বুদ্ধ করেন।

খলিফার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাবলি :

আল্লাহ্ তায়ালার প্রত্যাদেশ লাভ ব্যতীত খলিফাকে নবুয়তের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাই তাঁকে ঐ সমস্ত আত্মিক, দৈহিক ও চারিত্রিক গুণাবলিতে গুণান্বিত হওয়া উচিত, যার দ্বারা একজন নবি গুণান্বিত হয়ে থাকেন। তবে, নবির সমস্ত গুণাবলির প্রতিবিম্ব খলিফার মধ্যে থাকা একান্ত প্রয়োজন। খলিফা নির্বাচনের জন্য ঐতিহাসিক ও সমাজ বিজ্ঞানী ইবনে খালদুন যে শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছেন–

- ☐ **ন্যায়পরায়নতা :** একজন খলিফার মধ্যে ন্যায় পরায়নতা সত্যবাদিতা ও সৎ কাজের প্রতি আগ্রহ থাকতে হবে।
- ☐ **দৃঢ়চিত্ততা :** ইসলামি শরিয়তের বিধান বাস্তবায়ন, ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ, জ্ঞান, কলাকৌশল, প্রজ্ঞা, প্রত্যয় ও সাহস অবশ্যই থাকতে হবে।
- ☐ **ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুস্থতা:** একজন খলিফা শারীরিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন। বিকলাঙ্গ হওয়া ঠিক নয়। তার চোখ, নাক, কান, কণ্ঠস্বর, হাত-পা ইত্যাদির সুস্থ ও সবল থাকতে হবে।

হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতের যোগ্যতা :

নিম্নলিখিত দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফত প্রাপ্তি ন্যায়সঙ্গত ও গুরুত্বপূর্ণ :

১। পবিত্র কুরআনের আয়াত দ্বারা হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি ইঙ্গিত।

২। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব।

৩। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর চরিত্রের সাথে সামঞ্জস্য।

৪। হযরত আবু বকরের প্রতি মহানবি (সা.) এর পূর্ণ আস্থা।

৫। মহানবি (সা.) -এর কথা ও কাজের দ্বারা হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রতি ইঙ্গিত।

৬। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) এর মর্যাদা।

৭। ইসলামের সেবায় হযরত আবু বকর (রা.) এর আর্থিক আত্মত্যাগ।

দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর নির্বাচন

ইসলামি শরিয়ত মতে হযরত আবু বকর (রা.) দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচনের ব্যবস্থা করে যান। খিলাফত নিয়ে যাতে কোন রকম দ্বন্দ্ব সংঘাত সৃষ্টি না হয়, এজন্য তিনি অন্তিম অবস্থায় প্রখ্যাত সাহাবি হযরত আবদুর রহমান (রা.), হযরত উসমান (রা.) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এবং আরও বিশিষ্ট সাহাবাগণের সাথে পরামর্শ ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে যোগ্যতার বিবেচনায় হযরত উমর (রা.)-কে দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

হযরত উমরের (রা.) কড়া মেজাজের জন্য হযরত তালহা (রা.) তার সম্মতি দিতে ইতস্তত করলে হযরত আবু বকর (রা.) হযরত তালহাকে বলেন যে, রাষ্ট্রের গুরু দায়িত্বভার গ্রহণ করলেই তিনি কোমল ও দয়ালু হয়ে যাবেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর ইনতিকালের পর দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে হযরত উমর (রা.) এর মনোনয়ন ঘোষণা করা হলে জনসাধারণ তাঁর নিকট স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। এভাবে হযরত উমর (রা.) গণতান্ত্রিকভাবে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হিসেবে নির্বাচিত হন।

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) এর নির্বাচন

হযরত উমর (রা.) নিজ জীবদ্দশায়ই খিলাফতের উত্তরাধিকারী নির্বাচনের দায়িত্ব হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবাইর (রা.), হযরত সা'দ (রা.) এবং হযরত আবদুর রহমান বিন আউফকে নিয়ে গঠিত এক পরিষদের উপর ন্যস্ত করেন। আর তাঁর ইনতিকালের তিনদিনের মধ্যেই মনোয়ন সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন। এ সকল সাহাবাগণের মধ্যে সবাই ছিলেন ইসলামের খেদমতে সমানভাবে নিবেদিত। শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে কেউই একে অপরকে ছাড়িয়ে যাবার মত বিশেষত্ব দেখাতে পারেননি। জনগণের নিকট বেশি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন হযরত আবদুর রহমান (রা.)। কিন্তু খিলাফতের গুরুদায়িত্ব গ্রহণে তিনি রাজি ছিলেন না। হযরত আলী (রা.) ছিলেন মহানবি (স.) এর জামাতা ও চাচাত ভাই। শিক্ষা-দীক্ষা ও শৌর্যবীর্যে তার তুলনা ছিল না। পারস্য বিজয়ী বীর হযরত সা'দ (রা.) এর ইসলামের জন্য অবদান ছিল অসামান্য। এ সময় হযরত তালহা (রা.) রাজধানী মদিনায় ছিলেন না। হযরত উসমান (রা.) ৭০ বছরের প্রৌঢ় হলেও ইসলামের খেদমতে অকাতরে দান করেন এবং মহানবি (সা.) এর দু'কন্যা রোকেয়া ও উম্মে কুলসুমের জামাতা হয়ে যুননুরাইন খেতাবে ভূষিত ছিলেন। হযরত সা'দ (রা.), হযরত তালহা (রা.) ও হযরত জুবাইর (রা.) খিলাফতের প্রত্যাশী ছিলেন না। এমন অবস্থায় হযরত আবদুর রহমান (রা.) হযরত উসমান (রা.) হযরত আলী (রা.) এর নাম প্রস্তাব করেন। হযরত সা'দ (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে সমর্থন করেন। হযরত জুবাইর (রা) হযরত উসমান (রা.) ও হযরত আলী (রা.) উভয়ের নাম প্রস্তাব করেন। হযরত উসমান (রা.) হযরত আলীকে এবং হযরত আলী (রা.) হযরত উসমান (রা.)-কে সমর্থন দিলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা.) ভোটদানে বিরত রইলেন। ফলে হযরত উসমান (রা.) এর পক্ষে একটি ভোট বেশি পড়ে এবং খলিফা নির্বাচিত হলেন। প্রত্যেকেই তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। হযরত তালহা (রা.) ফিরে এলে হযরত উসমান (রা.) তাঁকে খলিফা পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু তিনি এতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। তিনি হযরত উসমান (রা.) এর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। জনসাধারণ সবাই তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেন। এভাবে হযরত উমর (রা.) এর মৃত্যুর ৪র্থ দিনে ২৪ হিজরির ১লা মহরম (৬৪৪ খ্রি.) হযরত উসমান (রা.) ইসলামি জগতের তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত হন।

চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা) এর নির্বাচন

খলিফা হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের পর আরবের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। খিলাফতের পবিত্রতা ও মর্যাদা বিনষ্ট হয়। এ সময় তিনটি দলে উগ্রপন্থীরা বিভক্ত হয়ে স্ব-স্ব দলের মনোনীত ব্যক্তিকে খলিফা পদে বরণ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠে। এরূপ গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে হযরত উসমান (রা.) এর উত্তরাধিকারী তথা পরবর্তী খলিফা নির্বাচন খুবই কঠিন অবস্থার সৃষ্টি করে।

বিদ্রোহী কুফাবাসীরা হযরত জুবাইর (রা.), বসরাবাসীরা হযরত তালহা (রা.) এবং মিসরীয়রা ইবনে সাবার নেতৃত্বে হযরত আলীকে খলিফা হিসেবে সমর্থন করে। পরিশেষে হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার ৫ম দিনে মিসরীয় বিদ্রোহীরা হযরত আলী (রা.) এর নাম প্রস্তাব করেন। কুফা ও বসরার বিদ্রোহীরাও হযরত আলী (রা.) কে সমর্থন জানান ফলে মদিনার প্রভাবশালী নাগরিকগণের অনুরোধে হযরত আলী (রা.) খলিফার দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি হন। জনসাধারণও তাঁর হাতে আনুগত্যের শপথ গ্রহন করেন। এভাবে গণতান্ত্রিক উপায়েই ইসলামের চতুর্থ খলিফা হিসেবে হযরত আলী (রা.) (২৩ জুন, ৬৫৬ খ্রি) নির্বাচিত হন।

এক নজরে খুলাফায় রাশেদিনের সময়কাল।

খলিফা	খেলাফতের সূচনা	সমাপ্তি	সময়কাল
হযরত আবু বকর (রা.)	১৩ই রবিউল আউয়াল ১১ হিজরি	২২ শে জমাদিউল উখরা ১৩ হিজরি	২ বছর ৩ মাস ৯ দিন
হযরত উমর ফারুক (রা.)	২৩ শে জমাদিউল উখরা ১৩হিজরি	২৬ শে জিলহজ্জ ২৩ হিজরি	১০ বছর ৬ মাস ৩ দিন
হযরত উসমান (রা.)	১লা মুহররম ২৪ হিজরি	১৮ই জিলহজ্জ ৩৫ হিজরি	১১ বছর ১১ মাস ১৭ দিন
হযরত আলী (রা.)	২৪ শে জিলহজ্জ ৩৫ হিজরি	১৭ই রমযান ৪০ হিজরি	৪ বছর ৮ মাস ২৩ দিন
হযরত ইমাম হাসান (রা.)	২২ শে রমযান ৪০ হিজরি	রবিউল আউয়াল ৪১ হিজরি	৬ মাস ৮ দিন

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)
(৬৩২-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)

হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রাথমিক জীবন ও খিলাফত লাভ: ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম জাহানের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)।নবি-রাসুলগণের পরই তাঁর মর্যাদা।ইসলাম গ্রহণের আগে তিনি অন্যান্যদের মত জাহেলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলেন না বরং পুত-পবিত্র চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি আজীবন রাসুলুল্লাহর পাশে ছিলেন ছায়ার মতো। নবুয়তের আগে ও নবুয়ত লাভের পরে হযরত মুহাম্মদ (স.) কে সমানভাবে সম্মান ও মর্যাদা দিয়ে তিনি তাঁকে অনুসরণ করেছেন। ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর জীবন-চরিত্র আরও উন্নততর হয়ে উঠে। প্রাথমিক জীবনে তিনি মানবতার সেবা করতেন। ইসলাম গ্রহণের পরে তিনি আরও বেশি দুর্গত মানবতার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। ইসলামের সেবায় তিনি তার সমুদয় ধন-সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ। উপনাম ছিল আবু বকর। আতিক ও সিদ্দিক ছিল তাঁর উপাধি। তাঁর পিতা হলেন হযরত ওসমান ওরফে আবু কুহাফা এবং মাতা ছিলেন হযরত সালমা ওরফে উম্মুল খায়ের। তার পিতামাতা উভয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মক্কার কুরাইশ বংশের 'তাইম' গোত্রে ৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর চেয়ে তিন বছরের ছোট ছিলেন।

হযরত আবু বকর (রা.) জাহেলিয়াতের যুগে বিরাট ব্যবসায়ী ও সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। এ উপলক্ষে তিনি একাধিকবার সিরিয়া ও ইয়ামেন সফর করেন। আঠার বছর বয়সে প্রথম বারের মতো তিনি বিদেশ সফর করেন। কুরাইশ বংশের সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন গোত্র আরবের বিভিন্ন সেবামূলক কার্যের জিম্মাদার ছিলেন। রক্তপণ আদায়ের জিম্মাদারী তাঁর উপর ন্যাস্ত ছিল। বংশ গণনায়ও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। বাল্যকাল থেকেই হযরত আবু বকর (রা.) উত্তম স্বভাব চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের আগে থেকেই তিনি মূর্তিপূজা ও মদ্যপানকে ঘৃণা করতেন।

উঁচু মর্যাদা: আরবে যথারীতি কোন বাদশাহ বা শাসনকর্তা ছিল না। হযরত আবু বকর (রা.) কুরাইশ বংশের সবচেয়ে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) জ্ঞান-বুদ্ধি, ধৈর্য ও সহনশীলতায় অত্যন্ত খ্যাতিমান ছিলেন। একটি বর্ণনায় আছে যে, তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন। অবশ্য ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কাব্য চর্চা পরিত্যাগ করেন। ইবনে সায়াদ নবি করীম (স.) এর শোকগাঁথায় হযরত আবু বকর (রা.) এর কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

স্বভাব-চরিত্র: আবু বকর (রা.) উত্তম স্বভাবের ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রকৃতি ছিল হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর সাথে সামঞ্জস্যশীল। সমবয়সী ও একই স্বভাব-প্রকৃতির অধিকারী হওয়ার কারণে হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) এর মধ্যে ঘনিষ্টতা ছিল। ইসলাম গ্রহণের পর এই সম্পর্ক এত নিবিড় হয় যে, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– আমাদের এমন কোনোদিন অতিবাহিত হয়নি, যেদিন রাসুলুল্লাহ (স.) সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের গৃহে পদার্পণ করেননি।

ইসলাম গ্রহণ: হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর উপর যখন ওহি নাযিল হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) বাণিজ্য উপলক্ষে ইয়ামেনে ছিলেন। যখন তিনি ফিরে আসেন তখন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তার সাথে দেখা করতে যান। তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করেন কোনো নতুন খবর আছে? তারা উত্তর দিল, "হ্যাঁ এক নতুন খবর আছে, আর তা হলো আবু তালিবের ইয়াতীম ভাতিজা নবুয়তের দাবী করেছে। এ শুনে হযরত আবু বকরের অন্তর কেঁপে উঠল। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ তাঁর নিকট হতে চলে যাওয়ার পর তিনি সরাসরি নবি (স.) এর খেদমতে গিয়ে হাজির হন এবং তাঁকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। শেষ পর্যন্ত ঐ বৈঠকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। নবি (স.) বলেছেন, আমি যখন তাঁর নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করি, তিনি কোনোরূপ চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই সাথে সাথে তা গ্রহণ করছিলেন। বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান।

ইসলামের জন্য আত্মত্যাগ: ইসলামের জন্য এ আত্মত্যাগকারী ব্যক্তি অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন। হযরত আবু বকর (রা) নিজের জন্য কখনো ভাবতেন না। তিনি ভাবতেন যেন নবি করীম (সা.) এর কোন কষ্ট না হয়। হযরত আলী (রা) বলেন, একদিন আমি দেখি নবি (সা.) কে কুরাইশরা বেষ্টন করে আছে। কেউ তাকে ধরে টানছে, আবার কেউ ধাক্কা দিচ্ছে। সবাই সমস্বরে বলছে–তুমি সেই ব্যক্তি, যে সব খোদাকে এক করে দিয়েছো। হযরত আলী (রা.) বলেন ঐ দৃশ্য এত ভয়ানক ছিল যে, আমাদের কারও নবি করিম(সা.) এর নিকট যাওয়ার সাহস হয়নি। ঠিক তখনই হযরত আবু বকর (রা.) এগিয়ে আসলেন, কুরাইশদের ধাক্কা দিয়ে নবিজীকে মুক্ত করলেন।

তিনি সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। ইসলাম গ্রহণ করার পর তার সমুদয় অর্থ ইসলামের জন্য ব্যয় করেন। তিনি অনেক দাস-দাসীকে তাদের মনিবদের নির্যাতন হতে মুক্ত করার বিপুল অর্থে খরিদ করে মুক্ত করে দেন। হযরত বিলাল (রা.) কে মুক্ত করা সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) মন্তব্য করেছেন ঃ 'হযরত আবু বকর (রা.) আমাদের নেতা, তিনি আমাদের নেতাকে আযাদ করেছেন।'

হযরত আবু বকর (রা.) এর আর্থিক ত্যাগ সম্পর্কে মহানবি (স.) বলেছেন, "আবু বকর-এর সম্পদ দ্বারা আমার যে উপকার হয়েছে, অন্য কারো সম্পদ দ্বারা সেরূপ হয়নি।" অন্য এক জায়গায় রাসুলুল্লাহ (সা.) অত্যন্ত করুণা ও কৃতজ্ঞতার সাথে বলেন, "নিঃসন্দেহে জান ও মালের দিক দিয়ে আমার উপর আবু বকর (রা.) এর চেয়ে অধিক অনুগ্রহ অন্য কারো নেই।" যখন হযরত আবু বকর (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁর নিকট চল্লিশ হাজার দিরহাম জমা ছিল। কিন্তু যখন তিনি মদিনায় পৌছেন তখন তাঁর নিকট পাঁচ হাজার দিরহাম অবশিষ্ট ছিল।তিনি ছিলেন নবি করিম (সা.) এর হিজরতের সাথী ও গুহার সাথী। তিনি নবি করিম (সা.) এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.) এর প্রথম ভাষণ

খলিফা নির্বাচিত হওয়ার প্রথম ভাষণে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন: হে মুসলমানগণ! আমাকে নেতা নির্বাচন করেছেন, যদিও আমি আপনাদের মধ্যে সর্বোত্তম নই। যদি আমি ভালো কাজ করি, আমাকে সাহায্য করবেন, যদি অন্যায় ও খারাপ কাজের দিকে যাই, আমাকে সংশোধন করে দিবেন। শাসকদের নিকট সত্য প্রকাশ করাই উত্তম আনুগত্য। সত্য গোপন রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল। যে জাতি আল্লাহর পথে জিহাদ করে না, তারা লাঞ্ছিত অভিশপ্ত হয়। যে জাতির মধ্যে খারাপ কাজ ব্যাপক হয়, তাদের উপর আল্লাহ বালা-মুসিবত ব্যাপক করে দেন।'

হযরত আবু বকর (রা.) গণতান্ত্রিক পন্থায়ই খলিফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) রোগ শয্যায় শায়িত থেকে তাঁকে নামাযের ইমামতির ভার দিয়েছিলেন। এর মধ্যে এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ছিল যে, তাঁর তিরোধানের পর আবু বকর খিলাফত প্রাপ্ত হবেন।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ:

হযরত আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পর বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হন।

- ভণ্ডনবিদের আবির্ভাব
- স্বধর্ম ত্যাগীদের বিদ্রোহ
- যাকাত অস্বীকারকারীদের গোলযোগ

এছাড়াও হযরত উসামা ইবনে যায়েদের ঘটনা, যাকে রাসুল (সা.) আপন জীবদ্দশায় মুতার যুদ্ধের শহীদানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সিরিয়া হামলার শুধু আদেশই দেননি, নিজ হাতে তাঁর পতাকা বেঁধে দিয়েছিলেন। এতে অধিকাংশ বড় সাহাবীর অংশগ্রহণের নির্দেশ ছিল। অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় সেনাবাহিনীর মদিনার বাইরে যাওয়া কম বিপদজ্জনক ছিল না। দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতায় হযরত আবু বকর (রা.) এ সমস্যার সাফল্যজনক মোকাবেলা করেছিলেন।

মূলত তখন সঙ্কটের এক পাহাড় খলিফার সামনে মাথা উঁচু করে দাড়িয়ে ছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর ইনতেকালের পর মুসলমানদের এমন অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যে, যদি আল্লাহ তায়ালা হযরত আবু বকর (রা.) এর মাধ্যমে আমাদের উপর করুণা না করতেন, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স.) এর ইনতেকালের পর আমার পিতার উপর এমন সব আকস্মিক বিপদ আপতিত হয় যে, যদি তা কোন বিরাট পাহাড়ের উপর নাযিল হত তা হলে সে পাহাড়ও টুকরা টুকরা হয়ে যেত। একদিকে মদিনায় মুনাফিকদের উৎপত্তি, অন্যদিকে আরবের প্রায় সর্বত্র ইসলাম ত্যাগের হিড়িক।

রিদ্দা বা স্বধর্ম ত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

মহানবি (সা.) এর ইনতিকালের পর মক্কা ও মদিনা ব্যতীত সমগ্র আরবে ধর্মত্যাগ ও বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর সময়ে স্ব-ধর্ম-ত্যাগী মুরতাদ, ভন্ড নবির আবির্ভাব যাকাত প্রদানে অনিচ্ছা প্রভৃতি স্পর্শকাতর বিষয়সমূহ মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের ভীত নড়বড় করে তোলে। এমতাবস্থায় হযরত আবু বকর (রা.) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এসবের সমাধানকল্পে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ইতিহাসে একেই 'রিদ্দার যুদ্ধ' বলা হয়। হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর স্বল্পকালীন খিলাফতের বেশিরভাগ সময় এ যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন।

রিদ্দা যুদ্ধের কারণ

ইসলাম প্রসারে বিঘ্ন : রাসুল (সা.) এর ইনতিকালের পূর্বে আরবের বিভিন্ন গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেছিল। ফলে ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও জীবনাদর্শের মূল অনুশাসন সম্পর্কে তাদের অনেকেই অজ্ঞ ছিল। এছাড়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকা, যোগাযোগের অভাব, সময়ের স্বল্পতা, সংঘবদ্ধভাবে ইসলাম প্রচারের অভাবে এসব লোকজন ইসলামের বিরোধিতা শুরু করে।

মদিনার প্রাধান্য ও অস্বীকার : রাসুলের জীবদ্দশায়ই মদিনা ইসলামের প্রাণকেন্দ্র ও রাষ্ট্রের রাজধানী হওয়ার গৌরব অর্জন করে। কিন্তু তার ইন্তেকালের পর মক্কায় একশ্রেণির লোক ও অন্যান্য কুচক্রী মহল মদিনার প্রাধান্যকে অস্বীকার করে। ঐতিহাসিক পি. কে .হিট্টি বলেন -'হিজাজ রাজধানীর প্রাধান্য ও তাদের ঈর্ষার এবং বিদ্রোহের (রিদ্দা যুদ্ধের ও) অন্যতম কারণ ছিল'।

ব্যক্তি স্বার্থে আঘাত : আরববাসীদের মধ্যে গোত্রপ্রীতি , স্বজনপ্রীতি, স্বাতন্ত্রবোধ, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও নেতৃত্বের লোভ ছিল। কিন্তু ইসলাম প্রতিষ্ঠার ফলে এসব বিলীন হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠিত হয় ভ্রাতৃত্ববোধ, সাম্য-মৈত্রীর সুমহান আদর্শ। ফলে বেদুইনদের মনে দারুণ আঘাত হানে। তারা যেহেতু গোত্রের দলপতিকে অন্ধের মতো অনুসরণ করতো, তাই গোত্রপতির ধর্ম ত্যাগের সাথে সাথে তারাও ধর্মত্যাগী হয়ে বিদ্রোহ করে।

নবুয়ত প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা: নবুয়তের পদ ছিল অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। তাই কতিপয় লোক সম্মান ও পদমর্যাদার লোভে মিথ্যা নবুয়ত দাবী করে আর মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে আরবাসীদেরকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলে।

ইসলামের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের বিরোধিতা: প্রাক ইসলামি যুগে আরবে এমন কোনো অন্যায় কাজ ছিল না যা আরববাসীরা করতো না। রাসুল(স.) ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল স্তরে আমুল পরিবর্তন করেন। শতধা বিচ্ছিন্ন একটি জাতিকে সুশৃঙ্খল সুসভ্য জাতিতে পরিণত করেন। এতে বেদুইনরা খুশি হতে পারেননি। কাজেই তাঁর মৃত্যুর পর স্বার্থপর বেদুইনরা ইসলামের বিধানের বিরোধীতা শুরু করে।

ইসলামের নৈতিক অনুশাসনের বিরোধিতা: ইসলামের নৈতিক অনুশাসন, রুচিসম্মত ও মার্জিত জীবনযাত্রায় স্বাধীনচেতা অনুশাসনমুক্ত আরববাসীরা অভ্যস্থ ছিল না। চিরদিনই তারা ছিল দুরন্ত বাধা-বন্ধনহীন। তাই ইসলামের সালাত, যাকাত, সাওম প্রভৃতি নৈতিক অনুশাসনকে তারা মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। বরং নিজেদের উপর এগুলোকে জুলুম মনে করলো। আর এ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ইসলাম ত্যাগ করতে উদ্বুদ্ধ হল।

যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি: রিদ্দা যুদ্ধের অন্যাতম কারণ ছিল যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি। আরবের কতিপয় লোক মনে করলো, এ যাকাত ব্যবস্থা নবির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। নবি যেহেতু ইনতেকাল করেছেন, তাই এর প্রয়োজন নেই ফলে তারা আবু বকর (রা.) এর খিলাফতের সময় যাকাত দিতে অস্বীকার করলো।

অমুসলিম সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ: এক দিকে ইসলাম ত্যাগী বেদুইন স্বার্থান্বেষী গোত্রপতি ও ভন্ডনবিদের অপতৎপরতা শুরু হয় অন্যদিকে বিধর্মীদের মধ্যে ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের লোকেরা এ মোক্ষম সুযোগ বুঝে ইসলামের বিরোধিতা বাড়িয়ে দেয় এবং এদের ইন্ধনে পরিস্থিতি আরও জটিল আকার ধারণ করে।

বিচার বুদ্ধির অভাব: পরিবেশের অভাবে আরবদের মন ও মস্তিষ্ক সুষ্ঠুভাবে বিকাশ লাভ করতে পারেনি। ফলে বিচার-বুদ্ধি তাদের খুব কম ছিল। তারা অনেকেই আবেগে আপ্লুত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলেও পরে অস্থির খেয়ালী মনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এর বিরুদ্ধাচরণ করে।

এসব কারণে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মানুষ ইসলাম ত্যাগ করে পুরোনো ধর্মে ফিরে যাওয়ার জন্য আন্দোলন সৃষ্টি করে। প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) এই আন্দোলন কঠোর হাতে দমন করেন।

রিদ্দা যুদ্ধের ফলাফল

ইসলামের অখন্ডতা বজায়: ইসলামি যুগে আরব বিভিন্ন জাতি, গোত্র ও এলাকায় বিভক্ত ছিল। ইসলাম এসে অখণ্ড জাতি হিসেবে আরবকে মর্যাদার আসন দেয়। কিন্তু নবিজীর ইনতেকালের পর আরববাসীরা বিভক্ত হয়ে পড়লে পুনরায় আবু বকর ইসলামের অখন্ডতা বজায় রাখতে সক্ষম হন।

স্থায়ী মর্যাদা লাভ: মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার ভন্ডনবিদের ওপর জয়লাভের পর ইসলাম অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে স্থায়ী মর্যাদা লাভ করলো।

মুসলমানদের ইমানী শক্তি বৃদ্ধি: রাসুল (স.) এর ইনতিকালের অল্পকালের মধ্যেই ইসলামের এ ধরনের বিপর্যয় দেখে অনেক মুসলমানের মনেও সংশয় ছিল কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) এর দৃঢ় প্রতিরোধের মুখে সকল ষড়যন্ত্র নস্যাৎ হলে মুসলমানদের ইমানী শক্তি বৃদ্ধি পায়।

রাষ্ট্রের ভিত্তি সুদৃঢ়: মদিনার ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে শক্ত হাতে ধর্মত্যাগী ও বিদ্রোহীদের দমন করা হলে এ রাষ্ট্রের শক্তি ও ভিত আরো সুদৃঢ় হয়, যা বিরোধীদের কাছে অপরাজেয় মনে হয়েছিল।

জয়ের দিগন্ত উন্মোচন: অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা দমনের পর আরবের বাইরে ইসলামের শক্তি সম্প্রসারণ করার অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেন এবং এরই সাথে ইসলামের জয়ের দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

পরোক্ষ ফলাফল

রিদ্দার যুদ্ধে মুসলমানরা নতুন নতুন কৌশল আয়ত্ত করে সামরিক দিক থেকে আরও শক্তিশালী হয়। রিদ্দা যুদ্ধের সময় রোমান ও পারসিকরা সীমান্ত প্রদেশে ধর্মত্যাগীদেরকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। তাই পরবর্তীকালে খলিফাগণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থে এর প্রতিশোধ নিতে বাধ্য হন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য মুসলমানদের দখলে আসে।

ভন্ডনবিদের দমন ঃ এসব কারণে আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা ইসলাম ত্যাগ করে পুরোনো ধর্মে ফিরে যাওয়ার জন্য আন্দোলন করে। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এ আন্দোলনকারীদের কঠোর হাতে দমন করেন।

আসওয়াদ আনাসী ও তুলাইহাকে দমন: ভন্ডনবিদের আবির্ভাবে হযরত আবু বকর (রা.) বিচলিত না হয়ে ইস্পাত কঠিন শপথ গ্রহণ করে বিদ্রোহরত সকল অঞ্চলে ১১টি মুসলিম সেনাদল প্রেরণ করেন। তিনি প্রথমে ভন্ডনবি আসওয়াদ আনসীর সমর্থক বিদ্রোহী 'আবস' ও 'জুবিয়ান' গোত্রদ্বয়কে যুলকাশা ও রাবারজার যুদ্ধে পরাজিত করেন। আসওয়াদ আনাসী শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করে। এভাবে আসওয়াদ আনাসী ও তার সমর্থক গোষ্ঠী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

এরপর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রেরণ করা হয় তুলাইহা ও তার সমর্থক বিদ্রোহী তামিম ও ইয়ারবু গোত্রদ্বয়কে দমন করার জন্য। হযরত খালিদ (রা.) অত্যন্ত সফলতার সাথে এ গোত্রদ্বয়কে পরাজিত করে তুলাইহাকে দমন করেন। খলিফার নির্দেশে তোলায়হা বহু অনুচরসহ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়।

মুসাইলামা ও সাজাহকে দমন: ভন্ডনবিদের মধ্যে মুসাইলামা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। সে মহিলা ভন্ডনবি সাজাহকে বিয়ে করে বানু হানীফা গোত্রের চল্লিশ হাজার লোকের একটি বিদ্রোহী দল গঠন করে ইসলামকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। মুসাইলামাসহ হানীফা গোত্রের প্রায় দশ হাজার ধর্মত্যাগী যুদ্ধে নিহত হয়। ঐতিহাসিক 'তাবারী' একে 'মৃত্যুর বাগান' বলে উল্লেখ করেন। জোসেফ হেল বলেন, "কঠিনতম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধসমূহের মধ্যে ইয়ামামার যুদ্ধ অন্যতম।" মুসলমানদের পক্ষে বহু সাহাবী এবং সত্তর জন হাফিজ-ই-কুরআন শাহাদাতবরণ করেন। এ যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের উপর ইসলামের অস্তিত্ব নির্ভর করছিল। এ যুদ্ধের পর সাজাহ বনু হানীফা গোত্রের লোকজনসহ ইসলাম গ্রহণ করে।

কুরআন সংকলন

মহানবি (সা.) এর আমলে পবিত্র কুরআন লিখিত রূপ পায়নি। তখন তা সাধারণত হাফিজগণই মুখস্থ রাখতেন। কিন্তু হাফিজদের মৃত্যুর পর তা বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে হযরত উমরের পরামর্শে ওহি লেখক সাহাবি হযরত যায়িদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে পবিত্র কুরআনকে একত্রে পুস্তক আকারে সংকলিত করা হয়। কুরআন সংরক্ষণ ও সংকলন হযরত আবু বকর (রা.) এর সর্বশ্রেষ্ঠ ও অমর কীর্তি।

ইসলামের প্রতি হযরত আবু বকর (রা.) এর অবদানের স্বীকৃতি দেখা যায় প্রখ্যাত সাহাবি ইবনে মাসউদের বক্তব্যে : 'মহানবির (স.) ইনতিকালের পর আমরা এমনি অবস্থায় পতিত হয়েছিলাম যে, যদি আল্লাহ্ তাআলা আবু বকর (রা.) এর মাধ্যমে আমাদের অনুগ্রহ না করতেন, তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম।'

"শুধু আবু বকরের জন্যই ইসলাম বেদুইনদের সাথে আপস করতে না গিয়ে অঙ্কুরেই নিশ্চিহ্ন বা বিনষ্ট হয়ে যায়নি।

বস্তুত ইসলামের সকল বিপর্যয়ের ধাক্কা প্রথমেই হযরত আবু বকর (রা.) কে সামলাতে হয়। তাঁর চরিত্রে রয়েছে অনেক মহৎ গুণের সমারোহ। তিনি একাধারে বিদ্বান, সিদ্দীক উপাধিপ্রাপ্ত, দৃঢ়চেতা সাহসী শাসক। ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী তাঁর মূল্যায়ন করেছেন এভাবে : 'Like his master, Abu Bakar was extremly simple in his habits gentle but firm, he devoted all his energies to the administration of new born state and to the good of people.' অর্থাৎ ইসলামের প্রতি তাঁর এ সকল অবদানের কথা বিবেচনা করেই হযরত আবু বকর (রা.)-কে ইসলামের ত্রাণ কর্তা বলা হয়।

রিদ্দা যুদ্ধের সমালোচনা

হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফত কালে ভন্ডনবি ও অন্যান্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সংঘটিত যুদ্ধকে অধিকাংশ ঐতিহাসিকগণ রিদ্দা বা স্বধর্মত্যাগীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। একমাত্র Cambridge Medieval History গ্রন্থের প্রণেতা উইলিয়াম বেকার এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁর মতে যারা বিদ্রোহী হয়েছিল তারা প্রকৃতপক্ষে কোনদিনই মনে প্রাণে ইসলাম গ্রহণ করেনি। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর বিরাট ব্যক্তিত্বের ভয়ে তারা শুধু মুখে ইসলামের কথা উচ্চারণ করেছিল। তারা ইসলামের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়নি। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধকে কোন ক্রমেই রিদ্দা যুদ্ধ বলা উচিত নয়। বেকারের এই মতবাদকে সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত বলে মনে হয় না কারণ:

১। স্বধর্মত্যাগীদের আন্দোলন যে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে প্রভাবিত করেছিল তার কোন প্রমাণ উইলিয়াম বেকার দিতে সমর্থ হননি।

২। যারা হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবদ্দশায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তারা বিদ্রোহীদের কোন লোভ লালসায় প্রভাবান্বিত হয়ে ইমানের পথ থেকে বিচ্যুত হননি।

৩। মুনাফিকদের জোর জবরদস্তির ফলে সাময়িকভাবে মদিনার সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। তারা কেন্দ্রীয় শাসনকে অস্বীকার করতে সাহসী ছিল না।

৪। তার আনুগত্য বর্জন করেছিলেন এমন কোনো নজির পাওয়া যায়নি।

৫। এ বিদ্রোহের সময় মক্কা নগরীসহ কতিপয় অঞ্চলে শান্তি বিরাজমান ছিল। ফলে এ সকল অঞ্চলের অধিবাসীগণ সন্তুষ্ট চিত্তে ইসলাম গ্রহণ ও মহানবির আনুগত্যে অবিচল ও অটুট ছিল।

ভন্ড নবি

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর নবুয়ত লাভের সাফল্য, বিশেষ ব্যক্তিত্ব ও সম্মান এবং প্রতিপত্তি লাভ প্রত্যক্ষ করে আরবের অনেক লোকের মনে নবুয়ত লাভের প্রেরণা তীব্রভাবে জেগে উঠে। জাগতিক-সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় তারা শুধু মৌখিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করে, তারা কখনো ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে মনেপ্রাণে মেনে নেয়নি।

মহানবি (সা.) এর জীবনেরশেষ দিকে আরবের বিভিন্ন অংশে কতিপয় ভন্ড নবির আবির্ভাব ঘটে। মহানবি(সা.) এর ওফাতের পর তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠে এবং ইসলামের ধ্বংস সাধনে লিপ্ত হয়। যে সমস্ত ধর্মত্যাগী মুসলমান নিজেদেরকে নবি বলে দাবি করেন তাদের মধ্যে ইয়ামেনের আনসী গোত্রের নেতা আসাদ আনসি, ইয়ামামার বনু হানিফা গোত্রের মুসায়লামা, বনু আসাদ গোত্রের তোলায়হা, বানু ইয়ারবু গোত্রের মহিলা সাজাহ ভন্ড নবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সংক্ষেপে ভন্ডনবিদের পরিচয় দেয়া হল :

আসাদ আনসি : ভন্ড নবিদের মধ্যে ইয়ামেনের আনসি গোত্রের নেতা আসাদ আনসি সর্বপ্রথম নবুয়ত দাবী করে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। রাসুল(সা.) এর জীবিতাবস্থায় হিজরি দশম সালে সে নবুয়তের দাবিদার হয়। সে ইয়ামেনে মুসলিম শাসন কর্তাকে বিতাড়িত ও হত্যা করে রাজধানী সানআ ও নাজরানে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। অতপর সে পার্শ্ববর্তী গোত্র প্রধানদের সহায়তায় একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে এবং সমগ্র দক্ষিণ আরব তার দখলিভুক্ত করে নেয়। মহানবি (সা.) এ বিদ্রোহ দমনের জন্য হযরত সা'দ বিন জাবালকে প্রেরণ করেন। কিন্তু ভন্ড নবি আসাদ মহানবি (সা.) এর মৃত্যুর দু-এক দিন পূর্বে ইয়ামেনের নিহত শাসন কর্তার এক আত্মীয় ফিরোজ দায়লামী কর্তৃক নিহত হয়। মহানবি (সা.) এর মৃত্যুর পর ইয়ামেনে পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) মুহাজির নেতৃত্বে বিদ্রোহীদের ধ্বংস করে দেন।

মুসায়লামা : মধ্য আরবের ইয়ামামার বনু হানিফা গোত্রের মুসায়লামা নিজেকে নবি বলে দাবি করে। স্বরচিত বাণীকে ঐশীবাণী বলে প্রচার করে নিজেকে নবি বলে প্রকাশ করে। সে মহানবি (স.) কে জানায় যে, ধর্ম প্রচারে ও আরব উপদ্বীপ শাসন কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সে তাঁর সমতুল্য। মহানবি (স.) তাকে ভন্ডামী, ধর্মদ্রোহীতা ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকার জন্যে নির্দেশ দেন। কেননা, সে প্রতিনিধি আগমনের বর্ষে মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ভন্ড মুসায়লামা মহানবি (স.) এর নির্দেশে কর্ণপাত করেনি। বরং পবিত্র কুরআনের বাণী নকল করে নিজস্ব পদ্ধতিতে নামাজ ব্যবস্থা চালু করে।

তোলায়হা : উত্তর আরবের বানু সাদ গোত্রের তোলায়হা নামক এক ব্যক্তিও নিজেকে নবি বলে দাবী করে। মদিনার বেদুইনদের সাথে ষড়যন্ত্র করে সে যাকাত বিরোধী এক আন্দোলন গড়ে তোলে। মহাবীর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) বুজাখার যুদ্ধে পরাজিত করেন। ফলে সে পালিয়ে গিয়ে সিরিয়ায় আত্মগোপন করে। খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) বানু সাদ গোত্রকে ক্ষমা করে দেন। এ সুযোগে তোলায়হা ফিরে আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে।

সাজাহ : প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) হযরত ইকরামা ও সুরাহবিল কে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। তারা এ যুদ্ধে মুসায়লামার বিরাট বাহিনীর কাছে পরাজিত হন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.) খালিদ বিন ওয়ালিদকে এ বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। এ সময় মধ্য আরবের বনু ইয়ারবু গোত্রের খ্রিষ্টান রমনী সাজাহ মুসায়লামার সাথে যোগদান করে তাকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। মহাবীর খালিদের সাথে ৬৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ইয়ামামার যুদ্ধে সে অসংখ্য অনুচরসহ নিহত হয়। এ যুদ্ধে মুসলমানদের বহু কুরআনে হাফিজ সাহাবি শাহাদাত বরণ করে।

মদিনা রক্ষার ব্যবস্থা

বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাবাহিনীকে বিভক্তকরণ : সমগ্র আরবে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়লে নব প্রতিষ্ঠিত শিশু ইসলামি সাম্রাজ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিভিন্ন স্থানে তারা বিদ্রোহ করে যাকাত আদায় বন্ধ, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের হত্যা প্রভৃতি নাশকতামূলক কার্যক্রম চালায়। কৃত্রিম ধর্ম প্রচারকদের প্ররোচনায় জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারাতে থাকেন। আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ এবং ভণ্ডনবিদের দ্বারা ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্র বিপন্ন হয়ে উঠে। তাদেরকে দমন করার উদ্দেশ্যে ও ভণ্ডনবিদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে হযরত আবু বকর (রা.) সেনাবাহিনীকে ১১টি ভাগে বিভক্ত করেন। প্রতিটি বিভাগে এক একজন সেনাপতি নিযুক্ত করেন। এরপর এক একটি দল আরবের বিভিন্ন অংশে পাঠান।

১. মহাবীর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে প্রথমে তোলায়হা ও পরে মালিক বিন নুবায়াবার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

২. হযরত ইকরামা বিন আবু জাহেল (রা.)-কে মুসায়লামাতুল কাযযাব এর বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। হযরত সুরাহবিল (রা.) হযরত ইকরামা (রা.) এর সাহায্যার্থে পরে যোগ দিয়েছিলেন।

৩. মোহাজির বিন আবি উমাইয়া (রা.)-কে আসাদ আনসি ও কায়েস ইবনে আসের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ইয়ামেন ও হাজরামাউত এ প্রেরণ করেন।

৪. খলিফা আবু বকর (রা.) আমর ইবনুল আসকে আরব ও সিরিয়া সীমান্তে ওয়াদীয়হ এবং হাবিসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন।

৫. খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) খালিদ ইবনে সাঈদকে স্থানীয় গোত্রসমূহ দমনে সিরিয়া পাঠান।

৬. খলিফা আবু বকর (রা) আলা ইবনে হাজরামীকে আল হাতাম ইবনে দাবিয়ার বিরুদ্ধে বাহরাইন প্রেরণ করেন।

৭. সুয়ায়দ ইবনে মাকরানকে খলিফা আবু বকর (রা.) ইয়ামেনের নিম্নাঞ্চলের বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করেন।

৮. হযরত আরফাজাহ ইবনে হাযছামাকে লাকিত ইবনে মারিক আল-আযদির বিরুদ্ধে মাহরায় প্রেরণ করা হয়।

৯. খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) হুযায়ফা ইবনে মুহসিনকে বনু সালাম ও হাওয়াজিন গোত্রদ্বয়ের দমন করার জন্যে প্রেরণ করেন।

১০. হযরত তুরাইফাকে খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) আরবের নিম্নাঞ্চল অভিযানে প্রেরণ করেন।

১১. খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) সুরাহবিল ইবনে হাসনাহকে ইয়ামামায় ইকরামার সাথে প্রেরণ করেন।

১২. মদিনাকে রক্ষা করার নিমিত্তে একটি বাহিনীকে খলিফা তার সঙ্গে রাখেন। মদিনা হতে প্রধান সেনাপতিরূপে তিনি বিদ্রোহ দমন অভিযান দক্ষতা ও দৃঢ়তার সাথে পরিচালনা করেন।

খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর বিজয় অভিযানসমূহ

পারস্য অভিযান :

রিদ্দা যুদ্ধের সময় পারস্যবাসীরা বাহরাইনের বিদ্রোহীদের উস্কানী ও সাহায্য অব্যাহত রেখেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামি সম্রাজ্যের মধ্যে সকল বিদ্রোহ দমন করে ইসলামি রাষ্ট্রের সীমানা বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করেন। পারস্য অভিযান ছিল এ ধরনের ঘটনারই ফসল। খলিফা ইসলামি সীমানা বৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিধান কল্পে পারস্য সীমান্তে বিদ্রোহ রোধ করার চিন্তা করেন। এজন্য ৬৩৩ খ্রিস্টাব্দে সেনাপতি হযরত মুসান্নার নেতৃত্বে ৮,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু খলিফা আবু বকর (রা.) এতে নিশ্চিত হতে না পেরে বিখ্যাত সেনাপতি মহাবীর হযরত খালিদের নেতৃত্বে আরও ১০,০০০ সৈন্যের একটি বাহিনী হযরত মুসান্নার সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ বাহিনী ইউফ্রেটিস নদীর উপকূলে অবস্থিত মুসান্না বাহিনীর সাথে মিলিত হন। সম্মিলিত বাহিনী ইসলামের নীতি মোতাবেক প্রথমে তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় এবং জিযিয়া দিতেও অস্বীকার করে। সম্মিলিত ইসলামি বাহিনী মুসান্না ও খালিদের নেতৃত্বে উবাল্লার হাফির নামক স্থানে পৌঁছলে পারস্য বাহিনী প্রধান হরমুজ তাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখে। এজন্য এ যুদ্ধকে শৃঙ্খলার যুদ্ধ (Battle of Chains) বলা হয়। অতপর হরমুজে মহাবীর খালিদের সঙ্গে সংঘটিত এক দ্বৈতযুদ্ধে নিহত হলে হরমুজ বাহিনী সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়।

মুসলিম বাহিনী এবার জনৈকা পারসিক রাজকুমারীর দ্বারা রক্ষিত একটি দুর্গ জয় করেন। পারসিক সেনাপতি বাহমান হযরত মুসান্না ও হযরত খালিদের নিকট পরাজয় বরণ করে। এ যুদ্ধটি ওয়ালাজারা যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। অপর একটি যুদ্ধে পারস্য বাহিনী মহাবীর খালিদ এর নিকট পরাজিত হয়। এ যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি হিরা দখল করেন। হিরার অধিবাসীগণ খলিফার বশ্যতা স্বীকার করে জিজিয়া প্রদানে সম্মত হয়। অঙ্গীকারে একটি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে। হিরা অধিকারের পর খালিদ উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে আনবার, অইনুত তামুর ও দুমায় মুসলিম আধিপত্য বিস্তার করেন।

সিরিয়া অভিযান :

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জীবিত থাকাবস্থায় রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার প্রেরিত দূতকে সম্মান করতেন। কিন্তু পরে তিনি মুসলিম রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত ও শংকিত হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করেন। মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর ওফাতের পর রোম সম্রাট সিরিয়ার আরব গোত্রগুলোকে বিদ্রোহের প্ররোচনা ও সাহায্য দান করে এবং তারা ইসলামকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র চালায়। খ্রিস্টান শাসনকর্তা সুরাহবিল মূতায় মুসলিম দূতকে হত্যা করে এতে মুসলিম রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয়। ফলে খলিফা আবু বকর (রা.) রোমানদের ব্যাপারে আশংকা বোধ করেন। হযরত আবু বকর (রা.) সাহাবিদের ডেকে একত্রিত করেন। পরামর্শের পর সিদ্ধান্ত মোতাবেক, হযরত আবু বকর সিরিয়ায় অভিযান প্রেরণ করেন।

হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামি বাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করেন। হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)-কে প্রথম অংশের নেতৃত্ব দিয়ে ফিলিস্তিনে যাওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত আবু ওবায়দা (রা.)-কে দ্বিতীয় অংশের নেতৃত্ব দিয়ে হেমসের দিকে প্রেরণ করেন। ইয়াজিদ ইবনে আবি সুফিয়ান (রা.) কে তৃতীয় অংশের নেতৃত্বে দিয়ে দামেস্কে প্রেরণ করেন এবং সুরাহবিল ইবনে হাসানাহ (রা.) কে চতুর্থ অংশের নেতৃত্বের নির্দেশ দিয়ে জর্দানের দিকে যাওয়ার আদেশ দেন।

হযরত আবু ওবায়দা (রা.) জাবিয়ায়, হযরত সুরাহবিল ইবনে হাসানা (রা.) বসরায় এবং হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) আরবায় সৈন্য বাহিনী নিয়ে উপনীত হন। হযরত আবু ওবায়দা (রা.) ছিলেন এ অভিযানের সর্বাধিনায়ক। খলিফা পরে হিরা থেকে মহাবীর খালিদ বিন ওয়ালিদকেও মুসলিম বাহিনীর সাথে যোগদানের নির্দেশ দেন। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের ভ্রাতা থিওডোরাসের নেতৃত্বে ২,৪০০০০ সৈন্যের এক শক্তিশালী বাহিনী গঠন করা হয়। এ বিশাল সৈন্য বাহিনীর মোকাবিলায় মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪০০০০০। আজানাদাইনের প্রান্তরে ৬৩০ খ্রিস্টাব্দে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে মুসলিম বাহিনীর নিকট থিওডোরাস পরাজিত হয়। সম্রাট হিরাক্লিয়াস এন্টিয়াকে পলায়ন করেন। ফলে সমগ্র প্যালেস্টাইন মুসলিম আধিপত্যে চলে আসে। অতঃপর মুসলিম বাহিনী দামেস্ক অবরোধ করে দক্ষিণ সিরিয়া দখল করেন।

হযরত আবু বকর (রা.) এর ইনতিকাল

৭ই জমাদিউস সানি, ১৩ হিজরি হযরত আবু বকর (রা.) জ্বরে আক্রান্ত হন। মৃত্যুপথের যাত্রী হযরত আবু বকর (রা.) জীবনের অন্তিম সময় উপস্থিত হয়েছেন মনে করে সাহাবায়ে কিরামগণের পরামর্শ নিলেন। অধিকাংশ সাহাবিগণ হযরত উমর (রা.)- কে খলিফা নির্বাচনের পক্ষে রায় প্রদান করেন। খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উসমান (রা.)- কে ডেকে হযরত উমরের খিলাফত সম্পর্কে একটি চুক্তিপত্র লেখালেন। ইসলামে খিলাফত সম্পর্কে এটাই প্রথম চুক্তিপত্র ছিল। জনসাধারণকে এ চুক্তিপত্র পড়ে শুনানো হয়। সবাই তা মেনে নিলেন। খলিফা হযরত উমর (রা.) কে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্যে অন্তিম অনুরোধ জানালেন।

আজনাদাইনের যুদ্ধে বিজয়ের সুসংবাদ পাওয়ার পর হিজরি ১৩ সালের ২১ জমাদিউস সানি সোমবার সন্ধ্যায় ৬৩ বছর বয়সে ইসলামের ত্রাণকর্তা হযরত আবু বকর (রা.) ইন্তিকাল করেন। হযরত উমর (রা.) জানাযায় ইমামতি করেন। হযরত আয়েশার হুজুরা মোবারকে রাসুলুল্লাহ (স.) এর পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়। তাঁর খিলাফত কাল ছিল দুই বছর তিন মাস নয় দিন মাত্র।

ইসলামের ত্রাণকর্তা হিসাবে হযরত আবু বকর (রা.)

হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের প্রথম খলিফা। তিনি এক সংকটময় মুহূর্তে খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকাল ছিল মাত্র দুই বছর তিন মাস নয় দিন। কিন্তু এ স্বল্প সময়ে তিনি ইসলামের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় এক অভাবনীয় পরিবর্তন করতে সক্ষম হন। তাঁর শাসনামলে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, ভন্ডনবিদের আবির্ভাব, যাকাত প্রদানে অস্বীকার, বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ সহ কঠিন সমস্যা দেখা দিয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-ই তখন একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি কঠোর হস্তে সকল প্রতিকূল অবস্থার মোকাবিলা করেন এবং ইসলামি শাসন ব্যবস্থার সুষ্ঠু ভিত্তি স্থাপন করেন। এ প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা.) বলেন, "এরূপ সংকটের দিনে হযরত আবু বকরের মতো খলিফা না থাকলে ইসলাম ও ইসলামি রাষ্ট্র কোনোটাই রক্ষা পেত না। ইসলাম ধর্ম ও সমাজ অনিবার্য ধ্বংসের কবলে পতিত হত।" তিনি খিলাফত লাভের পূর্বে এবং পরে ইসলামের খিদমতের জন্য যে অসামান্য অবদান রেখেছেন সে প্রেক্ষিতে তাঁকে ন্যায় সঙ্গতভাবে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা হয়।

সিদ্দিক উপাধি ও ইসলামের সেবক

খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) মহানবি (সা.) এর জীবন সহচর ছিলেন। নেতৃস্থানীয় ও বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি নিঃসংকোচে মিরাজ শরীফে বিশ্বাস স্থাপন করেন বলে মহানবি (স.) তাঁকে "সিদ্দিক"

উপাধিতে ভূষিত করেন। ইসলামের সেবায় তিনি সর্বস্ব বিলিয়ে দেন। তিনি অনেক ক্রীতদাসদাসীকে নিজ অর্থে ক্রয় করে মুক্তিদান করেন। মদিনায় মসজিদ নির্মাণ ও তাবুক যুদ্ধে তিনি প্রচুর অর্থ দান করেন। হযরত উমর (রা) বলেন, "আবু বকর (রা)-কে ইসলামের খিদমতের ব্যাপারে কেহই অতিক্রম করতে পারবে না।"

মহানবি এর (সা.) বিশ্বস্ত বন্ধু: হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন মহানবির বিশ্বস্ত বন্ধু। মহানবি (সা.) এর কঠিনতম মুহূর্তে তিনি তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন। হিজরতের মহাসংকট কালেও মহানবি (সা.) তাকে বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক, খায়বার, তাবুক প্রভৃতি যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) বলেছেন- 'যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম তা হলে আবু বকরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করতাম।' হযরত (সা.) তার উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন।

ইসলামের ধারক ও বাহক এ মহাপুরুষ জাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি দানকারী বেদুইন গোত্রগুলোকে ইসলামি বিধান অনুযায়ী কর প্রদানে বাধ্য করেন। খলিফা হওয়ার পর তিনি আরব উপদ্বীপ হতে সকল ভণ্ডামী এবং অনৈসলামিক কার্যক্রমের অবসান ঘটান। ইসলামের এ ঘোরতর দুঃসময়ে তিনি অত্যন্ত দৃঢ় ও কঠোর হস্তে সমস্ত বিদ্রোহ দমন করেন। মাওলানা মুহম্মদ আলী যথার্থই বলেছেন, "প্রতিকূল ঝড় সংকুল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামের তরীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।"

ভণ্ডনবিদের দমন ঃ ইসলামের ইতিহাসের মহা সংকটময় মুহূর্তে ও সমস্যা সংকুল সময়ে হযরত আবু বকর (রা) খিলাফতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ভণ্ডনবিদের আবির্ভাব, যাকাত বিরোধী আন্দোলন ও স্বধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ ইসলামী শিশু রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানে। ফলে ইসলাম পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। হযরত আবু বকর (রা) খিলাফত লাভের পর থেকেই অধিকাংশ সময় স্বধর্মত্যাগী বা রিদ্দার যুদ্ধে মনোনিবেশ করেন। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক হিট্টি বলেন, "হযরত আবু বকর (রা) এর স্বল্পকালীন খিলাফতের অধিকাংশ সময়ই তথাকথিত রিদ্দা যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ইয়ামামা ও অন্যান্য যুদ্ধে মহাবীর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ এবং কতিপয় ইতিহাস বিখ্যাত সমর নায়কগণ অভিযান চালান। ফলে ভণ্ডনবিগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং ইসলাম নিশ্চিত ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পায়। ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হয় এবং ইসলামি রাষ্ট্রে স্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

বেদুইনদের দমন ঃ হযরত আবু বকর (রা) এর খিলাফত কালে বেদুইনগণ ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র করলে তিনি কঠোরহস্তে বেদুইনদের ষড়যন্ত্র ও আক্রমণ দমন করে ইসলামকে বিপদমুক্ত করেন। তার নিকট থেকে তখন কিঞ্চিত পরিমাণ শৈথিল্য প্রদর্শিত হলে ইসলাম সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যেত।

বহির্বিশ্বে ইসলামের প্রসার ঃ খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর ঐকান্তিক ও নিরলস প্রচেষ্টায় ইসলাম ও ইসলামের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্প্রসারিত হয়। এখন শুধু আরবের ভিতরই ইসলাম নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন হয়নি। বহির্বিশ্বেও ইসলাম বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মোকাবেলা করে দ্রুতগতিতে সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়। হিট্টি বলেন, বিশ্বজয়ে বের হওয়ার পূর্বে আরববাসীদেরকে নিজেদের দেশকে জয় করতে হয়েছিল।

খলিফা হযরত আবু বকর (রা) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর ওফাতের পর হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামি রাষ্ট্রের প্রথম খলিফা নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত এক মহাপুরুষ।মহানবি(সা.)-এর উম্মতের মধ্যে তিনি হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে মদিনার শিশু রাষ্ট্রকে সংকটাপন্ন অবস্থা থেকে রক্ষা করেন। ইসলামের প্রতি তাঁর অবদান, অতুলনীয় ও চিরস্মরণীয়। নিম্নে তাঁর চরিত্র ও কৃতিত্ব সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হল :

বিশ্বনবি(সা.) এর পরেই তাঁর স্থান: তিনি ছিলেন মহানবি (সা.) -এর চারিত্রিক গুণাবলির বাস্তব প্রতিচ্ছবি। মহানবি(সা.) এর সকল গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। ইসলামের ইতিহাসের মহানবি(সা.) এর পরেই তার স্থান। উম্মাতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মর্যাদাবান ব্যক্তি ছিলেন তিনি। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) দৃঢ় ও কঠোর নেতৃত্বের ফলে মদিনার ইসলামি শিশু রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষা পায়। তাই তাকে ইসলামের "ত্রাণকর্তা" বলা হয়।

ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক: সর্ব প্রথম যে চারজন নারী ও পুরুষ ইসলাম গ্রহণ করেছেন হযরত আবু বকর (রা) তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথেই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্যে চেষ্টা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কুরাইশদের মধ্য থেকে বেশ কয়েকজন ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি চল্লিশ হাজার দিরহাম মহানবি(সা.)এর খেদমতে ও ইসলাম প্রচারে ব্যয় করেন। তিনি নগদ অর্থে মুশরিকদের নিকট থেকে মুসলিম কৃতদাস-দাসীদের ক্রয় করে স্বাধীন করে দেন। তাবুক যুদ্ধে সর্বস্ব এনে মহানবি (সা.) এর হাতে তুলে দেন। হযরত উমর (রা) বলেন– "হযরত আবু বকরকে ইসলামের খেদমতের ব্যাপারে কেউ অতিক্রম করতে পারবে না।"

সিদ্দিক উপাধি: ইসলামের ত্রাণকর্তা হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক। মহানবি (সা.) এর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল অকৃত্রিম ও অন্তহীন। রাসুল(সা.) তাঁকে সিদ্দিক বা সত্যবাদী উপাধীতে ভূষিত করেন। ইসলাম ও মহানবি হযরত মুহাম্মদ(সা.) এর জন্য পৌত্তলিকদের হস্তে তিনি প্রহৃত হন। হিজরতের সময়ে তিনি রাসুল(সা.) এর সঙ্গী হিসেবে মদিনায় হিজরত করেন।

অগাধ পান্ডিত্যের অধিকারী: খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন মহানবি (সা.) এর অন্তরঙ্গ বন্ধু সুখ-দুঃখের সাথী। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান। যে কোন সমস্যা অনুধাবনে ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে ছিলেন অতুলনীয় বক্তৃতা-ভাষণে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বংশ ধারাবাহিকতা জ্ঞানে তিনি ছিলেন আরবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। স্বপ্ন ব্যাখ্যায় আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ইসলামি জ্ঞানে তাঁর মর্যাদা ছিল সকলের উর্ধ্বে।

তাকওয়ার মূর্ত প্রতীক: হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন মহানবি হযরত মুহাম্মদ(সা.) এর চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ এবং এবাদত ও তাকওয়ার মূর্ত প্রতীক। তিনি কখনো কখনো নামাযে সারারাত কাটিয়ে দিতেন। অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন। একাগ্রচিত্তে নামায আদায় করতেন। তাঁকে নামাযরত অবস্থায় দেখলে প্রাণহীন কাষ্ঠ দন্ডের মতো মনে হত। কুরআন শরিফ তিলাওয়াতের সময় অনিচ্ছাকৃত ভাবে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত। তিনি অস্ফুট স্বরে এমনভাবে ফুঁপিয়ে কাঁদিতেন যে, আশেপাশে মানুষ জড়ো হয়ে যেত। এ কারণে তাকে "আওয়াহুম মুনীব" নামে আখ্যায়িত করা হতো।

ইসলামের ধারক এবং বাহক: ইসলামের ধারক এবং বাহক হিসেবে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) ধর্মীয় অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন। কোন প্রকার ভীতি, বিদ্বেষভাব ও বিরুদ্ধাচরণ তাঁকে কর্তব্যচ্যুত করতে পারেনি। তিনি ইসলামের পূর্ণ অনুসারী বিধায় মহানবি (সা.) এর অন্তিমকালে তাঁকে ইমামতি করার আদেশ দেন। খলিফা নির্বাচিত হয়ে তিনি আরব ভূখণ্ড থেকে বিদ্রোহ ও ভন্ডনবিদের কঠোর হস্তে দমন করেন। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর স্বহস্তে মদিনা রক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী বেদুইন গোত্রদের বিরুদ্ধে তিনি অভিযান প্রেরণ করে তাদেরকে পরাজিত করেন। তারা ইসলামি বিধান অনুযায়ী কর দিতে বাধ্য হয় ইসলামের প্রথম খলিফা হিসেবে তিনি আরব ভূ-খন্ড থেকে দুর্নীতি, প্রতারণা, ভন্ডামী এবং অনৈসলামিক কার্যকলাপ ধ্বংস করে ইসলামের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। মৌলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, 'প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্য দিয়ে ইসলামের তরীকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়ার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।'

সফল রাষ্ট্র নায়ক : প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) খিলাফত লাভ করার পরই আরব উপদ্বীপের মধ্যে বিশৃঙ্খলা, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ, অন্তর্বিপ্লব, হিংসা, বিদ্বেষ প্রভৃতি মহামারী আকার ধারণ করেছিল। তিনি তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বলে অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিধান করেন। নব প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রকে বহিশত্রু থেকে রক্ষা করেন এবং ঐক্য ও ধর্মপ্রীতি বজায় রাখতে সক্ষম হন।

এখানেই হযরত আবু বকর (রা.) রাষ্ট্র সংগঠক হিসেবে অসামান্য কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। কেন্দ্রীয় শাসন গোত্র শাসনের উর্ধ্বে স্থান দান করেন ফলে সমগ্র আরব গোত্র কেন্দ্রীয় শাসনের অধীন হয়ে যায়। খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) বিশ্ব জয়ের পূর্বে আরব দেশ ও আরববাসীদের প্রথম জয় করেছিলেন। কারণ, সুসংগঠিত রাষ্ট্র ব্যতীত পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্য জয় করা সম্ভব নয়। হযরত উমর (রা.) এর খিলাফত কালে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ও ইসলামি রাষ্ট্রের সম্প্রসারণ হযরত আবু বকর (রা.) এর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা এবং বলিষ্ঠ সামরিক ব্যবস্থার জন্যই সম্ভব পর হয়।

গণতন্ত্রের অনুসারী : রাষ্ট্রীয় কার্য-নির্বাহে খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) গণতন্ত্রের অনুসারী ছিলেন। তিনি রাষ্ট্র নায়ক এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করতেন না। খলিফা নির্বাচিত হয়ে তিনি যে যুগান্তকারী ভাষণ প্রদান করেন তা তাঁর গণতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ আস্থারই বহিঃপ্রকাশ। তিনি মসলিস আস-শুরা বা মন্ত্রণা পরিষদ গঠন করে কুরআন ও সুন্নাহর বিধান মোতাবিক রাষ্ট্র পরিচালনা করতেন। তিনি জনগণকে পূর্ণ স্বাধীনতার ও সমঅধিকার দান করে প্রকৃত গণতান্ত্রিক সরকারের গোড়াপত্তন করেন।

মহানবি (সা.) -এর উপযুক্ত প্রতিনিধি : মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) -এর তিরোধানের পর ইসলামি রাষ্ট্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন তাঁর সম্পূরক। তিনি বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট মুসলিম জাহানকে সঠিক পথ প্রদর্শনে সমর্থ হন। আরব বিশ্বের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিদ্রোহ, অরাজকতার অবসান ঘটাতে সক্ষম হন।মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধি হিসেবে যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হন। হযরত আলী (রা.) বলেন, "রাসুলে কারীমের পর আবু বকর শ্রেষ্ঠ মুসলমান ছিলেন।"

আল কুরআন সংকলন : আল কুরআন বর্তমানে যেভাবে বিন্যস্ত রয়েছে এভাবে মহানবি (সা.) এর যুগে বিন্যস্ত ছিল না। তখন হাফিজদের বক্ষে বিন্যস্তভাবে রক্ষিত ছিল। লিখিত অবস্থায় বিচ্ছিন্ন পত্রে লিপিবন্ধ ছিল। ইয়ামামার যুদ্ধে যখন বহু সংখ্যক হাফিজে কুরআন শাহাদাত বরণ করেন তখন হযরত উমর (রা.) এর পরামর্শে বিভিন্ন পত্রকে মহানবি (সা.) এর বিন্যাসে অনুযায়ী গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হযরত জায়েদ বিন সাবিত (রা.) যিনি মহানবি (সা.) এর সময় কাতিবি ওহি ছিলেন-এ কাজের দায়িত্ব নিলেন, তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এ বিক্ষিপ্ত পত্রগুলোকে একত্র করে কুরআন মাজিদকে সঠিকভাবে গ্রন্থাকারে সংকলন করেন। এজন্য প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) কুরআন সংকলনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

মহানবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও ইসলামের প্রতি হযরত আবু বকর (রা.) এর অক্লান্ত সেবা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও অন্যান্য অবদানের কথা বিবেচনা করে তাঁকে ন্যায়সঙ্গতভাবে 'ইসলামের ত্রাণকর্তা' বলা হয়।

দীন-দুঃখীর বন্ধু : হযরত আবু বকর (রা.) দীন-দুঃখীর দুর্দশা দূর করার জন্য সর্বপ্রথম 'বায়তুলমাল' প্রতিষ্ঠা করনে। তিনি রাত্রির অন্ধকারে গোপনে গোপনে খাদ্যসামগ্রী বহন করে নিয়ে গিয়ে গরীব ও অনাথদের দূরবস্থা ও অভাব মোচন করতেন। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, "তিনি তাঁর শিক্ষাদাতা মহাপুরুষের ন্যায় আচার ব্যবহারে অত্যন্ত আড়ম্বরহীন ছিলেন। তিনি বিনীত অথচ দৃঢ় ছিলেন এবং নতুন রাষ্ট্রের শাসনকার্যে এবং জ্ঞান সাধনের উপকারার্থে তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন।

প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসন ব্যবস্থা

রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা : বর্তমান যুগে সর্বাধিক উন্নত ও মার্জিত রাষ্ট্রীয় নীতি হল গণতন্ত্র। তবে আসল ব্যাপার এই যে, পবিত্র কুরআন, হাদিস ও খুলাফায় রাশেদিনের কার্যক্রম দ্বারা যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সন্ধান পাওয়া যায়, প্রকৃত বিচারে সেটা বর্তমান গণতন্ত্র নয়, স্বৈরতন্ত্র নয়, ধর্মতন্ত্র নয়, আবার ব্যক্তিতন্ত্রও নয়; বরং তা সকল ধরনের রাষ্ট্রচিন্তার একটি সমন্বিত রূপ। হযরত আবু বকরের (রা.) সামনে যখন কোন বিষয় উপস্থিত হত; তখন তিনি সর্বপ্রথম তার সমাধান পবিত্র কুরআনে অনুসন্ধান করতেন। পবিত্র কুরআনে না পেলে হাদিসে খোঁজ করতেন। যদি হাদিসেও না পাওয়া যেত তা হলে তিনি বিশেষ সভা আহ্বান করতেন।

মজলিসে শূরা : সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা জ্ঞানী ও রাজনীতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.) তাঁদের পরামর্শ সভায় পরামর্শদাতা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থিত হতো তখন তিনি মজলিশে শূরায় তাদের পরামর্শ নিতেন।

রাষ্ট্রীয় নীতি : দু'বছর তিন মাসের শাসনামলে খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামি রাষ্ট্রকে দৃঢ় করতে যথাযথ রাষ্ট্রনীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মোটেই অমনোযোগী ছিলেন না। তিনি সাম্রাজ্যকে বিভিন্ন প্রদেশ ও জেলায় বিভক্ত করেন এবং পৃথক পৃথক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

রাষ্ট্রীয় পদে নির্বাচন : যোগ্য ব্যক্তিকে সঠিক পদে নিয়োগ করার উপর রাষ্ট্রের উত্তম ব্যবস্থাপনা নির্ভর করে। আর সেই ব্যক্তিই যোগ্য, যিনি লোকদের চারিত্রিক গুণাবলি সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। সেই দূরদর্শী আবু বকর (রা.) এসব গুণাবলির অধিকারী ছিলেন।

নির্বাচনের ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রা.) এর মূলনীতি

হযরত আবু বকর (রা.) এর মূল নীতিগুলো নিম্নরূপ

ব্যক্তি নির্বাচন : হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর যুগে যে ব্যক্তি যে পদে নিয়োজিত ছিলেন, হযরত আবু বকর (রা.) তাকে সেই পদেই বহাল রাখেন। কোন কাজের জন্য হযরত আবু বকর (রা.) ঐ ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে নির্বাচন করতেন যিনি রাসুলুল্লাহ(সা.)এর পবিত্র সাহচর্য থেকে অধিক জ্ঞান আহরণের সুযোগ পেয়েছেন।

স্বজনপ্রীতি থেকে দূরে থাকা : সঠিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির পৃষ্ঠপোষকতা থেকে দূরে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। হযরত আবু বকর (রা.) এ নীতি কঠোরভাবে পালন করতেন। তিনি তাঁর প্রশাসকদেরকেও এই ব্যাপারে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিতেন।

প্রশাসকদের মনঃতুষ্টি ও মর্যাদার দিকে লক্ষ রাখা : একটি রাষ্ট্রে শিষ্টাচার ও সুশাসনের সবচেয়ে বড় কথা হলো সেখানকার প্রশাসকদের সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণভাবে রক্ষা করা এবং তাদের সাথে স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবহার না করা। হযরত আবু বকর এ দুটি বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। তাছাড়া তিনি শাসনকর্তা নিয়োগকালে তাঁদের তীক্ষ্ম প্রতিভার দিকটি বিবেচনা করতেন।

নির্বাচন সতকর্তা : যেসব লোক কোনো কারণে একবার নির্ভরশীলতা হারিয়েছে আবু বকর (রা.) তাদেরকে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়ার পরও কোন দায়িত্বশীল পদ প্রদান করতে সংকোচ বোধ করতেন। সততা, অকপটতা এবং ইমানের দৃঢ়তা ইত্যাদিতে তাদের পূর্ণাজ্ঞা বিশ্বাসের কোনরূপ দূর্বলতা থাকলে খলিফা তাদের নির্বাচনে সতর্ক থাকতেন।

পরীক্ষামূলক নিয়োগ : বর্তমান যুগের সাধারণ নিয়মানুযায়ী যতক্ষণ পর্যন্ত কারো দক্ষতা ও উত্তর কার্যাবলি সম্পর্কে বিশ্বাস না জন্মে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সংশ্লিষ্ট পদে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ করা হয়। স্থায়ী পদোন্নতির জন্য শর্ত হল উত্তম কার্যাবলি। হযরত আবু বকর (রা.) এসব নিয়মাবলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করতেন।

পদচ্যুতি : নিয়োগের পর কেউ অযোগ্য বলে প্রমাণিত হলে আবু বকর (রা.) তাকে বিনা দ্বিধায় পদচ্যুত করতেন। এজন্য একবার হযরত খালিদ ইবন সাউদকে পদচ্যুত করা হয়।

বাইতুল মাল : রাসূলুল্লাহ (সা.) -এর যুগেই বাইতুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রতিষ্ঠা ও এর কার্যক্রম শুরু হয়। হযরত আবু বকর (রা.) এর সকল ব্যবস্থাপনা হযরত আবু ওবায়দার (রা.) ওপর ন্যস্ত করেন। তিনি বাইতুল মালের আমাদানি ও ব্যয়ের হিসাব রাখতেন এবং রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

ফাতাওয়া বিভাগ : ইফতা অর্থাৎ শরীয়তের আহকাম প্রচার ও ফাতাওয়া প্রদানের জন্য তাকওয়া ছাড়াও ফিকহী জ্ঞানের প্রয়োজন। আর এটা এমন একটা সম্পদ যা শুধু আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছে প্রদান করেন। আবু বকর (রা.)-এর ফাতাওয়া বিভাগে যাঁদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল তাঁদের নাম হল– হযরত আলী (রা.), হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা.), হযরত উবাই ইবনে কাব (রা.), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)।

পুলিশ বিভাগ : তখনকার দিনে দৈনন্দিন নাগরিক জীবনে শৃঙ্খলা বিধানের জন্যে পুলিশ বিভাগের মতো পৃথক কোন বিভাগ ছিল না এবং প্রকৃতপক্ষে এর বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবুও উপস্থিত চাহিদা মেটানোর জন্য কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তিকে এই কাজে নিয়োগ করা হয়।

হযরত আবু বকর (রা.)-এর ভাতা : প্রথমত তিনি সরকারি কোষাগার থেকে নিজে কোন ভাতা গ্রহণ করতেন না। ব্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। পরে ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকলে শাসনতান্ত্রিক কাজ বিঘ্ন হওয়ার আশংকায় মজলিসে শূরার পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ভাতা গ্রহণ করতেন। অবশ্য মৃত্যুর পূর্বে তিনি তা ফেরত দিয়ে গেছেন।

অর্থ ব্যবস্থা : হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর সংক্ষিপ্ত খিলাফতের সময় প্রধানত আরব উপদ্বীপের অভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব, জাতীয় ঐক্য এবং বাইরের আক্রমণ হতে এর নিরাপত্তা বিধানে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় সে কার্যপদ্ধতি ও সরলতা পাওয়া যায়, যা রাসূলুল্লাহ (স.) -এর পবিত্র যুগে ছিল। অতএব হযরত আবু বকর (রা.) এর যুগের অর্থ ব্যবস্থা জানতে হলে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স.) এর যুগের অর্থ ব্যবস্থা জানতে হবে।

সেনা বিভাগ: রাসুলুল্লাহ (সা.) এর সময় নিয়মতান্ত্রিক কোনো সেনাবিভাগ ছিল না। সমস্ত সাহাবা ইসলামি মুজাহিদ ছিলেন। যখন আবশ্যক হতো সাহাবিগণ নিজেরাই ইসলামি ঝান্ডার নীচে সমবেত হতেন। খলিফার যামানায় ও সেই অবস্থা ছিল– যখন প্রয়োজন হতো মুসলমানগণ বীরত্বের সজ্ঞে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতেন। তবে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে যেতে হত, তখন সেনাবাহিনীকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন কর্মকর্তা ঠিক করে দিতেন। সমগ্র সেনাবাহিনীর জন্য একজন সিপাহসালার নিযুক্ত করতেন।

হযরত আবু বকর (রা.) এর সময়ে গণিমাতের সম্পদের নির্দিষ্ট একটি অংশ প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য নির্ধারিত ছিল। খলিফা নিজে সেনাবাহিনীর দেখাশুনা করতেন। ত্রুটি সংশোধন করতেন এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্ব, একতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা শিক্ষা দিতেন।

অমুসলিম নাগরিকদের সাথে আচরণ : বিধর্মী ও জিম্মীদের সজ্ঞে সদয় ব্যবহার করার জন্য খলিফা পরামর্শ দিতেন। এ সময় জিযিয়ার পরিমাণও ছিল সামান্য, বহু সংখ্যক জিম্মি জিযিয়ামুক্ত ছিল। অমুসলিমগণ নিজ ধর্ম ও নাগরিক স্বাধীনতা পূর্ণভাবে ভোগ করত ও তাদের জান মালের পুর্ণ নিরাপত্তা ছিল।

ইসলামের প্রচার

ইসলামের প্রচার-প্রসারে নায়েবে রাসুলের পদমর্যাদায় থাকায় হযরত আবু বকর (রা.) এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল, ইসলামের তাবলীগ তথা প্রচার ও প্রসার। এই উত্তম কাজে তিনি ইসলামের সূচনা পর্ব থেকে আমৃত্যু জড়িত ছিলেন। রোমান ও ইরানীদের মোকাবেলায় যে সমস্ত সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছিল তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল, সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত দেওয়া। যেমন– হযরত মাছনার চেষ্টায় ইরাকের বনী ওয়ালের সমস্ত মূর্তিপূজক এবং খ্রিস্টান মুসলমান হয়েছিল। হযরত খালিদ (রা.) এর দাওয়াতে ইরাকী-আরবের অধিকাংশ গোত্র মুসলমান হয়েছিল।

নবি পরিবারের সাথে ব্যবহার

নবি করিম (সা.) এর আত্মীয় স্বজনদের সাথে সুন্দর ব্যবহার, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ঋণ পরিশোধ, ওয়াদা পূরণ করা খিলাফতের দায়িত্বের অন্তর্গত ছিল। প্রথম খলিফা আবু বকর (রা.) সর্বপ্রথম এই দায়িত্ব আদায় করেন। তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর স্ত্রীগণের সুখ শান্তি ও সুবিধার প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখতেন।

তিনি রাসুলুল্লাহ (স.) এর আত্মীয়দের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখতেন। তিনি তাঁর শাসনামলে হযরত আলী (রা.) কে বলেছিলেন "নিশ্চয়ই আমাদের আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহার করার চেয়ে রাসুলুল্লাহ (স.) এর আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করবো, এটি উত্তম।" (বোখারী)

চরিত্র

হযরত আবু বকর (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রিয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। সঠিক সিদ্ধান্ত ও সমস্যা অনুধাবনে তিনি ছিলেন অনন্য। তিনি যে সমস্যায় যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাই গৃহীত হয়েছে। তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানে ছিলেন অতুলনীয়। বক্তৃতা-ভাষনে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বংশজ্ঞানে পন্ডিত, স্বপ্ন ব্যাখ্যায় আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী ইসলামি জ্ঞানে তাঁর মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চ। তিনি ছিলেন বিচক্ষণতায় ও গাম্ভীর্যে আকর্ষণীয় অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং একজন কুশলী রাষ্ট্রনায়ক।

হযরত আবু বকর (রা.) জন্মগতভাবে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সততা, সাধুতা, পবিত্রতা, দয়া, সত্যবাদিতা, আমানতদারী ইত্যাদি তার উল্লেখযোগ্য গুণাবলি ছিল। অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত রুচিসম্পন্ন ও অতিথিপরায়ণ ছিলেন তিনি। ভোগবিলাস ও জাঁকজমক তাঁর নিকট ছিল অপছন্দনীয়।

হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন নবি চরিত্রের পূর্ণ প্রতিবিম্ব। এবাদত, ধার্মিকতা, খোদাভীতি ও পুণ্যের এক মূর্ত প্রতীক ছিলেন তিনি। তাঁর এবাদতের অবস্থা ছিল এই যে, তিনি সারারাত নামায পড়ে কাটাতেন। দিনে অধিকাংশ সময় রোযা রাখতেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সাথে প্রীতি ও সদ্ভাব রাখতেন। তাঁর চাল-চলন ছিল সাদাসিধে, মোটা কাপড় ব্যবহার করতেন। বাহ্যিক কোন জাকজমক ছিল না। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি খুবই সম্পদশালী ছিলেন, কিন্তু পরে সমস্ত সম্পদ ইসলামের খেদমতে বিলিয়ে দেন। এজন্য কোনো সময় দরিদ্রতার কারণে দুই তিন দিনও তাঁকে অনাহারে থাকতে হতো। তাঁর এমনও সময় এসেছে যে, গায়ের জামা ও পরনের কাপড় ছিল না। একটি কম্বল, বোতাম ও ঘুন্টি ছাড়া কাঁটা দিয়ে আটকিয়ে পরতেন।

মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, নবিগণের পর সমস্ত বনী আদম-এর মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন সর্বোত্তম। রাসুল (সা.) বলেছেন, আমি প্রত্যেকের উপকারের প্রতিদান দুনিয়াতেই পরিশোধ করে দিয়েছি, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) এর উপকারসমূহ আমার উপর রয়ে গিয়েছে, তাঁর প্রতিদান আল্লাহ তায়লা পরকালে দিবেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত উমর (রা.) ৬৩৪-৬৪৪ খ্রিস্টাব্দ)

প্রাথমিক জীবন : খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত কুরাইশ বংশের আদী গোত্রের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার ডাক নাম ছিল আবু হাফস। উপাধি ছিল ফারুক। পিতার নাম খাত্তাব এবং মায়ের নাম হাতামা। বংশধারা উর্ধ্বতন নবম পুরুষ কাব পর্যন্ত গিয়ে মুহাম্মাদ (সা.) এর বংশের সাথে মিশেছে। তাঁর গোত্রবর্ণ ছিল ঈষৎ রক্তিম, মাথা ভাঁজ বিশিষ্ট, গাল স্বল্প মাংসল, দাড়ি ঘন, দেহ দীর্ঘকায় ছিল। বাল্যকাল হতেই তিনি সুঠাম দেহের অধিকারী ছিরেন। শক্তিশালী, তেজস্বী এবং কুস্তিগীর হিসেবে তিনি যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। প্রাচীন আরব ঐতিহাসিক বালাজুরীর বর্ণনা মতে, মহানবি (সা.) - এর আবির্ভাবের প্রাককালে কুরাইশ বংশের মাত্র সতেরজন শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে হযরত উমর (রা.) ছিলেন অন্যতম। তিনি একজন খ্যাতনামা বক্তা ও কবি ছিলেন। পেশাগতভাবে ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া ও পারস্য ভ্রমণ করে বহু খ্যাতিসম্পন্ন লোকের সংস্পর্শে আসেন। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতা ও চিন্তা ধারা সম্প্রসারিত হয়।

ইসলাম গ্রহণ : প্রথম দিকে হযরত উমর (রা.) ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং কুরাইশ বংশের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে নবদীক্ষিত মুসলমানদের নির্যাতন করতেন। এমন কি একদা তিনি রাসুলুল্লাহ (সা.) কে বধ করতে উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারে ভগ্নি ফাতিমা এবং ভগ্নিপতি ইসলাম গ্রহণ করে। ইসলামে দীক্ষিত তাঁর ভগ্নি ফাতিমার কণ্ঠে কুরআনের সুমিষ্ট আয়াত শ্রবণ করে তিনি বিগলিত হয়ে যান। অতঃপর তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রাসুলুল্লাহ (সা.) এর কাছে উপনীত হয়ে

ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা.) প্রথম ব্যক্তি যিনি মক্কার বিধর্মীদেরকে একত্রিত করে তাঁর ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এবং মহানবি (সা.) কর্তৃক 'ফারুক' বা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী উপাধি লাভ করেন। নবুয়তের সপ্তম বছরে হযরত উমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ইসলামের চরম শত্রু পরম ভক্তে 'পরিণত হওয়ার ফলে ইসলামের শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়।

খিলাফত গ্রহণের পূর্বে ইসলামের সেবা : হযরত উমর (রা.) এর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা প্রকাশে ধর্মপ্রচার শুরু (সা.) করেন। তিনি নিজেও ইসলাম প্রচারে যোগ দেন এবং তাঁর প্রভাবে অনেক গোত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। রাসুলুল্লাহ মদিনায় হিজরতের পূর্বে তিনি বিশজন হিজরতকারীর একটি দল নিয়ে মদিনায় গমন করেন। তিনি সর্বপ্রথম আযান ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন এবং পরবর্তীকালে তা ঐশীবাণী দ্বারা অনুমোদিত হয়। তিনি মদিনায় হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সুখ-দুঃখ ও সমস্যাবলীর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। বদর, উহুদ, খন্দক, হুনাইন, খাইবার প্রভৃতি যুদ্ধগুলিতে যোগদান করে তিনি অসাধারণ বীরত্ব, যোগ্যতা ও দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন। খন্দকের যুদ্ধে মক্কাবাসীদের আক্রমণের প্রতিরোধে তিনি যে অপূর্ব সমরকুশলতার পরিচয় দেন এর স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁর নামানুসারে তথায় একটি মসজিদ নির্মিত হয়। হুদায়বিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। ইসলামের স্বার্থের প্রতি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলে তিনি এই চুক্তির বিরোধীতা করেছিলেন। কেননা আপাতদৃষ্টিতে এ সন্ধি ন্যাক্করজনক বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। কিন্তু মহানবি (সা.) এ সন্ধি অন্তর্নিহিত সারবত্তার কথা বুঝালে তিনি এতে সম্মত হন। মক্কা বিজয়ের সময় তিনি কুরাইশ নেতা আবু সুফয়ানকে বন্দী করেছিলেন। তাবুক অভিযানে তার শ্রমলব্ধ সম্পদের অর্ধাংশ যুদ্ধ তহবিলে দান করেন। এছাড়া তিনি তাঁর খাইবার অঞ্চলে বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তিও ইসলামের সেবায় উৎসর্গ করেছেন। আল্লাহর রাসুলের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা ছিল। তাঁর মৃত্যুতে তিনি পাগলের ন্যায় বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। প্রথম খলিফা মনোনয়নের সময় যে বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা দূরীকরণে হযরত উমর (রা.) এর যথেষ্ট অবদান ছিল। তিনি প্রথম খলিফা হিসেবে হযরত আবু বকর (রা.) এর নাম প্রস্তাব করে তাঁর প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি তাঁর প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে উদ্ভুত বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানে সাহায্য করেন। তিনি বিচারকের দায়িত্ব ও পালন করেন।

খিলাফত লাভ : ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) জীবদ্দশায় তাঁর উত্তরাধিকারী ইসলামি রাষ্ট্রের পরবর্তী খলিফা মনোনীত করে যাবার জন্য অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠলেন। পূর্ব ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে এর জন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে খিলাফতের একটি মীমাংসা করে যেতে চাইলেন। অতীতের অভিজ্ঞতা হতে তিনি হযরত উমর (রা.) কে খিলাফতের গুরুদায়িত্বের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করতেন। কেননা কঠোরতা, ন্যায়নিষ্ঠাও জাগতিক কর্তব্য সম্বন্ধে হযরত উমর (রা.) সাহাবাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তবু তার নির্বাচনের স্বপক্ষে জনমত যাচাই করার জন্য অন্যান্য সাহাবাদের পরামর্শ নিতে চাইলেন। সর্বপ্রথম তিনি হযরত আবদুর রহমান বিন আউফের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। হযরত আবদুর রহমান (রা.) বললেন, হযরত উমরের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই তবে তাঁর স্বভাব বড় কঠোর প্রকৃতির। এর উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, তাঁর নিজের উপর দায়িত্ব আসলে আপনা হতেই তিনি উদার হয়ে উঠবেন। এরপর তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। হযরত উসমান (রা.) হযরত উমরের পক্ষে মত ব্যক্ত করলেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.)

অন্যান্য আনসার ও মুহাজিরদের মতামত নিলেন। তাঁরা সকলেই হযরত উমর (রা.)-এর মনোনয়নকে সমর্থন করেন। হযরত তালহা (রা.) মনোনয়নের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বললেন যে, তাঁর মতে হযরত উমর (রা.) সাহাবিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।' এরপর তিনি হযরত উসমান (রা.)- কে ডেকে এনে হযরত উমরের (রা.) এর পক্ষে একটি মনোনয়ন পত্র লিখে নিলেন। মনোয়নপত্র সম্পাদনের পর হযরত আবু বকর (রা.) উপস্থিত জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, 'ভাইসব! আমি আমার কোনো আত্মীয়-স্বজনকে খলিফা মনোনীত করিনি; বরং হযরত উমর (রা.)-কে মনোনীত করেছি যাতে আপনারা এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট হন।' এ কথা শুনে উপস্থিত জনতা সমবেত কণ্ঠে বলে ওঠল, 'আমরা আপনার কথা শুনলাম এবং মনোনয়ন মেনে নিলাম।' অতঃপর খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর ইন্তেকালের পর ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে হযরত উমর (রা.) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফারূপে খিলাফতে অধিষ্ঠিত হন।

হযরত উমর (রা.) এর রাজ্য বিস্তার

খিলাফত লাভের পরপরই হযরত উমর (রা.) তাঁর পূর্ববর্তী খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর সীমান্ত নীতি অনুসরণ করেন। ফলে মাত্র দশ বছরের মধ্যে ক্ষুদ্র আরব উপদ্বীপকে উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণ করে তিনি তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি পারস্য ও বায়জান্টাইন সাম্রাজ্য মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এ সময়ে বিস্ময়কর ও দুঃসাহসিক সামরিক অভিযানগুলি সম্পর্কে অধ্যাপক পি. কে হিট্টি বলেন, 'খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আমর বিন আল-আসের ইরাক, পারস্য ও মিসর অভিযানগুলি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সামরিক অভিযানসমূহের অন্যতম এবং এগুলি নেপোলিয়ন, হ্যানিবল ও আলেকজান্ডারের পরিচালিত যুদ্ধগুলির সাথে তুলনীয়।'

পারস্য বিজয়

আরবের পূর্বদিকে পারস্য সাম্রাজ্য অবস্থিত। ইরাক (মেসোপটেমিয়া) হতে আমুদরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বর্তমান ইরান নিয়ে পারস্য সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-এর শাসনামলে ইরাক ও সিরিয়ার বিরুদ্ধে মুসলিম অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। মুসলমানরা যখন যুদ্ধরত তখন খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) ইন্তেকাল করেন। নতুন খলিফা হযরত উমর (রা.) এ সকল অভিযানের সাফল্যজনক পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্য বিশেষভাবে তৎপর হন।

পারস্য বিজয়ের কারণ

হযরত উমর (রা.) এর শাসনকালে কতিপয় কারণে পারস্যবাসির সাথে মুসলমানদের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এ সংঘর্ষের গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

প্রথমত: মুসলমানদের কোন প্রকার উন্নতি এবং ইসলামের সমৃদ্ধি পারস্যবাসি কোনোভাবেই সহ্য করতে পারত না এবং সর্বপ্রকারে তাঁদের ধ্বংস সাধনের চেষ্টায় লিপ্ত ছিল।

দ্বিতীয়ত: মহানবি (সা.) কর্তৃক প্রেরিত মুসলিম দূতকে অপমানিত করায় পারস্য সম্রাট দ্বিতীয় খসরু পারভেজ মুসলমানদের বিরাগভাজন হন। এভাবে আন্তর্জাতিক নীতির অবমাননা করায় এর প্রতিশোধ ব্যবস্থাস্বরূপ পারস্য বিজয় মুসলমানদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত: রিদ্দা যুদ্ধের সময় বাহরাইনে যখন বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তখন পারস্যবাসী বিদ্রোহীদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য প্রদান করেন। পারস্যবাসীদের বিদ্বেষপূর্ণ ও শত্রুতামূলক আচরণের জন্য তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মুসলমানগণ বাধ্য হন। এ হতে বুঝা যায় যে, খলিফা উমর (রা.) সাম্রাজ্যবাদী নীতি দ্বারা পারস্য বিজয়ে উদ্বুদ্ধ হননি, পারস্যবাসীর শত্রুতা তাঁকে অস্ত্রধারণে বাধ্য করেছিল।

চতুর্থত: ইরাকের উপর দিয়ে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীদ্বয় প্রবাহিত হওয়ার ফলে এটা অত্যন্ত উর্বর এবং সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়। ইরাকের সাথে আরববাসীদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কিন্তু পারস্যবাসাসীরা আরব মুসলিম বণিকদের অব্যাহতভাবে তাদের দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে দিতে রাজি ছিল না। সুতরাং অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও আরবগণ পারস্য বিজয়ে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

পঞ্চমত : ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে পারস্য সাম্রাজ্যের ইরাক প্রদেশ ছিল আরব ভূখণ্ডের সংলগ্ন। এজন্য আরববাসীর সাথে তাদের প্রায়ই সংঘর্ষ লেগে থাকত। কাজেই রাজনৈতিক দিক দিয়ে নিরাপত্তার জন্যই এতদ-অঞ্চলে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা নেহায়েত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। অধ্যাপক পি. কে. হিট্টি বলেন, 'অন্য কোনো পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়া তৎক্ষণাৎ ঘটিত ঘটনাসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর ইসলামি সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়।' এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, সাম্রাজ্যবাদী নীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে আরববাসী মুসলমানগণ কখনও পারস্যদেশ জয় করেনি। পারস্যবাসীদের শত্রুতা সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয়ে মুসলমানদেরকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল।

ষষ্ঠত: অতি প্রাচীনকাল হতে পারস্য-সভ্যতা বিশ্বে সুবিদিত ছিল। সভ্যতার লীলাভূমি মেসোপটেমিয়া (ইরাক) ছিল পারস্য সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ বিশেষ। এছাড়া সমসাময়িক যুগে সমগ্র বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে হেলেনিক সভ্যতার সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হত। কাব্য ও সংস্কৃতি প্রিয় আরববাসী এ শিক্ষা ও সভ্যতার উত্তরাধিকারী হতে আশা পোষণ করত। সুতরাং রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি তারা এ উদ্দেশ্য দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়।

চিত্রঃ পারস্যে মুসলিম সম্প্রসারণ

পারস্য বিজয়ের ঘটনাবলি

নামারিকের যুদ্ধ (সেপ্টেম্বর ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে) : হযরত উমর (রা.) ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে ২৩ আগস্ট খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করতে লাগলেন। খলিফা আবু বকর (রা.)-এর শাসনকালে হযরত মুসান্না (রা.) ও হযরত খালিদের নেতৃত্বে পারস্য সাম্রাজ্যাধীন হীরারাজ্য আরবদের অধিকারে আসে এবং হীরাবাসি মুসলমানদেরকে বার্ষিক কর দানে রাজী হয়ে সন্ধি করেছিল। কিন্তু হীরারাজ্য হারিয়ে পারস্যবাসী উন্মাদ হয়ে ওঠে এবং হীরারাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তৎপর হয়। অতঃপর হযরত উমর (রা.) হযরত মুসান্নার সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য হযরত আবু ওবায়দার (রা.) এর নেতৃত্বে অন্য একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। পারসিকগণ সেনাপতি রুস্তমের নেতৃত্বে নামারিক নামক স্থানে মুসলিম বাহিনীর সম্মুখীন হয়। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সংঘটিত এ যুদ্ধে বিজয় লাভ করে মুসলমানগণ হীরারাজ্য পুনর্দখল করে।

জসর বা সেতুর যুদ্ধ (অক্টোবর ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে) : নামারিকের যুদ্ধে পরাজয়ে অতি মাত্রা ক্রুদ্ধ হয়ে রুস্তম আরও অধিক সৈন্য সংগ্রহ করে এবং বাহমান নামক জনৈক ব্যক্তিকে উক্ত সৈন্যদলের নেতৃত্বে নিয়োগ করেন। মৃত ও লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে তিনি হযরত আবু ওবায়দার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। ৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে অক্টোবর মাসে দুই পক্ষীয় সৈন্যবাহিনী সেতু (জসর)-এর যুদ্ধে অবতীর্ণ হল। এ যুদ্ধে পারসিকদের প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে হযরত আবু ওবায়দা (রা.) ও তাঁর ভ্রাতা এবং আরও সুযোগ্য মুসলিম সেনানায়ক পরাজিত ও নিহত হন। এ যুদ্ধে ৬,০০০ মুসলিম যোদ্ধা শহীদ হন। যুদ্ধের পূর্বে ও পরে মুসলিম বাহিনী নৌকা দ্বারা সেতু নির্মাণ করে ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম করেছিল বলে একে সেতুর যুদ্ধ' বলা হয়। সেনাপতি আবু ওবায়দার মৃত্যুর পর হযরত মুসান্না (রা.) তাঁর স্থলাভিসিক্ত হলেন। পারসিক সেনাপতি বাহমান যখন বিজয় লাভের আনন্দে উন্মাদ হয়ে উঠলেন, তখন তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী মাদায়েনে বিদ্রোহের সংবাদ পেলেন। সুতরাং তিনি মুসলমানদের পশ্চাদ্ধাবন পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে বিশৃঙ্খল রাজধানী রক্ষার্থে দ্রুত অগ্রসর হলেন। এ সংকটাপন্ন অবস্থায় হযরত মুসান্না (রা.) উলিসে তার রাজধানী স্থাপন করে পূর্ব বিজিত স্থানসমূহ রক্ষা করতে লাগলেন।

বুওয়ায়েবের যুদ্ধ (৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে) : জসর যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে হযরত উমর (রা.) অত্যন্ত মর্মাহত হলেন এবং প্রতিশোধের জন্য নতুন সেনাবাহিনী গঠন করতে লাগলেন। বহু মুসলিম ও খ্রিস্টান তাঁর বলিষ্ঠ আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলামি পতাকাতলে সমবেত হল। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে কুফার অদূরে "বুওয়ায়েব" নামক স্থানে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হল। সেনাপতি হযরত মুসান্না (রা.) শত্রুপক্ষকে বিধ্বস্ত করেন। পরাজিত পারস্যবাহিনী আত্মরক্ষার জন্য পলায়নের চেষ্টা করল; কিন্তু পলায়নের পথ না পেয়ে তাদের অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিল। তাদের সেনানায়ক মিহরান যুদ্ধে নিহত হলেন। এ বিজয় দ্বারা মুসলিম আধিপত্যের সীমারেখা মাদায়েন পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং মুসলমানগণ মেসোপটেমিয়ার নিম্নাঞ্চল ও ব-দ্বীপ অঞ্চলেও তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিজয়ের কিছুদিন পরেই ইসলামের বীর সেনানী হযরত মুসান্না (রা.) প্রাণ ত্যাগ করেন (এপ্রিল ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে)। ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে সেনাপতি হিসেবে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।
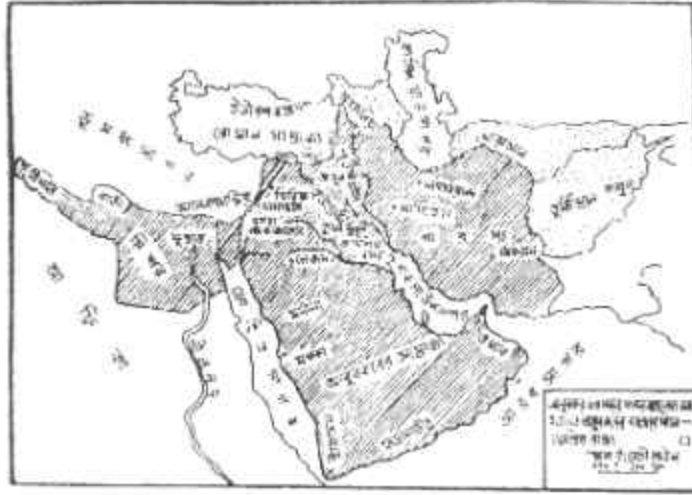
চিত্র: উমর (রা.) এর রাজ্য

কাদেসিয়ার যুদ্ধ (নভেম্বর ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে): পারসিকগণ বুওয়ায়েবের যুদ্ধের শোচনীয় পরাজয় ভুলতে পারল না। তারা আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করল। হযরত উমর (রা.) পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়ে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন। হযরত সা'দ ইবন আবি-ওয়াক্কাসকে মুসলিম বাহিনীর সিপাহসালার মনোনীত করা হলো। তাকে যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে কাদিসিয়ার প্রান্তরে তাবু ফেলে দূত মারফত পারস্যের দরবারে ইসলামের দাওয়াত প্রেরণে নির্দেশ দেয়া হলো। ইসলামের পয়গামসহ পারস্যের দরবারের মুসলিম দূত প্রেরিত হল; কিন্তু পারস্যরাজ ইয়াজদিগার্দ দূতকে অপমান করে দরবার হতে তাড়িয়ে দিলেন। পারস্যরাজ্যের এ অশোভন আচরণের ফলে যুদ্ধ ত্বরান্বিত হলো। মহাবীর রুস্তমের নেতৃত্বে পারস্যের ফৌজ মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য যুদ্ধ ত্বরান্বিত হল। মহাবীর রুস্তমের নেতৃত্বে পারস্যের ফৌজ মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য প্রেরিত হলো। সেনাপতি রুস্তমকে ইসলাম আনয়নের প্রস্তাব করা হলে তিনি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সমগ্র আরবকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার সংকল্প ঘোষণা করলেন। তিনি ১,২০,০০০ সুসজ্জিত সৈন্যের বিরাট বাহিনীসহ মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। অপরদিকে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল ষাট হাজার। তন্মধ্যে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৯৯ জন সাহাবাসহ মোট ১০০০ সাহাবা ছিলেন। মুসলিম সেনাপতি হযরত সা'দ (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি তার স্থলে হযরত খালিদ বিন আরতাফাকে নিয়োগ করেন এবং নিজে যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটবর্তী একটি পুরাতন রাজপ্রাসাদের ছাদে ওঠে শায়িতাবস্থায় যুদ্ধ পরিদর্শন করতেন। প্রয়োজনমতো হযরত খালিদ-বিন আরতাফাকে নির্দেশ দিতেন। ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে কাদিসিয়া প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এ যুদ্ধ তিনদিন স্থায়ী ছিল। আরবদের নিকট প্রথম দিনে যুদ্ধ 'ইয়াউমুল আরমাছ্ অর্থাৎ বিশৃঙ্খলার দিন, দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধ ইয়াউমুল আগওয়াস অর্থাৎ- সাহায্যের দিন এবং তৃতীয় দিনের যুদ্ধ 'ইয়াউমুল উন্মাস অর্থাৎ দুর্দশার দিন নামে পরিচিত। তৃতীয় দিন সারারাত যুদ্ধ চলেছিল বলে ঐ রাত "লাইঃলাতুল হারীর" অর্থাৎ গোলযোগপূর্ণ রাত নামে পরিচিত। দ্বিতীয় দিনে যুদ্ধে সাহাবীর কাকা যুদ্ধের ময়দানে অবতরণ করেই পারস্যবাসীকে মল্লযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। পারস্যের প্রসিদ্ধ বীর বাহমান হযরত কা'কার বিরুদ্ধে ছুটে আসলেন। কিন্তু হযরত কা'কা (রা.) সহজেই তাকে ধরাশায়ী করে পরপারে পাঠিয়ে দিলেন। পারস্যবাহিনী বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেও অবশেষে পরাজিত হলেন। রুস্তম নিজে লড়াইয়ের ময়দান হতে পলায়ন করতে গিয়ে নিহত হলেন। রুস্তমের মৃত্যুতে পারস্যবাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল এবং মুসলিম বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

কাদেসিয়া যুদ্ধের গুরুত্ব: ইসলামের ইতিহাসে কাদেসিয়ার যুদ্ধের গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী। এ যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের পর হতেই পারসিকদের যুদ্ধস্পৃহা প্রশমিত হতে থাকে। কারণ (ক) টাইগ্রিস নদীর পশ্চিম দিকস্থ উর্বর ভূমি মুসলিম কর্তৃত্বাধীনে আসে এখান হতে তারা উন্নতর উর্বর ভূমির মালিক হয়। ইতোপূর্বে তারা এ ধরনের ভূমির একান্ত অভাব অনুভব করেছিল। ফলে তাদের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি সাধিত হয়। (খ) ইরাকের কৃষককূল মুসলমানদের বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়েছিল; কারণ পারস্য শাসনাধীনে উক্ত এলাকার কৃষককুল উচ্চ করভারে জর্জরিত হচ্ছিল এবং সামন্ত রাজা কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছিল। সুতরাং রাজনৈতিক দিক দিয়ে ইরাকের কৃষককুল মুসলমানদের পক্ষাবলম্বন করার ফলে পারসিক শক্তির মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। মুসলমানগণ কর্তৃক উন্নততর শাসন প্রবর্তনের ফলে এখানে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (গ) সর্বোপরি কাদেসিয়ার যুদ্ধে জয়লাভের ফলে মুসলমানদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস এতই দৃঢ় ও বৃদ্ধি পয়েছিল যে, তারা পরবর্তী বৃহত্তর সংগ্রামে অজেয় হয়ে ওঠে।

মাদায়েন বিজয় (মার্চ, ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে): আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলিউকাসের বংশধরগণ কর্তৃক নির্মিত পশ্চিমাংশ সেলুসিয়া ও পারস্য রাজগণ কর্তৃক নির্মিত পূর্বাংশ টেসিফোন নামে পরিচিত নগরীদ্বয়কে 'মাদায়েন' (দুই শহর) বলা হত। দজলা ও ফোরাত নদীর সঙ্গমস্থল হতে ১৫ মাইল উজানে দজলার উভয় ভূখণ্ডব্যাপী এ নগরী অবস্থিত। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হযরত উমর (রা.) এর নির্দেশ ক্রমে সেনাপতি হযরত সাদ ইবন আবি-ওয়াক্কাস (রা.) মাদায়েনের দিকে যাত্রা করলেন। প্রথমে তিনি নগরীর পশ্চিমাংশের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে পারসিকগণ মুসলিম সেনাবাহিনীকে বাধা দিয়ে পরাজিত হয়। হযরত সাদ (রা.) এবার সেনাবাহিনীসহ নদী অতিক্রম করে পূর্ব তীরে পৌছলেন। এখানকার জনগণ পূর্বেই পালিয়ে গিয়েছিল। ফলে একরকম বিনা বাঁধাতেই মুসলমানগণ মাদায়েন দখল করেন। পারসিকদের সঞ্চিত বিপুল ধন সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হল। সেনাপতি হযরত সাদ (রা.) মাদায়েনকে ইরাকের রাজধানীতে পরিণত করেন।

জালুলার যুদ্ধ (ডিসেম্বর ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে): কাদেসিয়ার রণক্ষেত্রে পরাজয়বরণ করে পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ সাসানী বংশী সম্রাট ইয়াজদির্গাদ তাঁর বিধ্বস্ত এবং বিচ্ছিন্ন সেনাবাহিনীসহ পারস্যের পার্বত্য প্রদেশ হুলওয়ানে পলায়ন করেন। পারসিকগণ মৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার ও পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার মানসে মাদায়েনের একশত মাইল উত্তরে হুলওয়ান নামক স্থানে বিপুল সংখ্যায় ইয়াজদিগার্দ এর সাথে মিলিত হল। তথা হতে জালুলা নামক একটি দুর্ভেদ্য দুর্গের দিকে তারা অগ্রসর হল। ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সেনাপতি হযরত সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস (রা.) এর অনুমতিক্রমে সেনাপতি হযরত কাকাকে ১২০০০ সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে জালুলা নামক প্রান্তরে পারসিকদের মোকাবেলা করতে নির্দেশ দেন। আটদিন অবরোধের পর জালুলার যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী জয়লাভ করলে হুলওয়ান তাদের দখলে আসে। অতঃপর ট্রাইগিস নদীর তীরবর্তী টাকরিট দুর্গ এবং ইউফ্রেটিস নদীর তীরে অবস্থিত হিত ও কিরকিসিয়া দূর্গগুলো মুসলমানদের অধিকারে আসে। এরূপে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সমগ্র মেসোপটেমিয়া (ইরাক) মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়।

কুফা ও বসরা প্রতিষ্ঠা (৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে): ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে হযরত সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা.) কুফা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং খলিফা উমর (রা.) এর নির্দেশে হিরার নতুন রাজধানী কুফায় নির্মাণ করলেন। ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত কুফা নগরীর সুবিধা ছিল এই যে, কোন সময় শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হলে সহজেই শহর পরিত্যাগ করে সেনা ছাউনীকে মরুভূমিতে উঠিয়ে নেয়া যেত। একই বছর উতবা উবাল্লার নিকট শাতআল আরবে বসরা শহর প্রতিষ্ঠা করে অপর একটি সেনানিবাস নির্মাণ করেন। ইরাকে বসরা ও কুফা নগরী প্রতিষ্ঠার ফলে পূর্বদিকে সামরিক অভিযান প্রেরণে যথেষ্ট সুবিধা হয়। উপরন্তু, আরব

ভূখণ্ডের তুলনায় ইরাক সুজলা সুফলা ছিল।এর জলবায়ুও ছিল স্বাস্থ্যকর। এ কারণে মুসলমানগণ দুটি শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগল। পরবর্তীকালে এ স্থান দুটি ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নয়নে এ দুটি শহরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এখানে অনেক জ্ঞানী-গুণী, কবি-সাহিত্যিক, পণ্ডিত ও দরবেশ বসবাস করতেন।

নিহাওয়ানদের যুদ্ধ (৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে): হুলওয়ান বিজিত হলে পারস্য সম্রাট ইয়াজদিগার্দ খলিফা উমর (রা.) এর নিকট সন্ধি প্রস্তাব করেন এবং যথারীতি মুসলমান এবং পারসিকদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধি শর্তানুযায়ী পারস্য পবর্তমালা দুই সাম্রাজ্যেরর সীমানা নির্ধারিত হলো। কিন্তু ঘটনাচক্রে শিগগির মুসলিম সৈন্যগণ পারস্য সাম্রাজ্যের সীমানা অতিক্রম করতে বাধ্য হন। এদিকে পারস্য সম্রাট ইয়াজদিগার্দও সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তিনি জুরজান, রাই, ইস্পাহান ও হামাদান প্রভৃতি অঞ্চল হতে সৈন্যবাহিনী সংঘবদ্ধ করে ফিরোজানের নেতৃত্বে ১,৫০,০০০ পারসিক সৈন্যের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী আলবুর্জ পাহাড়ের পাদদেশে প্রেরণ করলেন। খলিফা হযরত উমর (রা.) পারস্য বাহিনীর মোকাবেলার জন্য প্রায় ৩০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করে হযরত নুমান বিন মুকরানকে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন। প্রথমে অবশ্য খলিফা স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পারসিক বাহিনীর সাথে ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে নিহাওয়ানদের যুদ্ধে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে সেনাপতি নুমান (রা.) পারস্য বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন এবং মুসলিম বিজয় সুনিশ্চিত হয়। যুদ্ধে হযরত নোমান (রা.) শাহাদাত বরণ করেন।

পারস্য বিজয়ের ফলাফল

১. পারসিকদের উপর আরবগণের (মুসলমানগণের) বিজয় লাভ হল আর্যদের উপর সেমেটিকদের বিজয়ের অনুরূপ। এতে জোরাস্ট্রীয় ধর্মের উপর ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সাফল্য সূচিত হল। অচিরেই পারস্যের অগ্নি উপাসকগণ ইসলামের প্রাণশক্তি ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে দলে দলে ইসলাম র্ধম গ্রহণ করতে লাগল।

২. এ বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ ইরাকে (মেসোপটেমিয়া) এবং অক্সা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যের সর্বময়কর্তা হয়ে দাঁড়ায়। পারস্য বিজয় দ্বারা মুসলমানগণ উক্ত দেশের সহজাত ও গৌরব ঐতিহ্যের সংস্পর্শে এসেছিল। এ বিজয়ে মুসলমানগণ উক্ত দেশের অগণিত ও অপরিমিত প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য ও ধন-সম্পদের অধিকারী হয় এবং এর ফলে আরবগণ তাদের বিজয় অভিযান সিন্ধু নদ পর্যন্ত প্রসারিত করতে প্রেরণা লাভ করে।

৩. পারসিকগণের সংস্পর্শে এসে মুসলমানগণ তাদের সামরিক কৌশল আয়ত্ত করে নিল। তৎকালে পারস্য ছিল সুশৃঙ্খল ও সুসংহত সামরিক শক্তির মধ্যে অন্যতম।

৪. সাহিত্য, শিল্প, দর্শন এবং ভেষজবিজ্ঞান প্রভৃতিতে পারসিকগণ চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। তাদের সংস্পর্শে এসে আরবগণ এসব বিষয়ে প্রভূত জ্ঞানার্জন করে। অতি প্রাচীনকাল হতে ইরাক ছিল সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ও লীলাভূমি। প্রথম তিন শতাব্দীতে যে সমস্ত পন্ডিতগণ ইসলামের জ্ঞানভান্ডারে অসামান্য দান রেখে গিয়েছেন তাদের অনেকেই ছিলেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী পারসিক।

রোমান (বাইজান্টাইন) সাম্রাজ্য বিজয়

আরবদেশের উত্তর-পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্য অবস্থিত। পূর্বে-রোমান সাম্রাজ্যকে "বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য" বলা হত। এ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, জর্ডান ও মিশর নিয়ে গঠিত ছিল। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে আরবের অধিবাসীরা বসতি স্থাপন করেছিল। অতি প্রাচীনকাল হতে আরবদের সাথে এ অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ইসলাম প্রচারের প্রথম দিকে

মুসলমানদের সঙ্গে এ সাম্রাজ্যের সম্পর্ক খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে নানা কারণে এ সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং মুসলমানগণ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে বাধ্য হন। নিম্নে এ সমস্ত কারণ উল্লেখ করা হলো।

রোমানদের সাথে যুদ্ধের কারণ

রাজনৈতিক : হযরত মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর জীবদ্দশাই রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াসের নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে দূত প্রেরণ করেছিলেন। রোমান সম্রাট তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু ব্যক্তিগত অসুবিধার জন্য তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নি। অনুরূপভাবে সিরিয়ার বানু গাচ্ছান গোত্রীয় খ্রিস্টান শাসনকর্তার নিকটও মুসলিম দূত প্রেরিত হয়। কিন্তু সেই দূত সিরিয়া যাবার পথে মুতার খ্রিস্টান দলপতি সোরাহবিল কর্তৃক নির্মমভাবে নিহত হয়। সুরাহবিল এ হত্যাকান্ডের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক নীতিবোধ সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেয়। এ হত্যাকান্ডের ফলশ্রুতিতে মহানবি(সা.)এর সময় মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে প্রতিহিংসা নিবারণার্থে সিরিয়া সীমান্তে হযরত উসামা (রা.) এর নেতৃত্বে অভিযান পরিচালিত হয়। উপরন্তু রিদ্দা যুদ্ধের সময় খ্রিস্টান মহিলা ভন্ড নবি সাজাহকে সাহায্য করায় মুসলমানদের সাথে বাইজান্টাইনদের সম্পর্ক তিক্ততায় পর্যবসিত হয়। সুতরাং উভয় শক্তির মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আসন্ন হয়ে ওঠে। বস্তুতপক্ষে রাজনৈতিক দিক দিয়ে ইসলামের নিরাপত্তা এবং ইসলামি সাম্রাজ্য সুদৃঢ়ীকরণের জন্য রোমান সাম্রাজ্যর মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্তি হওয়াই একান্ত বিধেয় ছিল এবং পরবর্তীকালে বাস্তবিকই এর প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়।

অর্থনৈতিক : বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ভূমির উর্বরতা, ঐশ্বর্য ও বৈভব প্রাচীনকাল অনুর্বর আরব ভূখন্ডের অধিবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আরবদের সঙ্গে এ সকল অঞ্চলের বাণিজ্যিক লেনদেনও দীর্ঘকালের। কালক্রমে রোমানদের সাথে মুলমানদের বিরোধ দেখা দিলে তারা বাণিজ্যিক কার্যকলাপে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই নিজেদের স্বার্থে মুসলমানদের পক্ষে রোমান বিজয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বলতে গেলে অর্থনৈতিক কারণেই আরবগণকে রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে বাধ্য করে এবং এ আক্রমণের ফলে আরবদের সাথে বাইজান্টাইনগণের সংঘর্ষ বাধে। পরিণামে এ সংঘর্ষ বৃহদাকার সংগ্রামে পরিণত হয়।

ভৌগোলিক : ভৌগোলিক দিক দিয়ে সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন প্রকৃতপক্ষে আরবের অন্তর্গত। এই দুই দেশের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী উপজাতিসমূহ বৃহত্তর আরব জাতিরই একাংশ। সীমান্তে বসবাসকারী আরবীয় গোত্রসমূহ হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর ইন্তিকালের পর আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ আরববাসীদেরকে ইসলাম ত্যাগ করতে যথাসাধ্য প্ররোচিত করত এবং প্রায়ই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে আক্রমণ চালাত। বাইজান্টাইন সম্রাট এ সমস্ত আক্রমণকারীদের পক্ষ সমর্থন করতেন। সীমান্ত সংঘর্ষ প্রতিহত করার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বকে বিপদমুক্ত ও সুদৃঢ় করার জন্যই মুসলমানদেরকে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে হয়।

সামরিক : সামরিক দিক দিয়ে কিলিসমা বর্তমান সুয়েজ শহর রোমানদের নৌ ঘাঁটি ছিল। কিলিসমা হেজাজ প্রদেশের অতি সন্নিকটে অবস্থিত বিধায় শত্রুগণকে হেজাজের এত নিকটে অবস্থান করতে দেওয়া যেতে পারে না। কারণ এতে মুসলমানদের সমূহ বিপদ দেখা দিতে পারে। তাই কিলিসমা হতে শত্রু বিতাড়ন করে নিজেদের অবস্থা সুরক্ষিত করতে মুসলমানগণের পক্ষে মিসর অধিকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিল।

সিরিয়া বিজয়ের ঘটনাবলি

দামেস্ক বিজয় : খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর খিলাফতকালে সিরিয়ায় একটি সুপরিকল্পিত যুদ্ধাভিযান প্রেরণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৬৩৪ খ্রিঃ আজনাদাইনের যুদ্ধে মুসলমানদের নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস এন্টিওকে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য একটি নতুন সৈন্যবাহিনী সংঘটিত করেন। মহাবীর হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) দ্রুত আজনাদাইন হতে দামেস্ক রওয়ানা হন। দামেস্ক ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সিরিয়া প্রদেশের রাজধানী বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবেও এ নগরীর যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। এর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও সুদৃঢ় ছিল। হযরত খালিদ (রা.) প্রায় ৬ মাস দামেস্ক অবরোধ করে রাখলে নগরীর অধিবাসীরা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। সম্রাট হিরাক্লিয়াস আপ্রাণ চেষ্টা করেও এই অবস্থার কোনো উন্নতি বিধান করতে পারেননি। অবশেষে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) একদল দুঃসাহসী মুসলিম যোদ্ধার সাহায্যে রাতের অন্ধকারে প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং দ্বাররক্ষীদের হত্যা করে দামেস্ক নগরী মুসলমানদের নিকট উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ৬৩৫ খ্রিষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে দামেস্ক সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের করতলগত হয়। এই বিজয় হযরত আবু ওবায়দা (রা.), হযরত আমর ইবন আল আস (রা.) ও হযরত সুরাহবিল (রা.) সেনাপতি হযরত খালিদকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

ফিহলের যুদ্ধ : দামেস্ক বিজয়ের পর মুসলমানগণ জর্দান অভিমুখে অগ্রসর হলে সম্রাট হিরাক্লিয়াস এন্টিওক থেকে ৫০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী দামেস্ক পুনরুদ্ধারের উদ্দেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের সতর্কতার ফলে তারা দামেস্কে প্রবেশ করতে অসমর্থ হয়ে জর্দানে অবস্থান করতে থাকে। মুসলিম বাহিনী 'ফিহল' নামক স্থানে তাবু স্থাপন করেন। মুসলমানদের দৃঢ়সংকল্প ও মনোবল দেখে রোমানগণ বিচলিত হয়ে ওঠে। তারা মুসলমানদের সাথে সন্ধির প্রস্তাব দেয়। কিন্তু রোমানদের অযৌক্তিক প্রস্তাব সম্বলিত সন্ধির শর্ত মুসলমানগণ প্রত্যাখ্যান করলে ফিহলে উভয়পক্ষের এক তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে রোমানগণ পরাজিত হয়। মুসলমানগণ রোমানদের জীবন, সম্পত্তি ও গির্জার হেফাজতের নিশ্চয়তা দেন। উল্লেখ্য যে, উইলিয়ম মূইরের বর্ণনা মতে দামেস্ক বিজয়ের পূর্বে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে।

হিমস অধিকার : জর্দান অধিকার করার পরে মুসলিম বাহিনী সিরিয়ার বিখ্যাত ও প্রাচীন নগরী হিমসের দিকে অগ্রসর হয়। সামান্য বাধার সম্মুখীন হওয়ার পর মুসলমানগণ প্রচণ্ডভাবে হিমস আক্রমণ করলে নগরীর অধিবাসীগণ আত্মসমর্পণ করে। হিমস অধিকৃত হলে খলিফা হযরত উমর (রা.) মুসলিম সেনাপতিদেরকে আর সম্মুখে অগ্রসর হতে না দিয়ে বিজিত অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা পুর্নগঠন করার নির্দেশ দেন তিনি হযরত আবু ওবায়দাকে হিমসের হযরত আমর ইবন আল আসকে জর্দানের এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে দামেস্কের দায়িত্ব অর্পণ করেন।

ইয়ারমুকের যুদ্ধ : দামেস্ক, জর্দান ও হিমসের ন্যায় তিনটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের পতনে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে আর্মেনীয়, সিরীয় রোমীয়ও আরব গোত্রীয় খ্রিস্টানদের নিয়ে গঠিত ২,৪০,০০০ সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী ভ্রাতা থিওডোরাসের নেতৃত্বে প্রেরণ করেন। অপরপক্ষে মাত্র ৩৫,০০০ সৈন্যের এক মুসলিম বাহিনী হযরত আবু ওবায়দার অধিনায়কত্বে ইয়ারমুকের প্রান্তরে শিবির স্থাপন করে। হযরত আমর ইবন আল আস (রা.) ও হযরত খালিদ-বিন ওয়ালিদ (রা.) তার সাথে মিলিত হন। ৬৩৬ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইয়ারমুকে এক সর্বাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে রোমীয়দের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং ঐতিহাসিক বালাজুরীর মতে ইয়ারমুকের যুদ্ধে সত্তর হাজার এবং ঐতিহাসিক তাবারীর মতে এক লক্ষের অধিক রোমান সৈন্য নিহত অথবা আহত হয়। মুসলমানদের পক্ষে তিন হাজার সৈন্য শাহাদাত বরণ করেন। রোমানদের বিপর্যয়ের সংবাদে সম্রাট হিরাক্লিয়াস কনস্টান্টিনোপলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

যুদ্ধের গুরুত্ব : ইয়ারমুকের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী যুদ্ধ। কাদেসিয়ার যুদ্ধ যেমন চিরকালের জন্য পারস্যের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়, ইয়ারমুকের যুদ্ধ ঠিক তেমনি সিরিয়ার ভাগ্য নির্ধারকের ভূমিকা পালন করে। এ যুদ্ধের পর সমৃদ্ধশালী সিরিয়া চিরদিনের জন্য রোমান সাম্রাজ্যের হস্তচ্যুত হয়। ইয়ারমুকের যুদ্ধ রোমানদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে দেয়। তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা বিনিষ্ট হয়ে পড়ে তারা বিভিন্ন শর্তে মুসলমানদের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ যুদ্ধের সাফল্য মুসলমানদের পরবর্তী বিজয়ের পথ প্রশস্ত ও সুগম করে।

সেনাপতি হযরত খালিদের পদচ্যুতি ও সমগ্র সিরিয়া বিজয় : ইয়ারমুকের যুদ্ধের অব্যবহিত পর খলিফা হযরত উমর (রা.) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রধান সেনাপতির পদ থেকে অব্যাহতি দেন এবং তদস্থলে হযরত আমর (রা.) কে নিযুক্ত করেন। তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা খলিফার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে উত্তর সিরিয়ার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। তিনি হযরত সুরাহবিলকে জর্দান, হযরত ইয়াজিদকে লেবানন এবং হযরত আমর ইবন আল আসকে প্যালেস্টাইন ও জেরুজালেম অভিমুখে প্রেরণ করে তিনি দ্রুতগতিতে বালবেক, এডেসা, এন্টিওক, আলেপ্পো কিন্নিসিরিন প্রভৃতি স্থান দখল করে সমগ্র সিরিয়া অঞ্চলে মুসলমানদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।
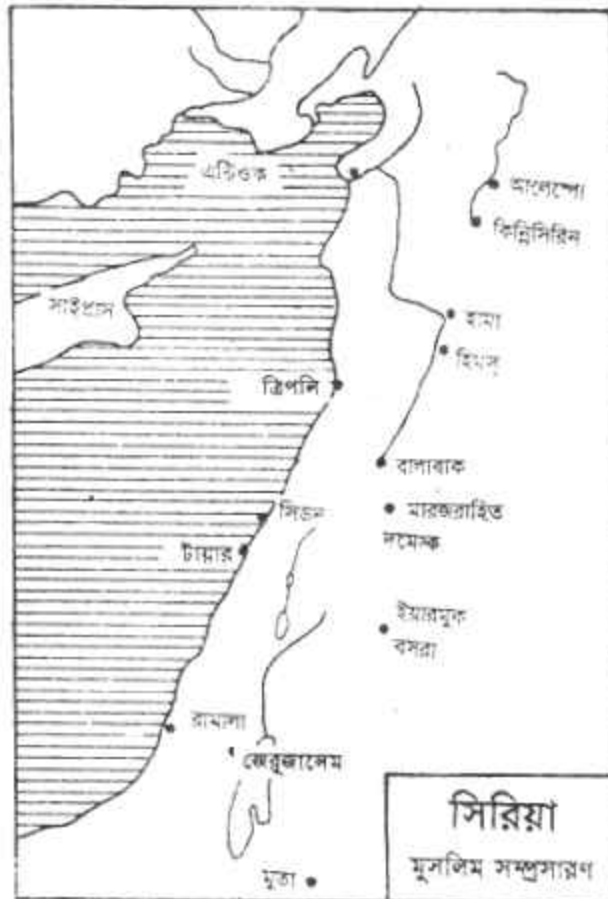
চিত্র ঃ সিরিয়ায় মুসলিম সম্প্রসারণ।

প্যালেস্টাইন বিজয়

জেরুজালেম অধিকার (জানুয়ারি, ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দ) : সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন বিজয়ের ধারাবাহিকতায় জেরুজালেমের পতন এবং মুসলমানগণ কর্তৃক এর কর্তৃত্ব লাভ ইসলামের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ইয়ারমুক যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই হযরত আমর ইবন আল আস কর্তৃক প্যালেস্টাইনের রাজধানী জেরুজালেম অবরোধের সংবাদ পেয়ে রোমান শাসনকর্তা আরতাবুন পালিয়ে যান। রোমানগণ শত চেষ্টা করেও তাদের পবিত্র শহর (এটি মুসলমানদেরও পবিত্র শহর) রক্ষা করতে ব্যর্থ হলো। অবশেষে অবরুদ্ধ নগরীর অধিবাসীবৃন্দ মুসলিম সেনাপতির নিকট এশর্তে আত্মসমর্পণ করতে স্বীকৃত হলো যে, মহান খলিফা হযরত উমর (রা.) স্বয়ং জেরুজালেম এসে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করবেন। সেনাপতি হযরত আবু ওবায়দা (রা.) এ সংবাদ খলিফা হযরত উমর (রা.) কে জানাল, তিনি সকলের সাথে পরামর্শ করে একজন ভৃত্য সহকারে উষ্ট পৃষ্ঠে চড়ে জেরুজালেম রওয়ানা হন। পালাক্রমে খলিফা ও ভৃত্যটি উটের পিঠে চড়তে চড়তে জেরুজালেম শহরে উপস্থিত হলেন। শহরে প্রবেশকালে পালানুযায়ী তখন খলিফা হযরত উমর (রা.) উটের রশি টানছিলেন আর ভৃত্য উটের পিঠে বসা। এ দৃশ্য অবলোকন করে খ্রিস্টানগণ বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়েন। অতঃপর খ্রিস্টানদের সাথে সন্ধি সাক্ষর করে ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে খলিফা হযরত উমর (রা.) নগরীর ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। খ্রিস্টানদের পক্ষ থেকে তাদের ধর্মগুরু সাফ্রোনিয়াস সন্ধিপত্রে সাক্ষর করেন। জিজিয়া করদানের প্রতিশ্রুতিতে জেরুজালেমবাসিগণ তাদের ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও জানমালের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা ফিরে পায়। এ শহরের পতনের ফলে সমগ্র প্যালেস্টাইনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো। খ্রিস্টানদের সাথে মুসলমানদের যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর হয়, তাতে হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.), হযরত আমর ইবন আল আস (রা), হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) স্বাক্ষী ছিলেন।

জাজিরা (৬৩৮ খ্রি.)

রোমানদের সাথে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও মুসলমানদের বিরুদ্ধে রোমান সম্রাটের শত্রুতার অবসান ঘটেনি। ৬৩৮ খ্রিঃ রোমান সম্রাটের প্ররোচনায় ৩০ হাজার জাজিরাবাসী বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুসলিম আধিপত্য খর্ব করার চেষ্টা করে। অতঃপর নিরাপত্তা বিধানের জন্য হযরত আবু ওবায়দা (রা.) অভিযান পরিচালনা করে ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে জাজিরা দখল করেন।

আর্মেনিয়া ও সাইলিসিয়া দখল : রোমানদের প্ররোচনায় কুর্দ ও আর্মেনিয়ানরাও আরব শাসনে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাদের বিশৃঙ্খল কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমানগণ উত্তর মেসোপটেমিয়া আর্মেনিয়া ও এশিয়া মাইনরে রোমান শক্তির কেন্দ্র সাইলিসিয়া অধিকার করেন।

এরূপে মাত্র ছয় বছরের মধ্যে (৬৩৪-৬৪০ খ্রি.) সমগ্র সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন মুসলিম সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। খলিফা হযরত উমর (রা) ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুয়াবিয়াকে সিরিয়ার গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন।

মিসর বিজয়

অভিযানের কারণ :

প্রথমত : বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে মিসর ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্যালেস্টাইন বিজয়ের পর আরবদের মিসর অভিযান অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কেননা রোমানগণ সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন হতে বিতাড়িত হলেও মিসর ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তখনও তাদের কর্তৃত্ব অক্ষুন্ন ছিল। তাই মিসর হতে রোমানদের সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের অভিযানের আশঙ্কা ছিল। সুতরাং আত্মরক্ষার্থে মুসলমানদের মিসর জয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল।

দ্বিতীয়ত : মিসর ইসলামি রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু হেজাজের সন্নিকটে অবস্থিত হওয়ায় ইসলামি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থেই মিসর দখল করা মুসলমানদের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত : মিসরে রোমানদের শক্তিশালী নৌ ঘাটি সেনানিবাস ও দুর্গ অবস্থিত থাকায় সুয়েজ ও আলেকজান্দ্রিয়া অঞ্চলের সামরিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। তাই শক্তিশালী মুসলিম সাম্রাজ্য গঠনের জন্য মিসর বিজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

চতুর্থত : নীলনদের দেশ বলে মিসর ছিল কৃষি সম্পদে সমৃদ্ধ। নীলনদের প্রচুর পলিযুক্ত পানিপ্রবাহ মিসর ভূমিকে উর্বরতা দান করে। এই জন্য মিসরকে 'নীলনদের দান' বলা হয়। অনুর্বর আরবদেশের অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় তারা প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি, বাণিজ্য কেন্দ্র এবং কৃষি সম্পদে ভরপুর মিসর হস্তগত করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করেন। উল্লেখিত কারণ ছাড়াও রোম সম্রাটের আচরণ মুসলমানদের মিসর বিজয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। রোমান সম্রাট, জাবিরার জনগণকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্ররোচনা দান করেছিলেন এবং মিসরের মধ্য দিয়ে সিরিয়া আক্রমণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এসব কারণে খলিফা হযরত উমর (রা.) কাল বিলম্ব না করে হযরত আমর ইবন আল আসকে মিসরের দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

মিসরের বিজয়ের ঘটনা

হেলিওপলিসের যুদ্ধ : হযরত আমর ইবন আল-আস (রা.) ৬৩৯ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বর ৪,০০০ সৈন্যসহ মিসরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং ওয়াদি আল-আরিশ নামক স্থান দখল করেন। এরপর তিনি ফারামা, বিলবিল এবং আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শহর জয় করে ব্যাবিলন নামক দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। এ সময় খলিফা হযরত উমর (রা.) হযরত জুবাইর ইবনে আল-আওয়ামের নেতৃত্বে ১০,০০০ সৈন্য হযরত আমর (রা.) এর সাহায্যার্থে মিসরে পাঠালেন। ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে আমর ইবন আল-আস (রা.) ২৫,০০০ সৈন্য নিয়ে গঠিত বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীকে হেলিওপলিসের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। যুদ্ধে পরাজিত রোমান সেনাপতি থিওডোরাস আকেলজান্দ্রিয়ায় আত্মগোপন করেন এবং মিসরের শাসনকর্তা সাইরাস ব্যাবিলন দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দের ৭ই এপ্রিল মুসলমানগণ দুর্গ প্রাচীর অতিক্রম করে ব্যাবিলন দখল করে নেয়।

আলেকজান্দ্রিয়া দখল : মিসর অভিযানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল আকেজান্দ্রিয়ার পতন। সেনাপতি হযরত আমর ইবন আল-আস (রা.) বাইজান্টাইনের সামরিক ঘাঁটি আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করলেন। বাইজেন্টাইন সেনাপতি থিওডোরাস মুসলিম আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এবার মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ২০,০০০ আর শত্রুপক্ষের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৫০,০০০। নতুন রোমান সম্রাট কনস্টানস দুর্গ হতে বহু ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেও মুসলিম সেনাবাহিনীর গতিরোধ করতে পারলেন না। ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে ৮ই নভেম্বর আলেকজান্দ্রিয়া মুসলমানদের হস্তগত হয়। আলেকজান্দ্রিয়ার পতনের পর উভয়পক্ষে সন্ধি হল। সন্ধির শর্তানুসারে রোমান সম্রাট মুসলমানদের বার্ষিক ১৩,০০০ দিনার দিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলেন। চুক্তি অনুযায়ী জিযিয়ার বিনিময়ে তাদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করা হয়।

আলেকজান্দ্রিয়া বিজয় ইসলামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আলেকজান্দ্রিয়া পতনের সাথে সাথেই রোমান সাম্রাজ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রদেশ মিসর চিরকালের জন্য তাদের হস্তচ্যুত এবং মুসলিম রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। উপরন্তু মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ছিল অপরিসীম। আলেকজান্দ্রিয়াকে মুসলমানগণ উত্তর আফ্রিকার বিরুদ্ধে সামরিক ঘাঁটি ও নৌবহরের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে মুসলিম সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার সাধন করেছিল। অনেকগুলো জনকল্যাণমূলক সংস্কার প্রবর্তিত হওয়ায় সেখানকার কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়।

ফুস্তাত নগরীর প্রতিষ্ঠা : আলেকজান্দ্রিয়া বিজয়ের পর হযরত আমর ইবন আল-আস (রা.) ৬৪২ খ্রিষ্টাব্দে ব্যাবিলনের নিকট একটি সুন্দর শহর নির্মাণ করেন। এটাই বিখ্যাত ফুস্তাত শহর। বর্তমান কায়রো (আর-কাহিরা) প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত ফুস্তাত নগরী মিসরের রাজধানী ছিল।

চিত্র ঃ মিশরে মুসলিম সম্প্রসারণ।
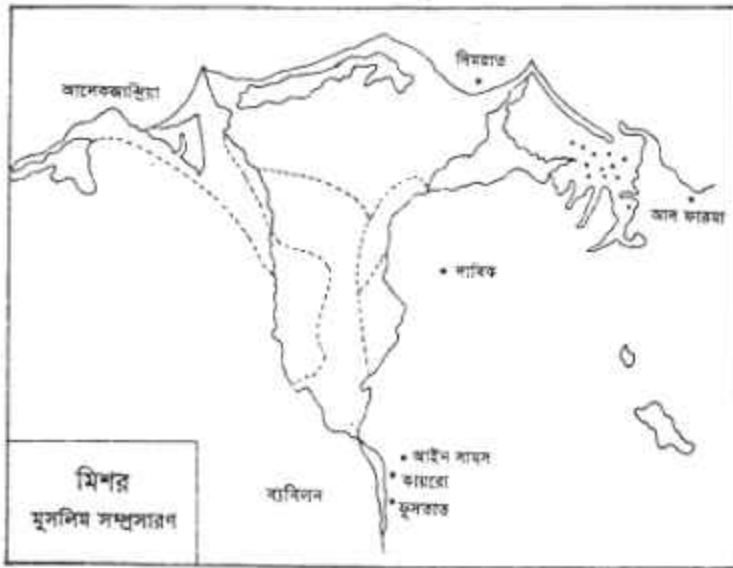
মিসর বিজয়ের গুরুত্ব : মুসলমানদের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে মিসর বিজয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। মুসলমানগণ উত্তর আফ্রিকায় অভিযানকালে মিসরকে সামরিক ঘাঁটি ও নৌ বাহিনীর প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তাছাড়া হযরত আমর ইবন আল-আস (রা.) মিসরের বাসিন্দাদের অবস্থার উন্নতি সাধন, রাজস্ব নির্ধারণ, ব্যবসায়-বাণিজ্যে উৎসাহ দান এবং মিসরের অমুসলিম প্রজাদের সাথে উদার ও সদয় ব্যবহার দ্বারা মিসরীয়দের জীবনে অভূতপূর্ব সুখ ও সমৃদ্ধি এনেছিলেন। মিসরবাসী ইতোপূর্বে আর কখনও এরূপ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে জীবনযাপন করতে পারেনি। উপরন্তু মিসর বিজয়ের পর হযরত আমর ইবন আল-আস হযরত খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর নির্দেশে খাল খনন করে নীলনদ ও লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করেন। (৬৪২ খ্রিঃ) ফলে মিসর হতে আরবের সামুদ্রিক বন্দর ইয়ানবু পর্যন্ত যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়। মুসলমানদের অর্থনৈতিক ভিত্তিও সুদৃঢ় হয়।

রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের ফলাফল

প্রথমত : প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ ভূমধ্যসাগরের নিকটবর্তী হয় এবং এর ফলে বাধ্য হয়ে তাদের নৌ-বাহিনী গঠন করতে হয়েছিল। সুতরাং প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্য বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ প্রবল নৌ-শক্তির অধিকারী হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

দ্বিতীয়ত : সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন বিজয় মুসলমানদেরকে এশিয়া মাইনরের উত্তরাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে সাহায্য করে। তবে প্রাকৃতিক বাধার জন্য উক্ত অঞ্চলের অধিক দূর পর্যন্ত তারা অগ্রসর হতে পারেনি। উত্তর দিকে টরাস পর্বত পর্যন্ত তারা আপাতত উপনীত হয়েছিল। সুতরাং বহুদিন পর্যন্ত উক্ত পর্বত রোমান এবং মুসলমান সাম্রাজ্যদ্বয়ের সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত ছিল।

তৃতীয়ত : প্রাচীনকাল হতে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মিসর সমৃদ্ধশালী এবং উর্বর ভূমিখণ্ড হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। সুতরাং প্রাচ্যের রোমান সাম্রাজ্য অধিকার আর মুসলমানগণ আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল হয়ে উঠেছিল এভাবে মুসলমানগণ আর্থিক দৈন্য ও অভাব অনটনমুক্ত হল এবং তারা তাদের জীবনযাত্রা, শিক্ষা-সংস্কৃতির মান উন্নয়ন করতে সমর্থ হয়েছিল।

চতুর্থত : রাজনৈতিক দিক দিয়ে মুসলমানগণ সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মিসর অধিকার করে রোমান সাম্রাজ্যের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছিল। রোমানগণ তিনটি সুন্দর ও উর্বর প্রদেশ মুসলমানদের নিকট হারিয়ে আর্থিক দিক দিয়ে একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়েছিল।

পঞ্চমত : রোমানদের সান্নিধ্য লাভের ফলে মুসলমানগণ তাদের উন্নত সামরিক কলাকৌশল আয়ত্ত করতে সক্ষম হন এবং এই লব্ধ জ্ঞান যথাযথ প্রয়োগ দ্বারা পরবর্তীকালের বিজয়াভিযান সমূহে সাফল্য ছিনিয়ে আনেন।

ষষ্ঠত : মুসলমানদের এ বিজয় তাদেরকে গ্রিক ও রোমান সভ্যতার সংস্পর্শে নিয়ে আসে। প্রাচীনকাল হতে এ সমস্ত দেশ ছিল সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র ও লীলাভূমি। এ বিজয়ের ফলে মুসলমানগণ (আরবগণ) গ্রিক এবং রোমানদের জ্ঞান ভান্ডারের অধিকারী হয়েছিল। মুসলমানরা এর সাথে ইসলামি সভ্যতার সংযোগ সাধন করে বিশ্ব সভ্যতার গতিকে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল।

পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যদ্বয় বিজয়ে মুসলমানদের সফলতার কারণসমূহ

প্রবল পরাক্রান্ত পারসিক ও রোমানদের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় আরবদের বিস্ময়কর সাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে আমরা প্রলুব্ধ না হয়ে পারি না। কারণ তাদের সৈন্যবল ও অর্থবলের সাথে মুসলমানদের সৈন্যবল ও অর্থবলের কোনো তুলনাই চলে না। আমরা এখানে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী পারসিক ও রোমানদের পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের (আরবদের) সাফল্যের কারণগুলো বিশ্লেষণ করে দেখবো।

আরবদের জাতীয়তাবোধ : আবরগণের সাফল্যের মূলে রয়েছে তাদের ইসলামি চেতনা। আমরা জানি যে, ইসলাম উচ্ছৃঙ্খল ও পাপাসক্ত আরব সন্তানগণকে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। আরবগণ ইসলামের শাশ্বত ও সনাতন বাণীতে অনুপ্রাণিত হয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠেছিল। মরুচারী আরবগণ আল্লাহ ও রাসুলের উপর ইমান আনয়ন এবং কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশ মোতাবেক নিজেদের জীবন গড়ে তুলতে লাগল। ইসলামের আদর্শবাদে বিশ্বাস স্থাপন করে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে গিয়ে আরবগণ এক নতুন পথে অগ্রসর হল। প্রতিটি আরব ব্যক্তিগত জয়-পরাজয়কে জাতীয় জয়-পরাজয়ের আলোকে বিচার করত। এ মহান ইসলামি চেতনায় উদ্বুদ্ধ আবরগণ জাতীয়তাবোধ শূন্য পারসিক এবং রোমানদের বিরুদ্ধে যে সাফল্য লাভ করে, তা এবরূপ সুনিশ্চিত ছিল।

আদর্শের প্রেরণা : পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ইসলামের সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল আদর্শের জন্য মুসলমানদের মরণপণ সংগ্রাম, যুদ্ধে জয়লাভ বা মৃত্যুবরণ করলে ইহকালে গাজি এবং পরকালে শাহাদাত লাভের আশায় মুসলমানগণ শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করত। পক্ষান্তরে পারসিক ও রোমান সৈন্যদের সম্মুখে অনুপ্রেরণা লাভের এরূপ কোনো আদর্শ ছিল না।

অর্থনৈতিক কারণ : অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদেই আরবগণ তাদের উষর বাসভূমি পরিত্যাগ করে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের শস্য-শ্যামলা, উর্বর ভূমির দিকে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়েছিল। কেননা, নিজ দেশে জীবনের চেয়ে জীবনধারণের প্রশ্ন তাদের নিকট বড় হয়ে দেখা দিল। তাই জীবন মরনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আরবগণ যুদ্ধ করত। এ উভয় সাম্রাজ্যের ধন ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি আরবদের নিকট লোভনীয় ছিল। কারণ আরবগণ মনে করত যে, পারসিক ও রোমানদের উপর বিজয় লাভের অর্থই হচ্ছে তাদের দারিদ্র্য পীড়িত জীবনের অবসান এবং সুখময়, প্রাচুর্য-শোভিত জীবনের শুভ সূচনা।

শাসকদের অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারী শাসন : পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের জনগণ তাদের স্বৈরাচারী শাসনকার্যের যথেচ্ছাচারিতায় অতিষ্ঠ ও উত্যক্ত হয়ে পড়েছিল। অত্যধিক করভারে জর্জরিত প্রজাগণকে চরম ও শোচনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ সমস্ত কারণে শাসকবর্গের প্রতি তারা সহানুভূতিহীন ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেছিল। প্রজাগণ অত্যাচারী শাসকদের নিপীড়নের নাগপাশ হতে মুক্তিলাভের প্রতীক্ষায় ছিল। সুতরাং যখন মুসলমানগণ তাদের দেশ জয় করতে এসেছেন তখন উক্ত সাম্রাজ্যদ্বয়ের পদদলিত জনসাধারণ তাদের সাথে হাত মিলিয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করল। কেননা, মুসলমানগণ ইতোমধ্যে তাদের সাম্যনীতি ও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। উল্লিখিত বিবরণ হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমানদের সাথে ঐ দেশের জনগণের পক্ষাবলম্বনই রোমান ও পারসিক শক্তি বিনষ্টের মূল কারণ।

মুসলিম সেনাপতিদের রণনৈপুণ্য ও কর্মকুশলতা : হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা), হযরত আমর ইবন আল-আস (রা) এবং অপরাপর আরব সেনাপতিগণের রণদক্ষতা ও কর্মকুশলতা আরবগণের সাফল্যে প্রভূত সাহায্য করে। তাদের চুম্বকধর্মী ব্যক্তিত্ব এবং অসামান্য শৌর্যবীর্য ও রণনৈপুণ্য আরবদেরকে পারসিক ও রোমান এ দুই দুর্ধর্ষ শত্রুর বিরুদ্ধে বিজয় লাভে সহায়তা করে।

রোমান ও পারসিকে সুষ্ঠু উত্তরাধিকারী আইনের অভাব বা অনিয়ম : পারসিক ও রোমান সিংহাসনে আরোহণের পক্ষে কোনো সুষ্ঠু উত্তরাধিকারী নিয়ম না থাকায় সাম্রাজ্যদ্বয়ের শাসকদের মৃত্যুর পরেই দেখা যেত রাজসভায় ষড়যন্ত্র, কলহ এবং হত্যা আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। এ সমস্ত ব্যাপার সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও অবিচ্ছিন্নতার পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল। মুসলমানরা এরূপ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেছিল।

রোমান এবং পারসিক সৈন্য বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়তা : পারিসিক ও রোমান সৈন্যবাহিনী বিভিন্ন জাতি নিয়ে গঠিত ছিল। সেনা বিভাগে এ বিভিনু জাতীয়তা মুসলমানদের হস্তে রোমান ও পারসকিদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তারা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ না হয়ে কেবল অর্থের জন্যই যুদ্ধ করত। দেশাত্মবোধ বলতে তাদের কিছুই ছিল না।

জাতীয়তাবোধের অভাব : পারস্য ও রোমান সম্রাজ্যদ্বয় জাতীয়তার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। এ দুটি সম্রাজ্য বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত ছিল এবং পারসিক ও রোমান শাসকগোষ্ঠি তাদেরকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতিতে পরিণত করার জন্য কোনো চেষ্টাই করেনি। জাতীয়তাবোধের এ অনুভূতির অভাব পারসিক ও রোমানদের পরাজয়ের অন্যতম একটি কারণ বলা যেতে পারে। আমরা জানি, যে রাষ্ট্র জাতীয়তাবোধ এবং জনগণের সক্রিয় সহানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তার পতন অবশ্যম্ভাবী।

ইসলামের প্রাণবন্ত এবং গতিশীল আদর্শবাদ ঃ এতদিন যাবৎ পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের জনগণের কোনো ধর্মীয় স্বাধীনতা ছিল না। তারা নানারূপ ধর্মীয় অত্যাচার ভোগ করেছিল। যখন মুসলমানগণ (আরবগণ) তাদের দেশ আক্রমণ করল, তখন তারা ইসলামের সহজাত সৌন্দর্য ও প্রাণ-প্রাচুর্যের আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল। এভাবে তারা ধর্মীয় নিগ্রহ হতে অব্যাহতি লাভ করল এবং তাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন কলুষমুক্ত হল। কারণ ইসলাম ধর্ম পার্থিব জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবনের একটি অপূর্ব সমন্বয়। ইসলাম সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও আদর্শের ধর্ম। ইসলামের বিধি বিধান মানুষের সহজাত ভাবধারা ও বাস্তব জীবনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে সর্বকালে সর্বদেশের সর্বলোকের জন্য গ্রহণযোগ্য ও উপযোগী হয়ে উঠেছে। সুতরাং ইসলামের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থার প্রাণবন্ত ও গতিশীল আদর্শ আরবদের পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক জীবনের সাফল্যের অন্যতম আর একটি কারণ। বিরুদ্ধবাদী ও বিজাতীয় ঐতিহাসিকগণও অভিযোগ করেছেন যে, মুসলমানগণ এক হাতে কুরআন শরীফ ও অন্য হাতে অস্ত্র নিয়ে রাজ্য বিস্তার এবং ইসলামধর্ম প্রচার করেছিল। কিন্তু এ অভিযোগটি উল্লিখিত বাস্তব সত্যের আলোকে ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়।

হযরত উমর (রা.) এর শাসনব্যবস্থা ঃ হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকাল (৬৩৪-৬৪৪) ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবময় অধ্যায়ের সূচনা করে। বিশ্বের সর্বকালের শাসকদের নিকট তিনি ছিলেন আদর্শ স্থানীয়। শ্রেষ্ঠ বিজেতা ছাড়াও একজন সুযোগ্য ও দূরদর্শী প্রশাসক হিসেবে ইতিহাসে তিনি অমরত্ব লাভ করেন। তার রাজস্ব, সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও জনকল্যাণমুখী। তাই ড. এস, এম, ইমামউদ্দিন বলেন, "তার শাসনকাল ইসলামের কৃতিত্বপূর্ণ সামরিক ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছে। হযরত উমর (রা.) শুধু একজন বিখ্যাত বিজেতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এবং নিরঙ্কুশ সফলকাম জাতীয় নেতাদের অন্যতম। হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসনামল থেকে শুরু করে হযরত আলী (রা.) এর খিলাফতকাল পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ বছরের ইসলামি প্রজাতন্ত্রে যে শাসন নীতি অনুসৃত হয়েছিল, তা খলিফা হযরত উমর (রা.) এর নিকট থেকে উদ্ভূত। তিনি মহাগ্রন্থ আল কুরআন ও আল হাদিসের নির্দেশ অনুসারে শাসনতান্ত্রিক কাঠামোকে পরিপূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট রূপ দান করেন। তাই নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায় যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রকৃত স্থপতি হচ্ছেন খলিফা হযরত উমর (রা.)।

হযরত উমর (রা.) এর শাসন ব্যবস্থা

গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ঃ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা ছিল খলিফা উমর (রা.) এর শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য। মহানবি (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.) গণতন্ত্রের যে বীজবপন করেন, তা খলিফা উমর (রা.) এর সময় বিকশিত হয়ে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে। পরামর্শ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো গঠন এবং কার্যক্রম গ্রহণ তাঁর শাসনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। খলিফার নীতি ও কার্য সম্পর্কে জনগণের গঠনমূলক সমালোচনা করার অধিকার তাঁর সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সাম্য, স্বাধীনতা, একতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে জনকল্যাণকর ব্যবস্থা প্রচলন করেন। মাওলানা মুহম্মদ আলীর মতে, "উমর (রা.) এর খিলাফতে গণতন্ত্রের আদর্শ যতদূর পালন করা হয়েছিল, সেই আদর্শ অর্জন করতে বিশ্বের আরো অধিক সময় লাগবে।

মজলিস-উশ-শূরা (পরামর্শ সভা) ঃ 'শূরা' আরবি শব্দ এর অভিধানিক অর্থ পরামর্শ। প্রাক-ইসলামি যুগে গোত্র প্রধানরা গণ্যমান্য সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে সমস্যার সমাধান করতেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনেও পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ রয়েছে। মহানবি (স.) প্রাক-ইসলামি নীতি ও কুরআনের নির্দেশ অনুসরণ করে সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি সম্পাদন করতেন। এই পরামর্শ সভাকে 'মজলিশ উশ-শুরা বলা হয়। খলিফা হযরত উমর (রা.) মজলিশ-উশ-শূরার পরামর্শক্রমে

খিলাফত পরিচালনা করতেন। এটি ছিল তাঁর গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "পরামর্শ ছাড়া কোনো খিলাফত চলতে পারে না।" এজন্য তিনি যে কোন সমস্যা মহাগ্রন্থ কুরআন ও হাদিসের আলোকে সুরার সাহায্যে সমাধান করতেন। এ শাসন পরিষদ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; যথা ঃ মজলিশ আল-আম এবং মজলিশ আল-খাস। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর জ্ঞানীগুণী সহাবি এবং মদিনার গণ্যমান্য নাগরিক ও বিশিষ্ট বেদুইন প্রধানগণকে নিয়ে মজলিশ আল-আম গঠিত ছিল। এক কথায়, মুহাজিরিন, এবং আনসারদেরকে নিয়েই এটি গঠিত ছিল।

মদিনা মসজিদের শাসন পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া কতিপয় নির্দিষ্ট মুহাজিরিন নিয়ে মজলিস আল-খাস গঠিত ছিল। হযরত উমর (রা.) দৈনিন্দিন শাসনকার্যে মজলিস আল-খাসের পরামর্শ গ্রহণ করতেন। হযরত আলী (রা.), হযরত উসমান (রা.), হযরত আব্দুর রহমান (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত জুবায়ের প্রমুখ সাহাবিগণের সমন্বয়ে এটি গঠিত ছিল। রাজ্য শাসনের সমস্ত খুঁটিনাটি ব্যাপার বিশেষ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হত। হযরত উমর (রা.) জনগণকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করতেন। তার খিলাফতে শাসনক্ষেত্রের সর্বত্রই গণতন্ত্র ও সাম্যবাদের নীতি অনুসৃত হত। হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতে গণতন্ত্রের আদর্শ যতদূর পালন করা হয়েছিল, সেই আদর্শ অর্জন করতে বিশ্বের আরও অধিক সময় লাগবে।

আরব জাতীয়তাবাদ

হযরত উমর (রা.) এর শাসনের গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি ছিল আরব জাতীয়তাবাদ অক্ষুণ্ণ রাখা। তিনি আরবদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, রক্তের বিশুদ্ধতা, আভিজাত্য ও সামরিক প্রাধান্য ধরে রাখতে চেয়েছিলেন। অবাধ মেলামেশায় তাদের সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং অন্যান্য গুণের ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি দুটি নীতি ঘোষণা করেন (১) আরব উপদ্বীপে একমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছাড়া অন্য কোনো ধর্মের লোক অবস্থান করতে পারবে না এবং এ উদ্দেশ্যে তিনি খাইবারের ইহুদি এবং নাজরানের খ্রিস্টানদেরকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে আরবের বাইরে অবস্থান করতে নির্দেশ দেন। (২) তিনি ঘোষণা করেন যে, আরব উপদ্বীপ শুধু আরববাসীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তিনি অধিকৃত দেশে জমি-জমা ক্রয় করা কিংবা চাষাবাদ করা আরববাসীদের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং আরবদেরকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সামরিক জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন।

অমুসলমানদের প্রতি নীতি

খলিফা হযরত উমর (রা.) সকল অমুসলমানদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। মুসলিম শাসিত অঞ্চলের অমুসলিম প্রজাদেরকে 'জিম্মি' বা নিরাপত্তা প্রাপ্ত বলা হত। জিম্মিরা মুসলিম রাষ্ট্রে জিযিয়া কর প্রদান করে সকল প্রকার অধিকার ভোগ করত। তাদের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া হত। খলিফা তাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হলে আদায়কৃত কর ফেরৎ দিতেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে অমুসলমানদের উপাসনাগৃহ, গির্জা রক্ষা, শিশু, বৃদ্ধ ও পশুদের হত্যা কিংবা অত্যাচার করা প্রভৃতি অমানবিক কাজকর্ম হতে সৈন্যদের বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হত।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা: খলিফা হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতের মুসলিম সাম্রাজ্য ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য খলিফা উমর (রা.) সমগ্র সাম্রাজ্যকে চৌদ্দটি প্রদেশে বিভক্ত করেন (১) মক্কা, (২) মদিনা, (৩) সিরিয়া, (৪) আল-জাজিরা, (৫) আল-বসরা, (৬) আল-কুফা, (৭) আল-মিসর, (৮) প্যালেস্টাইন, (৯) ফারস, (১০) কিরমান, (১১) খোরাসান, (১২) মাকরান, (১৩) সিজিস্তান, (১৪) আজারবাইজান।

প্রত্যেকটি প্রদেশের শাসনভার একজন ওয়ালি (গভর্নর) এর উপর ন্যস্ত ছিল। প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে ওয়ালিগণ খলিফার নিকট দায়বদ্ধ থেকে তার নির্দেশ পালন করতেন। নিয়োগের সময় হযরত উমর (রা.) প্রাদেশিক শাসন কর্তাদেরকে তাদের নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত করতেন। জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে খলিফা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ক্ষমতা এবং দায়িত্ব সংবলিত সনদটি প্রকাশ্যে পাঠ করে শুনাতেন। নিযুক্তির পরেই প্রত্যেক ওয়ালিকে তার সম্পত্তির একটি তালিকা পেশ করতে হত এবং আয়ের অনুপাতে আকস্মিক ও অস্বাভাবিকভাবে সম্পত্তি বৃদ্ধি পেলে খলিফা উমর (রা.) প্রাদেশিক শাসনকর্তার অতিরিক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতেন। হযরত উমর (রা.) সাধারণ লোকের অভিযোগক্রমে শাসনকর্তাগণের নিকট হতে কৈফিয়ত তলব করতেন। শাসনকর্তাগণ জনগণের সেবক মাত্র, এ আদর্শ হতে তিলমাত্র বিচ্যুত হলে খলিফা উমর (রা.) এর অমোঘ দন্ড হতে কারও নিস্তার ছিল না। জনস্বার্থ সংরক্ষণ এবং আপামর প্রজাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের নিমিত্তে হযরত উমর (রা.) সদা সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। হযরত উমর (রা.) শাসনকর্তাদেরকে নির্দিষ্ট বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। ওয়ালিগণ শুধু যে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন তা নয়, শুক্রবার দিন স্ব স্ব রাজধানীর মসজিদের জুমার নামাজে ইমামতি করতেন। খলিফা উমর (রা.) এর প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার অধীনে আমিল (জেলা প্রশাসক), কাজি (বিচারক) ও সাহিব আল-বায়তুলমাল (কোষাধ্যক্ষ) তাদের স্ব স্ব কার্য সম্পাদন ও কর্তব্য পালন করতেন। তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হলে, এর সত্যতা যাচাই করার জন্য নির্দিষ্ট কর্মচারী নিযুক্ত ছিল এবং খলিফার নিকট তার পেশকৃত তথ্যাবলীর ভিত্তিতে তিনি অভিযোগের যথাযথ প্রতিকার করতেন।

রাজস্ব ব্যবস্থা: জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করে জনকল্যাণমূলক রাজস্ব প্রবর্তন খলিফা হযরত উমর (রা.) এর এক অবিস্মরণীয় কীর্তি। ইতোপূর্বে এ ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ছিল না। সৈন্যদের মধ্যে জায়গীর প্রথার বিলোপ সাধনের পাশাপাশি কৃষি ও কৃষকদের দুর্দশা লাঘবে হযরত উমর (রা.) প্রাচীন শোষণমূলক ভূস্বত্ব ও জমিদার প্রথার উচ্ছেদ করেন। পাশাপাশি ইরাকে ভূমি জরিপ করে এর সুষ্ঠু বন্টন বন্দোবস্ত, রাজস্ব নির্ধারন ও তা আদায়ের ব্যবস্থা করেন। নগদ অর্থে বা উৎপন্ন ফসলের মাধ্যমে এককালীন কিংবা কিস্তিতে কর প্রদান করা যেত।

রাজস্বের উৎস: হযরত উমর ফারুক (রা.) এর পূর্বে রাজস্বের উৎস ছিল পাঁচ প্রকার যথা জাকাত, জিযিয়া, খারাজ বা ভূমিকর, উশর, বাণিজ্য কর, খুমস (গণিমাত বা যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদির ১/৫ অংশ) ও আলফাই (রাষ্ট্রীয় ভূমির আয়) খলিফা হযরত উমর (রা.) উপরিউক্ত কর ছাড়াও কয়েকটি নতুন কর প্রবর্তন করেন।

যাকাত: যাকাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ এবং সালাতের পরেই এর স্থান। যাকাতের ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে "যে কোনো প্রকারের বহনযোগ্য বা স্থানান্তরযোগ্য মাল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে (নিসাব) পৌঁছলে এর উপর দেয় করকে যাকাত বলা হয়। ইসলাম ধর্মের বিধান অনুসারে কেবল সম্পত্তিসম্পন্ন মুসলমান প্রজাকে যাকাত দিতে হয়। নবি মুহাম্মদ (স.) এর সময় ঘোড়ার জন্য কোনো যাকাত ছিল না। কারণ ঘোড়ার ব্যবসার প্রচলন ছিল না। হযরত উমরের (রা.) সময় ঘোড়ার ব্যবসায় খুব লাভজনক ছিল। তাই তিনি ঘোড়ার উপর যাকাত ধার্য করেন এবং এতে প্রচুর অর্থাগম হত।

জিযিয়া: জিযিয়া অমুসলমান প্রজাদের নিকট হতে আদায় করা হত। এটি ছিল তাদের জানমালের নিরাপত্তা কর। এ কর পূর্বেও প্রচলিত ছিল; কিন্তু খলিফা উমর (রা.) সে করের হার সামান্য পরিবর্তন করেন। তিনি রোমান ও পারসিকদের আর্থিক সচ্ছলতার কথা বিবেচনা করে প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির উপর চার, মধ্যবিত্তের উপর দুই ও অল্প আয়ের লোকের উপর এক দিনার হিসেবে এ কর ধার্য করেন।

খারাজ : খারাজ বা ভূমিকর ছিল রাজস্বের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উৎস। হযরত উমর (রা.) এর আমলে মুসলিম সাম্রাজ্য যথেষ্ট বিস্তার লাভ করে। এসব বিজিত অঞ্চল হতে যে ভূমি রাজস্ব বা খাজনা আদায় করা হতো তাই খারাজ বা ভূমিকর নামে পরিচিত। বিজিত অঞ্চলের মুসলমানদেরকে ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করতে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং অমুসলমান কৃষকদেরকে এ কর দিতে হত। জমির গুণগত মান, উৎপাদনের পরিমাণ, সেচের সুযোগ সুবিধা প্রভৃতির প্রেক্ষিতে ভূমি করের পরিমাণ নির্ধারণ করা হত। উৎপন্ন শস্যের সর্বোচ্চ ১/২ অংশ এবং সর্বনিম্ন ১/৫ অংশ খারাজ হিসেবে আদায় হত।

উশর : উশর হচ্ছে মুসলিম প্রজার দেয়া ভূমি কর। প্রাকৃতিক পানি সরবরাহ বা বৃষ্টির পানি দ্বারা ভূমি চাষাবাদ হলে সে ক্ষেত্রে উশর ছিল ১/১০ ভাগ এবং জলসেচ বা কৃত্রিম উপায়ে চাষাবাদ করা ভূমির উশর ছিল ১/২০ অংশ।

খুমস : গণিমাতে বা যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যাদির এক পঞ্চমাংশ কোষাগারে জমা রেখে অবশিষ্ট ৪/৫ অংশ মুসলিম সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হত। রাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত এ অংশকে (এক পঞ্চমাংশ) খুমস বলা হত। এই অংশ মহানবি (সা.) এর আত্মীয় স্বজন ও মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সাজ সরঞ্জামের জন্য ব্যয় করা হত।

আলফাই : রাজস্বের একটি উৎস ছিল আলফাই। দখলচ্যুত কিংবা উত্তরাধিকারহীন সম্পত্তি কিংবা পলাতক দেশত্যাগীর যে সমস্ত জমি মুসলমানদের হাতে এসে পড়ে, তাই আলফাই নামে অভিহিত হয়। এ সমস্ত সম্পত্তির মালিক ছিল রাষ্ট্র। আলফাই হতে রাষ্ট্রের যথেষ্ট আয় হতো। এ আয় খাল খনন, নদীর বাঁধ নির্মাণ, কৃষি উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও পানীয় জলের সুবিধার জন্য ব্যয় করা হতো।

বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা

বায়তুলমালের (রাজকীয় কোষাগার) পুর্নগঠন হযরত উমর (রা.) এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব। হযরত উমর (রা.) এর পূর্বে বায়তুলমালের অস্তিত্ব থাকলেও তখন তা নিয়মিত ও সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত ছিল না। তিনি হযরত ওয়ালিদ বিন হিশামের পরামর্শে একটি কেন্দ্রীয় কোষাগার (বায়তুলমাল) প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে প্রদেশগুলোতেও একটি করে কোষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যের রাজস্ব সংগৃহীত হয়ে বায়তুলমালে জমা হত। 'বায়তুলমাল' ছিল জনসাধারণের সম্পত্তি এবং এতে খলিফার কোনো অধিকার ছিল না। তিনি ছিলেন এর রক্ষক মাত্র। শাসন কাজের সাধারণ খরচ ও সামরিক খাতে ব্যয়ের পরে যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকত তা রাষ্ট্রের মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত।

দিওয়ান উল খারাজ : মহামতি খলিফা হযরত উমর (রা.) রাজস্বের সুপরিকল্পিত পদ্ধতি প্রণয়ন এবং বৃহত্তর জনসমষ্টির মঙ্গল সাধনের জন্য দিওয়ান উল-খারাজ (রাজস্ব বিভাগ) নামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। এ রাজস্ব বিভাগই সংক্ষেপে "উমরের দিওয়ান" নামে পরিচিত। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর শাসন কাল পর্যন্ত অর্থদপ্তরকে বায়তুলমাল বলা হত। খলিফা উমর (রা.) পারসিক কায়দায় এ দপ্তরের নাম রাখেন "দিওয়ান"। দিওয়ানের প্রধান দায়িত্ব ছিল বায়তুলমালের সঞ্চিত অর্থের সুষম বণ্টন করা। প্রশাসনিক খরচ এবং যুদ্ধ অভিযানের খাতে ব্যয়ের পর যে উদ্বৃত্ত অর্থ বায়তুলমালে থাকত তা মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হত। জাতীয় অর্থের সুষ্ঠু বণ্টনের জন্য খলিফা হযরত উমর (রা.) সর্বপ্রথম আদমশুমারি প্রচলন করেন। অধ্যাপক পি. কে. হিট্টি বলেন, "রাষ্ট্রীয় রাজস্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর ইতিহাসে ইহাই সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ আদমশুমারি"। এই গণনার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। ইসলামের সেবায় নিয়োজিত প্রত্যেকটি আরব ও মাওয়ালী মুসলমান পুরুষ, স্ত্রী, শিশু, যুবক ও বৃদ্ধ সকলে এ তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অক্ষম, পঙ্গু, দুর্বল, রুগ্ন প্রভৃতি ব্যক্তিদের বিশেষ ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল।

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অমুসলমাসনগণও এ ভাতা থেকে বঞ্চিত হত না। ভাতার পরিমাণ তিনটি নীতি দ্বারা নির্ধারিত হত। (১) মহানবি (স.) এর আত্মীয়তা, (২) ইসলাম গ্রহণে অগ্রগণ্যতা, (৩) ইসলাম ধর্মের প্রতি সামরিক ও অন্যান্য খেদমত। হযরত মুহাম্মদ (স.) এর বিধবা পত্নীগণ বার্ষিক ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ দিরহাম ভাতা পেতেন। বদরের যুদ্ধের অংশগ্রহণকারীরা ৫,০০০ দিরহাম, উহুদের যোদ্ধারা প্রত্যেকে ৪,০০০ দিরহাম, মক্কা বিজয়ের পূর্বে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা এবং রিদ্দা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক যোদ্ধাকে ৩,০০০ দিরহাম, বদর যুদ্ধের পূর্বের মুহাজির ও আনসারদের সন্তানগণ ও ইরাক এবং সিরিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যোদ্ধাদের প্রত্যেককে ২,০০০ দিরহাম হিসেবে নিয়মিত বার্ষিক বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মক্কার অধিবাসী ও অন্যান্য লোকজন সর্বনিম্ন ২০০ থেকে ৮০০ দিরহাম ভাতা পেতেন।

বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগের সংস্কার সাধন খলিফা হযরত উমর (রা.) এর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। তিনিই সর্ব প্রথম শাসন বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথক করে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। প্রত্যেক প্রদেশের বিচার বিভাগের ভার প্রাদেশিক গভর্নরের (ওয়ালি) পরিবর্তে কাজির উপর ন্যাস্ত করা হয়। ফলে ওয়ালির কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে কাজিগণ স্বাধীনভাবে বিচার কার্য সম্পন্ন করতেন। কুরআন ও হাদীসে বুৎপত্তিসম্পন্ন, নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী এবং সম্ভ্রান্ত বংশীয় মুসলমানদের মধ্য থেকে কাজি নিযুক্ত করা হত। প্রত্যেক প্রদেশ ও জেলায় একজন করে কাজি নিযুক্ত থাকতেন। অবশ্য বিচার বিভাগের সর্বময় কর্তা ছিলেন খলিফা নিজেই। তিনি কাজিদের বেতন নির্দিষ্ট করে দেন। কাজিগণ উচ্চ-নীচ, ছোট-বড় ভেদাভেদ না করে ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। মুসলিম আইনের বাইরে অমুসলমানগণ তাদের নিজস্ব আইন কানুনের সুযোগ গ্রহণ করতে পারত এবং সেসব ক্ষেত্রে তাদের স্ব স্ব ধর্মীয় প্রধানগণ তাদের বিচার করতেন।

সামরিক শাসনব্যবস্থা

মুসলিম সম্রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতির প্রেক্ষিতে একটি সুসংবদ্ধ সামরিক ব্যবস্থাপনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। ফলে খলিফা উমর (রা.) সামরিক বাহিনীকে সুসংহত করার জন্য একটি প্রশাসনিক কাঠামো গঠন করেন। সামরিক শাসনের সুবিধার্থে তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে নয়টি সামরিক জেলায় বিভক্ত করেন। যথাঃ মদিনা, কুফা, বসরা, ফুস্তাত, মিসর, দামেস্ক, হিমস, প্যালেস্টাইন ও মসুল। জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য প্রত্যেকটি জেলায় ৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বাহিনী সর্বাদা প্রস্তুত থাকত। সেনা দপ্তরের সকল সৈন্যর নামের একটি তালিকা রাখা হত। সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন খলিফা নিজেই। প্রত্যেক বাহিনীর অবশ্য নিজস্ব অধিনায়ক ছিল এবং যুদ্ধনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ তারাই করতেন। সৈন্যবাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ, বাহক সেবক প্রভৃতি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। রণক্ষেত্রে তারা অগ্র, মধ্য, পশ্চাৎ ও দুই পার্শ্ব এরূপ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে শত্রুর মোকাবিলা করত। "আহরা" নামক সংস্থার মাধ্যমে সৈন্যদের রসদ সরবরাহ করা হত। যুদ্ধে সৈন্যরা তরবারী, বর্শা, বল্লম, তীর, ধনুক, ঢাল, বর্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করত।

পুলিশ ও অপরাধ দমন বিভাগ

হযরত উমর (রা.) এর সময় পুলিশ বিভাগ স্থাপিত না হলেও জনশান্তি রক্ষা ও অপরাধ নির্মূলকল্পে দিওয়ান-উল-আহদাস কাজ করত। এর প্রধান কর্মচারীর উপাধি ছিল সাহিবুল আহদাস। এর বিভিন্ন কর্মচারিগণ দেশের অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, ওজন পরীক্ষাকরণ, মদবিক্রি বন্ধকরণ, চুরি-ডাকাতি নিবারণ ইত্যাদি কার্যে নিযুক্ত থাকতেন।

জনহিতকর কার্যাবলি

হযরত উমর (রা.) রাজ্যবিজয় ও শাসন সংস্কারের সাথে সাথে নানাবিধ জনহিতকর ও উন্নয়নমূলক কাজে মনোনিবেশ করেন। নাজরাত ই-নাফিয়ার তত্ত্বাবধায়নে তার খিলাফতকালে অসংখ্য সরকারি ভবন, মসজিদ, খাল সড়ক, হাসপাতাল ইত্যাদি নির্মিত হয়। জলকষ্ট নিবারণ ও ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বসরায় আবু মুসা খাল, পারস্যের সাদ খাল, ইরাকে মাকাল খাল এবং মিসরে আমিরুল মুমেনিন খাল খনন করেন। তিনি কাবাগৃহের পুনর্নির্মাণ ও মদিনা মসজিদের সম্প্রসারণ করেন। তাঁর সময় হাজার হাজার নতুন মসজিদ, অসংখ্য দুর্গ ও সেনানিবাস, সরকারি কার্যালয়, ভবনসমূহ, দিওয়ান, বায়তুলমাল, অতিথি ভবন ইত্যাদি স্থাপিত হয়। প্রশস্ত ও দীর্ঘ রাস্তা দ্বারা রাজধানী মদিনাকে দূরবর্তী প্রদেশগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হয়। এছাড়া তিনি কুফা, বসরা, ফুসতাত, মাসুল প্রভৃতি শহর নির্মাণ করেন।

হযরত উমর (রা.) এর শাহাদাত বরণ

হযরত উমর ফারুক (রা.) দশ বছরের অধিককাল গৌরবের সাথে খিলাফতের কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পর ৬৪৪ সালে মদিনার মসজিদে ফজরের নামাজ আদায় করার সময় আবু লুলু ফিরোজ নামক এক পারস্যবাসী গোলামের আক্রমণে শাহাদাত বরণ করেন। আবু লুলু কুফার শাসনকর্তা মুগিরার ভৃত্য ছিল। ধারণা করা হয় যে, হরমুজান ও জাফিনা নামক দুজন যুদ্ধবন্দীর যোগসাজসে নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে খলিফাকে ছুরিকাঘাত করে। আমীর আলীর কথায়, হযরত উমরের (রা.) মৃত্যু ইসলামের পক্ষে এক বাস্তব বিপদস্বরূপ ছিলো।

হযরত উমর (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : হযরত উমর (রা.) ছিলেন সচ্চরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ। এ অসাধারণ মানুষটির মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়, অনাড়ম্বর জীবন নির্বাহ, ন্যায় পরায়নতা, প্রজাবাৎসল্য, পাণ্ডিত্য, তীক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি প্রভৃতি মানবিক গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। সরলতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তার চরিত্র সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মুইর বলেন, সামান্য কয়েকটি পংক্তিতে হযরত উমর (রা.)-এর চরিত্র অঙ্কন করা যায়। সরলতা ও কর্তব্যপরায়ণতা ছিল তাঁর জীবনার্দশ এবং ন্যায়পরাণয়তা ও একাগ্রতা ছিল তাঁর শাসনের মূলনীতি।' এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক হয়েও হযরত উমর (রা.) সাধারণ মানুষের মতো জীবনযাপন করতেন। তাঁর সাদাসিধা জীবনযাপন সম্বন্ধে অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁর না ছিল ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য কোন দেহরক্ষীবাহিনী, না ছিল আড়ম্বরপূর্ণ শাহী বালাখানা। হযরত উমর (রা.) ছিলেন কোমলতা ও কঠোরতার অদ্ভুত সংমিশ্রণ। নিজের চরিত্র সম্বন্ধে উমর (রা.) নিজেই বলেছিলেন ঃ'আল্লাহর শপথ, আমার দিল খোদার ব্যাপারে যখন নরম হয় তখন পানির ফেনার চেয়েও অধিক নরম ও কোমল হয়ে যায়। আর আল্লাহর দ্বীন ও শরিয়তের ব্যাপারে যখন শক্ত ও কঠোর হয় তখন তা প্রস্তর অপেক্ষা অধিক শক্ত ও দুর্ভেদ্য হয়ে পড়ে।' দরিদ্রের প্রতি তিনি ছিলেন দয়ালু ও সহানুভূতিশীল এবং তাদের মঙ্গলের চিন্তায় তিনি বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করেছেন। জনগণের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে অভাবগ্রস্থদেরকে অর্থ ও খাদ্য সাহায্য করার জন্য তিনি পথে পথে ঘুরে বেড়াতেন। কখনও বা প্রসূতির প্রসবযাতনা নিবারনার্থে স্বীয় স্ত্রীকে নিঃসঙ্গ বেদুইন মহিলার গৃহে পৌছিয়ে দিয়ে আসতেন। তিনি দুর্ভিক্ষের সময় নিজের কাঁধে করে খাদ্যের বোঝা বইতেন। বিচারকার্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কঠোর। মদ্যপানের অপরাধে স্বীয় পুত্র আবু শামাকে তিনি নিজ হাতে বেত্রাঘাত করেন। স্বজনপ্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব তাকে স্পর্শ করেনি। উঁচু-নিচু, ধনী-দরিদ্র সবাই ছিল তার চোখে সমান। অপরাধী প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে পদচ্যুত করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করেননি।

হযরত উমর (রা.) জ্ঞান চর্চার অনুরাগী ছিলেন। বিদ্বান ও বাগ্মী হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছিল। কুরআন ও হাদীসে তার অসাধারণ পান্ডিত্য ছিল। সামরিক বিজ্ঞান ও কৌশলের দিক দিয়ে তিনি সমগ্র আরবের সুপরিচিত ছিলেন। বস্তুত হযরত উমর (রা.) ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ইসলাম ও রাষ্ট্রের খেদমতে তিনি তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাই ইসলামের ইতিহাসে হযরত উমর (রা.) এর স্থান অতি উচ্চে।

কৃতিত্ব : হযরত উমর (রা.) এর দশ বছরের শাসনকাল ইসলামের ইতিহাসে একটি সোনালী অধ্যায় সূচনা করে। বিজেতা, শাসক, সংস্কারক, রাজনীতিবিদ ও সংগঠক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। তিনি সে সমস্ত অসাধারণ ব্যক্তিদের অন্যতম যারা কেবল জাতির ভবিষ্যতই গড়ে তোলেননি, জাতির নিজস্ব আদর্শও সৃষ্টি করেছেন।

মহানবি (সা.) আরবে ইসলামি সাধারণতন্ত্রের সূচনা করেছিলেন। হযরত আবুবকর (রা.) একে স্বধর্মত্যাগীদের কবল হতে রক্ষা করেছিলেন এবং হযরত উমর (রা.) একে একটি সুসংহত ও শক্তিশালী বৃহত্তম সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। স্বীয় শাসনামলে তিনি প্রবল শক্তিধর পারসিক ও রোমান সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করেছিলেন। ফলে তার খিলাফত কালেই মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা পারস্য, সিরিয়া ও মিসর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পারসিক ও রোমানদের উপর মুসলমানদের এই অভাবিত বিজয় হযরত উমর (রা.) এর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এ প্রসঙ্গে মাওলানা মুহাম্মদ আলী বলেন, 'হযরত উমর (রা.) এর গৌরবজ্জ্বল কৃতিত্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ছিল ইসলামের মহাবিজয়গুলি।' অধ্যাপক পি, কে. হিট্টিও মন্তব্য করেছেন 'আবু বকরের সময় বিশ্ব বিজয়ের উদ্দীপ্ত প্রেরণা ওমরের সময় পরিপূর্ণতা লাভ করে। শূন্য হতে শুরু করে আরবীয় মুসলিম খিলাফত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। মাত্র দশ বছরের মধ্যে তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার গুণে এশিয়ার পারস্য ও সিরিয়া, ইউরোপের রোম বা বাইজান্টাইন, আফ্রিকার মিসর ইসলামের পতাকা তলে এসে পড়ে।' এজন্য বিজেতা হিসেবে তিনি কেবল ইসলামের ইতিহাসেই স্থান লাভ করেননি, পৃথিবীর ইতিহাসেও তিনি একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজেতা হিসেবে পরিচিত।

সামরিক বিচক্ষণতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা

খলিফা হযরত উমর (রা.) এর বিজয়কীর্তির মূলে ছিল তাঁর অসাধারণ রণনৈপুণ্য, সামরিক দক্ষতা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা। তিনি অভূতপূর্ব কৌশলে অশান্ত ও উচ্ছৃঙ্খল বেদুইনদের যুদ্ধ স্পৃহাকে ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে নিয়োগ করে তাদেরকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী সমর শক্তিতে পরিণত করেন। একটি সুষ্ঠ সামরিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তিনি সৈনিকদের আভিজাত্য সংরক্ষণ ও মানোন্নয়নে বিবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত তার অপূর্ব সাংগঠনিক শক্তি অনারব, রোমক ও গ্রিক জাতির জন্য অসংখ্য বীর যোদ্ধাকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত ও স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

শাসক হিসেবে : ইসলামি সাম্রাজ্যে সুষ্ঠ শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হযরত উমর (রা.) এর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি পৃথিবীর ইতিহাসে তার শাসনামল (৬৩৪-৬৪৪ খ্রিঃ) স্বর্ণযুগ ও মানবতার কল্যাণের যুগ হিসেবে মূল্যায়িত হয়েছে। তাঁর শাসন ব্যবস্থার মূল নীতি ছিল মানুষের সেবা করা, যার ফলে তাঁর আমলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সুখে শান্তিতে বাস করত। তিনি এমন একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। যার মূলে ছিল শান্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এক কথায় বিশ্ব মানবের সেবা। বস্তুত শাসক হিসেবে তিনি জনগণের সার্বিক কল্যাণ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন।

গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক : হযরত উমর (রা.) এর প্রতিষ্ঠিত 'মজলিস-উশ-শুরা' বা উপদেষ্টা পরিষদ আজও বিশ্ব গণতন্ত্রের জয়গান করছে। তিনি ঘোষণা করেছিলেন 'পরামর্শ ব্যতীত কোনো খিলাফত চলতে পারে না।' তিনি স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রকে ঘৃণা করতেন। অতি সামান্য একজন ব্যক্তিও প্রকাশ্যে শাসনব্যবস্থার গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারতেন।

শাসনব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ : হযরত উমর (রা.) ছিলেন ইসলামের রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু ক্ষমতার প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না। তাই তিনি সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার জন্য কেন্দ্র হতে গ্রামান্তর পর্যন্ত ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করেছিলেন। তাঁর শাসনব্যবস্থা সুশৃঙ্খলিত শিকলের মতো যোগাযোগ রক্ষাকারী ছিল। বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের পর তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, ন্যায় বিচার পেতে হলে বিচার বিভাগকে সাধারণ প্রশাসন হতে পৃথক করতে হবে। এজন্য তিনি বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করেছিলেন। বিশ্বের ইতিহাসের বিচার বিভাগ পৃথকীকরণে তাঁকেই পথিকৃৎ বলা হয়।

সরকারি কোষাগার স্থাপন : সরকারি কোষাগার (বায়তুলমাল) স্থাপন হযরত উমর (রা.)-এর অক্ষয় কীর্তি। সাম্রাজ্য বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে আয় বৃদ্ধি পেতে থাকলে তিনি বায়তুলমাল বা সরকারি কোষাগার স্থাপন করেন। জনসাধারণই ছিল এর প্রকৃত মালিক।

আদমশুমারির প্রবর্তন : হযরত উমর (রা.) দুর্বল, অসহায়, অন্ধ, খোঁড়া, বেকার, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, অনাথ প্রমুখের অভাব দুর করার জন্য সরকারি ভাতার ব্যবস্থা করেন। তার পূর্বে বিশ্বে কোথাও এ ব্যবস্থা এত সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়নি। এ ব্যবস্থাকে সুষ্ঠভাবে পরিচালিত করার জন্য তিনি বিশ্বের প্রথম আদমশুমারি করে লোক গণনা প্রবর্তন করেন।

সামাজিক সাম্য ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা : হযরত উমর (রা.) সামাজিক সাম্য ও মানবিক মূল্যবোধকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। বিশ্ব মানবের মুক্তিদূত হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ঘোষণা করেছিলেন। দাস মুক্তি আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় কাজ। মহানবির এ বাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উম্মতদের যার কাছে যত দাস ছিল তারা তা মুক্ত করে দেন। পরবর্তীকালে হযরত উমর (রা.) মহানবির (সা.) এর এ বাণী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে সমগ্র ইসলামি রাজ্যে দাসত্ব প্রথার বিলোপ সাধনে তৎপর হন। মাওলানা মুহম্মদ আলী বলেন-'নিশ্চিতরূপে বলা যেতে পারে যে, দাসত্ব প্রথা বিলোপের মূলে গৃহীত বলিষ্ট পদক্ষেপ হযরত উমর (রা.)-এর ব্যবস্থাকে ঐক্য, সাম্য ও মৈত্রির আদর্শে গড়ে তুলেছিলেন।' এতে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় পাওয়া যায়। তার মাধ্যমে কেবল ইসলামেই নহে, বরং পৃথিবীর ইতিহাসে একজন প্রথিতযশা রাজনীতিবিদ মদিনার শাসনভার গ্রহণ করেন।

ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ : হযরত উমর (রা.) এর শাসনামল মুসলিম শিক্ষা, কৃষ্টি ও সভ্যতা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ছিল। খলিফা শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন। শহর হতে গ্রাম পর্যন্ত প্রতিটি স্থানে তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য দৃষ্টি দিয়েছিলেন। ফলশ্রুতিতে প্রতিটি মসজিদ সংলগ্ন স্থানে মক্তব স্থান পেল। মসজিদ মক্তব নামে পরিচিত মক্তবগুলি আজও সারা মুসলিম জাহানের কাছে তাঁর কীর্তি ঘোষণা করছে। উচ্চ শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য তিনি সে যুগের জ্ঞানী গুণীদের বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করেন। ঐতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, মুসলমানগণ কেবল আরবেই নয় সমগ্র বিজিত অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এমন সব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন, যার দৃষ্টান্ত প্রাচীনকালে অথবা খ্রিস্টান রাজ্যেও পাওয়া যায় না।' কুফা, বসরা, ফুসতাত ও মসুল প্রভৃতি শহর তাঁর আমলেই নির্মিত হয়েছিল। ইসলামি শিক্ষা সাংস্কৃতিক বিকাশে ও বিস্তারে এ সকল স্থানের অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। পরবর্তীকালে এসব স্থানে জগদ্বিখ্যাত মনীষীগণ শিক্ষা লাভ করেন। যেমন-বসরায় ইমাম বসরী, কুফার ইমাম আবু হানিফা ও তার শিষ্য ইমাম আবু ইউসুফ প্রমুখ। আল্লামা শিবলী নোমানী বলল-'আমর ইবনুল আস এর শাসনকালে ফুসতাত, কুফা ও বসরা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডারের সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত হয়।'

অন্যান্য ক্ষেত্রে : হযরত উমর (রা.) সমগ্র আরব ও বিজিত দেশকে ১৪ টি প্রদেশে বিভক্ত করে প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন করে শাসনকর্তা (ওয়ালি) নিযুক্ত করেন। প্রশাসনিক পদ্ধতিতে জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাও গৃহীত হয়। অর্থনৈতিক সচলাবস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি সুষ্ঠু রাজস্ব ব্যবস্থার বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেন। শরিয়তের কানুন প্রবর্তন, পুলিশবাহিনী গঠন, জেলখানা স্থাপন, হিজরি সন প্রচলন, সীমান্তদুর্গ নির্মাণ, দিওয়ান প্রতিষ্ঠা, কৃষিব্যবস্থা ও চাষীদের অবস্থার উন্নতি বিধান, নারীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতি কার্যাবলি একজন মহান শাসক হিসেবে তাঁর যোগ্যতা ও কর্মক্ষমতার পরিচয় বহন করে।

এভাবে দেখা যায় যে, হযরত উমর (রা.) শুধু তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যের জন্য নয়, বিখ্যাত বিজেতা, কীর্তিমান শাসক ও বৈপ্লবিক সংস্কারক হিসেবে সমসাময়িক ও পরবর্তী ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। মাত্র ১০ বছরের মধ্যে তাঁর রণনৈপুন্য ও যোগ্যতার জন্য বিশাল পরাক্রমশালী রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণ করায়ত্ব করতে সক্ষম হয়েছিল বিজেতা হিসেবে। তিনি বীর আলেকজান্ডারের সাথে সুবিচারক হিসেবে ইরানের বাদশাহ নওশেরওয়ানের সাথে ও হাদীস বিশারদ হিসেবে হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর সাথে তুলনীয়। তার শাসনব্যবস্থা নিঃসন্দেহে তার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় বহন করে। বহুমুখী প্রতিভা ও অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের জন্য তিনি সর্বকালের ইতিহাসে চির অম্লান হয়ে রয়েছেন।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) এর জীবনী

প্রথম জীবন : ইসলামের ইতিহাসে প্রতিথযশা মহাবীর হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) মক্কায় কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি অন্যান্য কুরাইশদের ন্যায় ইসলামের একজন ঘোরতর শত্রু ছিলেন। অসাধারণ দৈহিক শক্তি ও শৌর্য-বীর্যের জন্য তিনি মক্কায় সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর সৈন্য পরিচালনায় ক্ষিপ্রতা ও আক্রমণের তীব্রতায় শত্রুপক্ষ বেশিক্ষণ সমরক্ষেত্রে টিকতে পারত না। উহুদের যুদ্ধের সময় তিনি কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এবং তার অসীম রণচাতুর্যের ফলে মুসলমানগণ বিজয়লাভের মুখে এসেও অবশেষে সাময়িক পরাজয় বরণ করেন। এসময় হতে মহানবি (সা.) তাঁর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। ৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে হুদায়বিয়ার চুক্তি স্বাক্ষরের পর তিনি আমর ইবন আল আসের সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর ইসলামের সেবায় তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেন।

মহানবি (সা.) এর সময় ইসলামের খেদমত : তাবুক অভিযানে মহানবি (সা.) হযরত খালিদকে সিপাহসালার মনোনীত করেন। এ অভিযানের প্রথম পর্যায়ে মুসলমানগণ ভীষণ প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখিন হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে হযরত খালিদ (রা.) শত্রুব্যূহ ভেদ করে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ পরিচালনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়লাভ করেন। মদিনায় প্রত্যাবর্তন করলে রাসুলুল্লাহ (সা.) বিজয়ী খালিদকে সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর অসি উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর তিনি বিনা রক্তপাতে হারিস গোত্রকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। মহানবি (সা.) এর সময় আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করেন।

রিদ্দার যুদ্ধে তাঁর অবদান : হযরত আবুবকর (রা.) এর খিলাফতে যে ভন্ডনবি ও স্বধর্মত্যাগীদের বিদ্রোহ সমগ্র উপদ্বীপকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিল তা প্রধানত হযরত খালিদের সামরিক তৎপরতায় নির্বাপিত হয়। হযরত ইকরামা ও হযরত সুরাহবিলের ন্যায় সেনাধ্যক্ষগণ মুসায়লামাকে পর্যুদস্ত করতে ব্যর্থ হলেও হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) সমর্থ হন। এছাড়া তোলায়হা, আসওয়াদ ও সাজাহকে বশীভূত করে তিনি আরবদেশে ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেন। ফন ক্রেমারের মতে খালিদের দুঃসাহসিকতা ও আবুবকরের বিজ্ঞতা না থাকলে সেই দিন ইসলামের শত্রুপক্ষ জয়লাভ করত।

পারস্য অভিযানে তাঁর ভূমিকা : হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রা.) এর প্রকৃত বীরত্বের প্রকাশ ঘটে পারসিক ও রোমকদের সাথে সংঘটিত ভয়াবহ যুদ্ধসমূহে। রিদ্দার যুদ্ধের অনতিকাল পরে হযরত আবু বকর (রা.) সেনাপতি হযরত মুসান্নাকে পারসকিদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। ৬৩৩ খ্রিঃ যুদ্ধের গতি বেশি প্রসার লাভ করলে খলিফা দশ হাজার সৈন্যসহ হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে পারস্যে প্রেরণ করেন। হযরত খালিদ (রা.) মুসলিম বাহিনীর সেনাপতিত্ব গ্রহণ করে উলিসের যুদ্ধে হীরারাজ্য জয় করেন। অতঃপর হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্দেশে তিনি সিরিয়া গমন করেন।

রোমানদের সাথে সংঘর্ষে তাঁর ভূমিকা : রোমান সাম্রাজ্যের সিরিয়া অভিযান হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদের অবিস্মরণীয় কীর্তি। ৬৩৪ খ্রি. আজনাদাইনের যুদ্ধে রোমানদেরকে পরাস্ত করে তিনি একে একে দামেস্ক, জর্দান, হিমস প্রভৃতি অঞ্চল ইসলামী সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। হযরত আবু বকর (রা.) এর মৃত্যুর পর হযরত উমর (রা.) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের গতি আরও জোরদার করেন। ৬৩৬ খ্রি. সংঘটিত ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি রোমান বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। রোমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ের এটি ছিল চূড়ান্ত পরাজয়। এ যুদ্ধে তিনি যে শৌর্য-বীর্য, রণকৌশল ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেন এতে তিনি নিঃসন্দেহে সিজার, হানিবল, নেপোলিয়ান, প্রভৃতি বীর চরিত্রের সাথে তুলনীয়। সিরিয়া বিজয়ের পর তিনি দামেস্কের শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন।

অন্যান্য গুণাবলি : শাসক হিসেবেও তিনি সাফল্যের পরিচয় দেন। তাঁর শাসনব্যবস্থার ফলে নববিজিত সিরীয় অঞ্চলসমূহে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। শান্তি ও অশান্তি উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তবে তুলনামূলকভাবে রণাঙ্গনই ছিল তাঁর প্রকৃত প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র। উহুদের যুদ্ধ হতে শুরু করে জীবনে কোনো যুদ্ধেই তিনি পরাজয় বরণ করেননি বা হীনতাজনক সন্ধি স্বাক্ষর করেননি। তাঁর মধ্যে মানবিক গুণেরও অভাব ছিল না। সাহিত্য ও গঠনমূলক কার্যের প্রতি তাঁর প্রশংসনীয় অনুরাগ ছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা.) (৬৪৪-৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ)

প্রাথমিক জীবন ঃ খুলাফায়ে রাশেদিনের তৃতীয় খলিফা ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তিনি কুরাইশ বংশের অন্যতম শাখা উমাইয়া গোত্রে ৫৭৩ (মতান্তরে ৫৭৫) খ্রিঃ জন্মগ্রহণ করেন। হযরত উসমান (রা.) এর পঞ্চম পুরুষ আবদে মানাফের স্তরে রাসুল (সা.) এর বংশের সাথে মিলিত হয়। তার পিতার নাম আফফান এবং মাতার নাম আরওয়া। হযরত উসমানের পারিবারিক নাম ছিল আব্দুল্লাহ ও আবু উমর। হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর দু কন্যা হযরত রুকাইয়া ও হযরত উম্মে কুলসুমকে (রুকাইয়ার মৃত্যুর পর) তিনি বিয়ে করেছেন বলে তাঁকে 'যুন নুরাইন' (দু জ্যোতির অধিকারী) খেতাব দেওয়া হয়।

হযরত উসমান (রা.) এর পরদাদা উমাইয়া ইবনে আবদে শামস কুরাইশ বংশের সরদারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। জাহিলিয়াতের যুগে তাঁর বংশ খুব ক্ষমতাধর ছিল। পরবর্তী কালে উমাইয়া রাজবংশ তার (উমাইয়ার) নাম অনুসারেই রাখা হয়। মক্কা ও কাবা শরীফের কর্তৃত্ব নিয়ে কুরাইশ বংশ-হাশিমী ও উমাইয়া গোত্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হাশিম গোত্রের হওয়ায় উমাইয়া গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত ইসলামের ঘোর শত্রু ছিলেন।

হযরত উসমান (রা.) ছোটবেলায়ই লেখাপড়া শেখেন। কিশোর বয়সে কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যে তিনি খুবই উন্নতি করেছিলেন। এমনকি তিনি সে সময়ে সেরা ধনী ছিলেন, এজন্য তাঁকে সবাই 'উসমান গনী (ধনী) বলে ডাকতেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই খুব নরম স্বভাবের ছিলেন। সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র-মার্জিত রুচির লোক ছিলেন। দান-খয়রাত ও বদান্যতায় তাঁর সুনাম ছিল প্রচুর।

ইসলাম গ্রহণ : রসুলে করিম (সা.) যখন ইসলাম প্রচার করতে শুরু করেন, তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ বছর। একরাতে হযরত উসমান (রা.) স্বপ্নে যেন কারো আদেশ শুনতে পেলেন। 'জেগে ওঠ, ওহে ঘুমন্ত ব্যক্তি, মক্কায় আহমদ আগমন করেছেন।' এ বাণী শ্রবণে তার অন্তর স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় পরিপূর্ণ হয়ে গেলো। তিনি দ্রুত রাসুল করিম (সা.) -এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর চাচা ছিলেন ইসলামের ঘোর দুশমন এ সংবাদ পেয়ে তাঁকে কঠিন শাস্তি দেয়, বেঁধে মারধর করে। কিন্তু তাঁর বিশ্বাসের কোনো নড়চড় হয়নি।

শাহ্ মঈনুদ্দীন আহমদ নদভী বর্ণনা করেন, 'হযরত উসমান (রা.)-এর বয়স যখন ৩৪ বছর তখন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে রাসুল করিম (স.) আবির্ভূত হন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর সাথে হযরত উসমান (রা.)-এর গভীর সম্পর্ক ছিল। হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর দাওয়াতে তাঁর মন ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।'

যুননুরাইন উপাধি লাভ ঃ হযরত উসমান (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) -এর দু কন্যার পাণি গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। রাসুলুল্লাহ (স.) তাঁর মেয়ে হযরত রুকাইয়াকে হযরত উসমান (রা.)-এর নিকট বিবাহ দেন। তিনি মারা গেলে হযরত উসমান (রা.) রাসুলুল্লাহ (সা.) এর দ্বিতীয় মেয়ে হযরত উম্মে কুলসুমকে বিবাহ করেন বলে তাঁকে 'যুন-নুরাইন বা দুটি জ্যোতির অধিকারী খেতাব প্রদান করা হয়। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হযরত উসমান (রা.)-কে এত ভালোবাসতেন যে, দ্বিতীয় মেয়ে হযরত উম্মে কুলসুম ইন্তেকাল করলে নবি করিম (সা.) বলেন যে, 'আমার যদি অন্য একটি কন্যা থাকত, তাহলে আমি তাকেও উসমানের সাথে বিবাহ দিতাম।'

উসমান (রা.) এর অবদান

প্রথম হিজরতকারী খেতাব লাভ

ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারিত হতে লাগল, কাফিরগণ শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিরোধিতা শুরু করল। চাচা হাকাম হযরত উসমান (রা.) কে নানাভাবে কষ্ট দিতে লাগল, সম্মানিত বন্ধু-বান্ধব সকলেই ঘৃণা করতে লাগল। যখন শাস্তির মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে লাগল তখন রাসুল (সা.) উসমান (রা.)-কে তাঁর স্ত্রী হযরত রুকাইয়াসহ অন্যান্য সাহাবি সহকারে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন। হযরত উসমান (রা.) আবিসিনিয়ায় হিজরত করে ইসলামের প্রথম হিজরতকারীর সম্মানে ভূষিত হলেন। তখন ছিল নবুয়তের পঞ্চম বছর। আবিসিনিয়ায় কয়েক বছর অবস্থানের পর কুরাইশদের মিথ্যা খবরে মক্কার অবস্থা সুস্থ মনে করে মক্কায় ফিরে আসেন; কিন্তু এসে ভুল বুঝতে পারলেন। অন্যান্য সাহাবি পুনরায় আবিসিনিয়ায় চলে যান; কিন্তু হযরত উসমান (রা.) মক্কায়ই অবস্থান করেন। অবশেষে মদিনার হিজরতকালে রাসুলুল্লাহ (সা.) এর আদেশে মদিনা চলে যান।

ওহি লেখক :

হযরত উসমান (রা.) ছিলেন প্রথম ওহি লেখক। রাসুলুল্লাহ (সা.) -এর জীবদ্দশায় ওহি লেখার দায়িত্ব তাঁর উপরই ছিল। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) ইসলাম গ্রহণ করার পর তিনি ওহি লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

কূপ ক্রয়, মসজিদ সম্প্রসারণ :

মুহাজিরিন যখন মদিনায় পৌছেন, তখন সেখানের পানির খুব অভাব ছিল। সারা শহরে মাত্র 'বীরে রুমা' নামে এক ইহুদির পানযোগ্য একটি কূপ ছিল । সে এটাকে জীবিকা উপার্জনের উপায় হিসেবে ব্যবহার করছিল। মুহাজিরিনদেরও এতদূর ক্ষমতা ছিল না যে, পানি ক্রয় করে পান করবে। হযরত উসমান (রা.) ১৮ হাজার দিরহামের বিনিময়ে ঐ কূপটি ক্রয় করে মুসলমানদের জন্য ওয়াকফ করে দেন। সে সময় মসজিদে নববি ছোট ছিল। হযরত উসমান (রা.) অনেক উচ্চমূল্যে এর সংলগ্ন জমি ক্রয় করলেন এবং সে অংশ রাসুলুল্লাহ (সা.) -এর জীবদ্দশায় মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যুদ্ধে অংশগ্রহণ :

বদরের যুদ্ধের সময় যেহেতু স্ত্রী হযরত রুকাইয়া (রা.) মারাত্মক রোগাক্রান্ত ছিলেন, তাঁর সেবা করার জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.) হযরত উসমানকে মদিনায় রেখে যান, কিন্তু তাঁকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং গনিমতের অংশও দেওয়া হয়। এভাবে জাতুর রেকার সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যান, তাই তিনি সেই যুদ্ধেও অংশ নিতে পারেননি, এছাড়া সকল যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। যুদ্ধে অর্থ-সম্পদ দানে তিনি সর্বাগ্রে ছিলেন। তিনি অর্থ-সম্পদের দ্বারা রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর অনেক খেদমত করেন। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, প্রত্যেক নবিরই সাথী থাকে, আমার (বেহেশতে) সাথী হবেন উসমান (রা.) তিরমিযী)।

হুদাইবিয়ার সন্ধি

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় রাসুলুল্লাহ (সা.) তাঁকে প্রতিনিধি করে মক্কার কাফিরদের নিকট প্রেরণ করেন। তখন গুজব রটে যে, মক্কাবাসীর হাতে তিনি শহীদ হয়েছেন। হযরত মুহাম্মাদ(সা.)হযরত উসমান (রা.) পক্ষ হতে নিজের এক হাতের উপর অন্য হাত রেখে শপথ করেন। এ শপথের নাম 'বাইআতুর রেদওয়ান'। খাইবারের যুদ্ধে তিনি মুসলিম অধিনায়ক ছিলেন।

খলিফা নির্বাচন

হযরত উমর (রা.)-এর অন্তিমকাল যখন ঘনিয়ে এল, তখন ইসলামি খিলাফতের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। হযরত আবু ওবায়দা (রা.) যদি জীবিত থাকতেন, তাহলে হয়তো তাঁকেই মনোনীত করা হতো; কিন্তু তিনি ইতোপূর্বে পরলোক গমন করেছেন। হযরত আব্দুর রহমান (রা.) অশেষ শ্রদ্ধাভাজন থাকলেও তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের খিলাফতের গুরুদায়িত্ব বহন করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত তালহা এবং হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস প্রমুখ যোগ্য ব্যক্তিগণের মধ্য হতে যেকোনো একজনের উপর এ প্রকার কর্তব্যভার অর্পণ করা যেত। হযরত উসমান (রা.)-এর বয়স ছিল তখন ৭০ বছর। ইসলামের জন্য আর্থিক দান তাঁকে প্রভূত গৌরব দান করেছিল। নবিজীর জামাতা ও চাচাত ভাই হযরত আলী ছিলেন অসাধারণ শক্তিশালী। জ্ঞান-গরিমা, বুদ্ধিমত্তা এবং ধর্মজ্ঞানের জন্য তিনি তৎকালীন মুসলিম সাম্রাজ্যের গৌরবের বস্তু ছিলেন। তিনি প্রথিতযশা পণ্ডিতও ছিলেন। ইসলামের জন্য হযরত তালহা ও হযরত জুবায়ের (রা.) এর দানও ছিল অসামান্য। পারস্য বিজয়ী হযরত সাদও (রা.) একজন প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ব। এরূপে দেখা যায় যে, ইসলামের খেদমতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের অবদান প্রণিধানযোগ্য। তাঁদের মধ্য হতে কোনো একজনের ওপর দায়িত্ব অর্পন করা যেতো।

যখন পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়াল, তখন হযরত উমর (রা.) ইসলামি খিলাফতের খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারটি হযরত উসমান, হযরত আলী, হযরত জুবায়ের, হযরত তালহা, হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হযরত আবদুর রহমান (রা.) কে নিয়ে গঠিত এক নির্বাচনী পরিষদের ওপর ন্যস্ত করলেন। এর থেকে উৎকৃষ্ট ও প্রকৃষ্ট পন্থা আর হতে পারে না। কারণ উক্ত বিষয়টি যদি জনসাধারণের হাতে ছেড়ে দেয়া হত তাহলে গোলমাল ও মতবিরোধের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তাঁদের হযরত উমর (রা.) এর মৃত্যুর তিন দিনের মধ্যে মনোনয়ন কার্য সমাধা করতে হবে।

খলিফা হযরত উমর (রা.) এর মৃত্যুর পর নির্বাচনী পরিষদের পাঁচ জন সভ্য রাজধানী মদিনাতে উপস্থিত থেকে নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করতে লাগলেন। আলোচনা যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছল তখন এই অপ্রীতিকর ও সংকটজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটাবার জন্য হযরত আব্দুর রহমান (রা.) খিলাফতের দাবি ত্যাগ করলেন। হযরত আলী (রা.) ব্যতীত নির্বাচনী পরিষদের অন্যান্য সকল সভ্যই তার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে হযরত আলী (রা.) ও হযরত আবদুর রহমান (রা.) কে খলিফা নির্বাচনের সম্মতি দেন। তদুত্তরে হযরত আবদুর রহমান বললেন যে, যদি তিনি তাঁর নির্বাচন মেনে নেয়, তাহলে তিনি তাঁর মতামত গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন। পরিশেষে হযরত আলী (রা.) সম্মত হলেন। সমগ্র ব্যাপারটি এখন হযরত আব্দুর রহমান (রা.)-এর আয়ত্তাধীন আসল।

হযরত আব্দুর রহমান (রা.) সেদিন বিনিদ্র রজনী যাপন করে নির্বাচনকারী প্রতিটি লোকের গৃহে গমন করলেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করলেন। তিনি দেখলেন যে, অধিকাংশ নির্বাচকমণ্ডলী হযরত উসমান (রা.) এর অনুকূলে। সবশেষে হযরত উসমান (রা.) খিলাফতের দায়িত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত ও অভিষিক্ত হলেন। সকলে তার নিকট আনুগত্যের শপথ করলেন। এ সময় হযরত তালহা (রা.) রাজধানী মদিনাতে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি মদিনায় ফিরে আসলে হযরত উসমান (রা.) তার নিকট নির্বাচন সম্বন্ধীয় সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে, হযরত তালহা (রা.) যদি মনোনয়নের বিরোধিতা করেন, তাহলে তিনি তা প্রত্যাহার করতে রাজি আছেন। হযরত তালহা (রা.) যখন শুনলেন যে, সকলেই হযরত উসমান (রা.) কে খলিফা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তখন তিনিও তাঁর নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করলেন এবং তিনি বলতে লাগলেন ইসলামে ফেতনা সৃষ্টি হোক তা আমি চাই না।

হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ও তার পর্যালোচনা

হযরত উসমান (রা.) ১২ বছর খিলাফত পরিচালনা করেন। এর মধ্যে প্রথম ৬ বছর খুবই শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার মধ্যে চলছিল। এ সময়ে ইসলামি রাষ্ট্রের বেশ বিস্তার ঘটেছিল। তাঁর এ সময়কার শাসনকাল গৌরবময় ছিল। রাজ্য-বিস্তার, আর্থিক প্রাচুর্য, কৃষি-বাণিজ্যের উন্নতি দেশে সুখ সমৃদ্ধি এনেছিল। এ সময় বেশ কিছু বিজয় অর্জিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে অনেক সোনালি গৌরব অর্জিত হয়। মক্কা থেকে কাবুল পর্যন্ত ইসলামের পতাকা উড়তে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ইয়াহুদি চক্রের প্ররোচনায় এ সময় কুচক্রী মহল নিরাপরাধ খলিফার বিরুদ্ধে কিছু অমূলক অভিযোগ এনে দেশের মধ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। অবশেষে তাঁকে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটাই সর্বপ্রথম গৃহযুদ্ধ এবং বিদ্রোহী কর্তৃক একজন খলিফার প্রথম মর্মান্তিক প্রাণনাশ। তাঁর শাহাদাতে ইসলামি দুনিয়ার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে যার জের এখন পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

অভিযোগসমূহ :

হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ আনা হয়, তার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কোনোটাতেই পাওয়া যায় না। যে সকল অমূলক অভিযোগের কারণে তাঁকে জীবন দিতে হল, তা হচ্ছে ঃ

১. যোগ্য ও অভিজ্ঞ শাসনকর্তাদের পরিবর্তে অনভিজ্ঞ আত্মীয়-স্বজনকে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ তথা স্বজনপ্রীতি।

২. আত্মীয়-স্বজনদের বাইতুল মাল হতে অর্থ প্রদান তথা বাইতুল মালের অর্থ অপচয়।

৩. চারণ ভূমি ব্যক্তিগত ব্যবহার।

৪. বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আবুজার-আল-গিফারী (রা.) কে নির্বাসন।

৫. কুরআন শরীফে অগ্নিসংযোগ।

৬. কা'বা শরীফের সম্প্রসারণ।

৭. কারো কারো ভাতা বন্ধ।

অভিযোগসমূহের স্বরূপ পর্যালোচনা :

নিরপেক্ষ আলোচনায় হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত এ সমস্ত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় না। যেমনঃ-

স্বজনপ্রীতি :

হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হচ্ছে তিনি নাকি প্রশাসনে নিরপেক্ষতা বর্জন করে 'স্বজনপ্রীতি' করেছেন। তিনি প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে অভিজ্ঞ ও বিশিষ্ট সাহাবিদের অপসারণ করে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও নিজ বংশের অনভিজ্ঞ লোকদের নিয়োগ দান করেন। প্রকৃতপক্ষে এ অভিযোগ ঠিক নয়। হযরত উসমান (রা.) এমন কিছু যোগ্য লোক বেছে নিয়েছিলেন রাষ্ট্র পরিচালনায় যাঁদের অবদান প্রয়োজন ছিল। ঘটনাক্রমে ঐ সকল লোক তাঁর আত্মীয় হয়ে যাওয়াতে একটি মহল স্বজনপ্রীতির অভিযোগ আনে। আসলে আত্মীয় হলেও তিনি কাউকেও অন্যায়ভাবে অগ্রাধিকার বা শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে রেহাই দেননি। অভিযোগ করা হয় যে, হযরত উসমান (রা.) পূর্ব নির্বাচিত যোগ্য প্রাদেশিক গভর্নরদের অনেককে অপসারণ করে স্বজনপ্রীতির বশে স্বীয় অযোগ্য আত্মীয়দেরকে প্রাদেশিক গভর্নর নিযুক্ত করেন। যেমন হযরত উমর (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত পারস্য বিজয়ী হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-কে অপসারণ করে তাঁর দুধভাই হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। রাসুলে করিম (স.)-এর ঘনিষ্ঠ সাহাবা হযরত আবু মূসা আশয়ারী, হযরত মুঘীরা ইবনে শো'বা, হযরত আমর ইবনুল আ'ছ, হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং হযরত আরকাম (রা.)-কে অপসারণ করে স্বীয় আত্মীয়-স্বজনকে প্রাদেশিক গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন।

হযরত উসমান (রা.) হযরত আবু মূসা আশয়ারীকে কূফা ও বসরার শাসনকর্তা নিযুক্ত করার পর ৬৫০ খ্রিস্টাব্দে মদিনার অধিবাসীগণ তার বিরুদ্ধে কুরাইশদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করার অভিযোগ করলে খলিফা তাঁকে অপসারণ করেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁর পিতৃব্য হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর। পারস্যে বিদ্রোহ দমন করে মার্ভ, নিশাপুর প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে তিনি সামরিক দক্ষতা এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর যোগ্যতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও বিচার ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে খলিফা তাঁকে গভর্নরের মত দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত করেন। মিসর বিজয়ী হযরত আমর ইবনুল আস (রা.)

হযরত উমর (রা.)-এর শাসনকালেই মিসরের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং হযরত উসমানের খিলাফতের চতুর্থ বছর পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু মিসরের রাজস্ব সচিব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি সা'দ-এর সাথে মতবিরোধ দেখা দেওয়ায় খলিফা হযরত আমরকে অপসারণ করেন। তার স্থানে পালিত ভাই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সা'দকে নিযুক্ত করেন। তাঁর দক্ষতা ও বীরত্বপূর্ণ অভিযান ইসলামের আধিপত্যকে উত্তর আফ্রিকায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে। তিনি শক্তিশালী নৌ-বাহিনী গঠন করে বহু অঞ্চল জয় করেছিলেন।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা.) কে হযরত উসমান (রা.) অপসারণ করেননি, তাঁকে হযরত উমর ফারুক (রা.)-ই অপসারণ করে গিয়েছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের অপসারণকে তাঁর সম্পর্কে হযরত উসমানের কিছুটা ভুল বুঝাবুঝির পরিণতি বলে অনেক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন। এ ভুল বুঝাবুঝির জন্য তাঁর দু একজন উপদেষ্টাই দায়ী বলে মনে করা হয়। বায়তুল মাল পরিচালক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আরকামকে বার্ধক্যজনিত কারণে অপসারণ করা হয়েছিল।

কাজেই বুঝা যায় হযরত উসমান (রা.) এর মধ্যে স্বজনপ্রীতির প্রভাব ছিল না, স্বজনপ্রীতি থাকলে তিনি হযরত ওয়ালীদের দোষ চাপা দিয়ে কুফার শাসনকর্তার পদে বহাল রাখতেন। অপর দিকে হযরত সাঈদ ইবনে আ'স (রা.) খলিফার আত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে লিপ্ত ছিল। কাজেই স্বজনপ্রীতির অভিযোগ নিতান্তই অমূলক।

হযরত আবু-জার-আল-গিফারী (রা.) কে নির্বাসন

শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণের প্রশ্নে যে কথাটি বেশি খ্যাত তা হল হযরত আবুজর গিফারী (রা.) কে দেশান্তর করে দেওয়া হয়েছিল এবং হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার (রা.) এর সাথে করা হয়েছিল কঠোর ব্যবহার। এছাড়াও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর ভাতা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

প্রথম ঘটনাটি সত্য নয়। হযরত গিফারী (রা.) কে হযরত উসমান (রা.) দেশ হতে বহিষ্কার করেননি; বরং তিনি নিজেই এক নির্জন স্থানে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃত বিবরণ এই যে, হযরত আবু-জার-আল-গিফারী (রা.) সম্পদের বৈধ সঞ্চয়ের বিরুদ্ধেও বক্তৃতা করতে থাকতেন। এর ফলে শান্তি ও নিরাপত্তা ভঙ্গের আশঙ্কা ছিল। এজন্য হযরত আমীর মুয়াবিয়া (রা.) হযরত উসমান (রা.) কে লিখে পাঠালেন যে, তাঁকে সিরিয়া হতে মদিনায় নিয়ে যাওয়া হোক। হযরত উসমান (রা.) তাঁকে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষে নিজের কাছে ডেকে এনে বললেন, আপনি আমার কাছে থাকুন। আপনার যাবতীয় ভরণ-পোষণের ভার আমি বহন করব। কিন্তু তিনি ছিলেন এক স্বনির্ভর বুযুর্গ। কারো দানের প্রতি তিনি মুখাপেক্ষী ছিলেন না। অতঃপর তিনি মদিনায় একটি নির্জন স্থানে গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। সেখানে দু'বছর অবস্থান করার পর অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসার(রা.) এর সাথেও কোন কঠোরতা অবলম্বন করা হয়নি। তবে যেহেতু তিনি সাবাঈ দলের প্রচারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন, এ কারণে হযরত উসমান (রা.) তাঁকে অবশ্যই অনেক বুঝিয়েছিলেন। আর তাছাড়া এটা কোনো বিশেষ অপরাধের কাজও ছিল না। হযরত উসমান (রা.) রাজনৈতিক কল্যাণার্থে প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের প্রকাশ্য বিচার করতেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর ভাতা বন্ধ করার কারণ হচ্ছে যে, হযরত উসমান (রা.) গোটা মুসলিম উম্মাহকে একই কুরআনের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ রাখার জন্য হযরত আবু বকর (রা.) এর যুগের মাসহাফ পাণ্ডুলিপির কপি ব্যতীত সকল মাসহাফ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ(রা.) এর কাছে একটি স্বতন্ত্র মাসহাফ ছিল। হযরত উসমান(রা.) তাঁর মাসহাফটিও চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তা দিতে অস্বীকার করেন। এ কারণে খলিফাকে কঠোরতার আশ্রয় নিতে হয়েছে।

মূলত গোটা মুসলিম উম্মাহকে কুরআনের একই কপির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে হযরত উসমান (রা.) এর এমন অবদান মুসলিম উম্মাহ কখনো ভুলতে পরবে না। ইবনে মাসউদ(রা.) এর কপিটি তাঁর কাছে যতই প্রিয় থাক না কেন, জাতীয় কল্যাণার্থে হযরত উসমান (রা.) তাঁর কাছে চেয়েছিলেন। সেদিকে লক্ষ রেখে খলিফার হাতে প্রদান করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন কিছুতেই সঙ্গত ছিল না।

বায়তুল মালের অর্থ অপচয়:

হযরত উসমানের বিরুদ্ধে অর্থ অপচয়, আত্মীয়-স্বজনদের অর্থদান ও অমিতব্যয়িতার অভিযোগ করা হয়। যেমন রাসুলুল্লাহ (স.) কর্তৃক তায়েফ– নির্বাসিত হাকাম ইবনুল আসকে মদিনায় আসার অনুমতি দান এবং বায়তুল মাল হতে এক লক্ষ দিরহাম দান। মারওয়ানকে আফ্রিকার মালে গানীমতের এক-পঞ্চমাংশ দান, আবদুল্লাহ ইবনে খালেদকে তিন লক্ষ দিরহাম দান এবং নিজের জন্য বায়তুল মালের অর্থ দ্বারা মূল্যবান অলংকার এবং নিজের জন্য বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ প্রভৃতি।

বায়তুল মাল আত্মসাত করার কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যে বায়তুল মালের জন্য মহান দানশীল হযরত উসমান (রা.) অকাতরে নিজের ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিয়েছেন, তিনি বায়তুল মালের সম্পদের প্রতি লোভ করবেন এটা উদ্ভট কথা। হযরত উসমান (রা.) তাঁর খিলাফত কালেও অনেক সম্পদশালী ব্যক্তি ছিলেন। বায়তুলমাল হতে অর্থ গ্রহণের তাঁর কোনো প্রয়োজনই হত না। বরং তিনি নিজের পাওনাটাও বায়তুল মালে জমা দিয়ে দিতেন।

হযরত উসমান (রা.) যেমন সম্পদশালী ছিলেন, তেমন দানশীলও ছিলেন। কাজেই তিনি ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে আপন আত্মীয়-স্বজনকে প্রচুর সাহায্য করতেন। তাঁর এ খ্যাতিকে ভিত্তি করেই বিদ্রোহীরা বায়তুল মাল আত্মসাতের অভিযোগ বানিয়ে নেয়। এ ভুল বুঝাবুঝি তাঁর সেই ভাষণ থেকেই দূরীভূত হয়ে গিয়েছিল, যেখানে তিনি বলেছিলেন, মানুষ বলে আমি আমার আত্মীয়-স্বজনকে ভালোবাসি এবং তাদেরকে প্রয়োজনীয় অংশসমূহ দিয়ে থাকি। আমি তাদেরকে সাহায্য করে থাকি আমার ব্যক্তিগত অর্থ থেকেই।

বায়তুল মাল তথা সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয় সংক্রান্ত যেসব ঘটনা বর্ণনা করা হয়, তা সম্পূর্ণ বিকৃত তথ্য। প্রকৃত অবস্থায় আপত্তিকর কিছুই নেই। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে খালিদকেও সেই বার উপঢৌকন স্বরূপ পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা দেয়া হয়েছিল। মুসলমানদের পক্ষ হতে আপত্তি উঠলে তিনি তা ফেরত নিয়েছিলেন। কাজেই বায়তুল মালের অপচয়ের অভিযোগ চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়।

সরকারি চারণভূমি ব্যবহার:

খলিফা মদিনার চারণভূমি বায়তুল মালের পশুর জন্য নির্ধারণ করে দেন এবং জনসাধারণের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেন। অভিযোগকারীরা বলে হযরত উসমান (রা.) এ চারণভূমি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। জান্নাতুল বাকী চারণভূমি সংক্রান্ত ঘটনার মূলকথা হল– কোন কোন চারণভূমি হযরত উমর (রা.) যুগ হতে বায়তুল মালের গবাদি পশুর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সেগুলোর বিস্তারিত ব্যাখ্যাও হযরত উসমান (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমি শুধু ঐ সকল চারণভূমিই নির্দিষ্ট বলে ঘোষণা করেছি যেগুলো আমার খিলাফতের অভিষিক্ত হওয়ার আগে নির্দিষ্ট ছিল। আমার নিকট এ মুহূর্তে দুটি উট ছাড়া আর কিছু নেই। অথচ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে আমি আরবের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উট ও বকরির মালিক ছিলাম। হজ্জের সময়ের জন্য রক্ষিত দুটি উট ছাড়া আমার কাছে আর কোনো উট নেই। কাজেই এ অভিযোগ কতো যে অসত্য তা সহজে বুঝা যায়।

কুরআন শরীফ দগ্ধিভূত করার কারণ

হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে যতগুলো অভিযোগ আনয়ন করা হয়েছে পবিত্র কুরআন দগ্ধিকরণ তার মধ্যে অন্যতম। বিরুদ্ধবাদী স্বার্থান্বেষীগণ এ বলে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ছড়াতে থাকে যে, খলিফা হযরত উসমান (রা.) আল্লাহর বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন আগুনে পুড়িয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করেছেন। কুরআন শরীফ ভস্মীভূত করার অভিযোগ সম্পূর্ণরূপেই ভুল ব্যাখ্যা থেকে এসেছে। কেননা হযরত উসমান (রা.) কুরআনের নির্ভুলতা রক্ষার্থে সাহাবাদের পরামর্শক্রমেই বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন শরীফ জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ভুল কুরআনের পাণ্ডুলিপি যেন পৃথিবীতে না থাকে এজন্যই এ কাজটি তিনি করেছেন।

রাসুল (সা.) এর উপর কুরআন একটু একটু করে পূর্ণ ২৩ বছরে অবতীর্ণ হয়, আর ওহি লেখকগণ সাথে সাথেই তা গাছের ছালে, পশুর চামড়ায় এবং পাথরের উপর লিখে রাখতেন। হযরত আবু বকর (রা.) তা থেকে সমস্ত কুরআন শরীফ একত্রিত করে রাখেন এবং ইনতিকালের সময় হযরত হাফসা (রা.) এর নিকট রেখে যান। হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) এর সময় ইসলামি সাম্রাজের বিস্তৃতি সুদূর আফ্রিকা পর্যন্ত পৌঁছে। আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত ছিল, যার কারণে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে শব্দের উচ্চারণ পরিলক্ষিত হতে থাকে। আর নব দীক্ষিত অনারব মুসলমানের জন্য ছিল কুরআন পাঠ করা অধিকতর জটিল। খলিফা হযরত উসমান (রা.) মহাগ্রন্থ আল কুরআন পাঠের এ জটিলতা, উচ্চারণ ও ভাষার পার্থক্য দূর করে বিশ্বের সকল মুসলমান যেন একই পাণ্ডুলিপি অনুসারে কুরআন পাঠ করতে পারে, এজন্য কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেন। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হযরত হাফসা (রা.) এর নিকট হতে সর্বাধিক বিশুদ্ধ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে অনুরূপ আরো ৬টি কপি করা হয়। যার ৪টি কপি বসরা, কুফা, দামেস্ক ও মক্কা এ চার প্রদেশে প্রেরণ করা হয় এবং বাকি ২টি কপি মদিনায় রাখা হয়। আর তাছাড়া বাকি যত পাণ্ডুলিপি যার যার কাছে ছিল সব পুড়িয়ে দেয়া হয়। কুরআন দগ্ধ করার ঘটনা অভিযোগকারীদের জন্য একটি সুযোগ এনে দিয়েছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) ইসলামের পবিত্র গ্রন্থের পবিত্রতা রক্ষার্থেই এ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। বস্তুত এটা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের ইস্যু তো নয়ই; বরং একটি অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব, যার ফলে বিশ্বের সকল মুসলমান একই ধরনের কুরআন শরীফ পড়ছে।

কা'বা শরীফ সম্প্রসারণ

হযরত উমর (রা.) কাবা ঘর সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ করেছিলেন এবং ৬৪৭ খ্রি. হযরত উসমান (রা.) তা সমাপ্ত করেন। এ কাজের জন্য যাদের জমি দখল করা হয়েছিল তারা জমির মূল্য দাবি করে, ইতিপূর্বে যা দাবি করত না। পরে হযরত উসমান (রা.) জমির মূল্য দিতে চাইলে মালিকগণ তা নিতে অস্বীকার করে এবং রাজ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু করে। খলিফা বিশৃঙ্খলাকারীদের কারারুদ্ধ করেন। এতে জনগণ অসন্তুষ্ট হন। আর সুযোগ সন্ধানীরা বলে বেড়ায় হযরত উসমান (রা.) অন্যায়ভাবে জমি দখল করে নিয়েছেন। কাজেই এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই।

অভিযোগ অসত্য প্রমাণিত

শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে যখন অভিযোগ আসতে লাগল, তখন খলিফা অভিযোগকারীদেরকে পরবর্তী হজের সময় তাদের অভিযোগসমূহ নিয়ে উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন। শাসনকর্তাগণ সকলেই আসলেন। কিন্তু কোন অভিযোগকারী সেখানে উপস্থিত হয়নি। এতে অভিযোগের অসত্যতা প্রমাণিত হল। তারপর খলিফা এ ধরনের অনিষ্টকর কার্যাবলির অবসান ঘটাবার জন্য শাসনকর্তাদের একটি বৈঠক আহবান করেন। সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, খলিফা অনিষ্টকর নেতৃবর্গকে কঠোর হাতে

দমন করে বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) ছিলেন শান্তিপ্রিয় লোক। তিনি চাইলেন না যে, তাঁর নিজ স্বার্থের জন্য শত শত জীবন বিনষ্ট হোক। এমনকি নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য তাঁর বাসভবনে দ্বাররক্ষী বা দেহরক্ষী মোতায়েন করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

উপরের পর্যালোচনায় দেখা যায়, হযরত উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগই ছিল ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। হযরত উসমান (রা.)-কে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং ইসলামি সমাজের ক্ষতি সাধন করাই ছিল গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের উদ্দেশ্য। তাই তাদের অধিকাংশ দাবি মেনে নিলেও তারা তাতে সন্তুষ্ট হয়নি। সুতরাং দেখা যায়, খলিফা উসমান (রা.) এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তাঁর হত্যার পেছনে রয়েছে ভিন্ন কারণ।

হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরোক্ষ কারণ

হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষ ৬ বছর ছিল সংকটময়। রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অচলাবস্থা ও গোলযোগপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়। তাঁর বিরোধীরা নানা অজুহাত দেখিয়ে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। অবশেষে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা। ঐতিহাসিকগণ হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের যে সব কারণ চিহ্নিত করেছেন তা হলো-

হযরত উমর (রা.)- এর ইনতিকালের পর মুসলমানদের মধ্যে স্বার্থপরতা, বৈষম্য, গোত্রীয় কোন্দল, ধর্মের প্রতি শৈথিল্যভাব দেখা দেয়। এসবের কারণে হযরত উসমানের খিলাফত কালে নানা রকম অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দেয়। যার ফলে ইসলামের মহান তৃতীয় খলিফার করুণ পরিণতি ঘটে। ঐতিহাসিকগণ পরোক্ষ কারণ হিসেবে নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করতে চান। সে গুলো হলো :

১. গণতান্ত্রিক শাসনের অপব্যবহার : হযরত মুহাম্মদ(সা.) পরামর্শ ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। খুলাফায়ে রাশেদিনের সময়ও তা মেনে চলা হতো। এ ব্যবস্থার সুযোগে অবাধ মেলামেশা, বাক-স্বাধীনতা, সমালোচনা পূর্ণ অধিকার ভোগ করার ফলে বিদ্রোহীরা হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতে নিজ নিজ স্বার্থ হাসিলের জন্য রাষ্ট্রের সর্বত্র অশান্তির দাবানল জ্বালিয়ে দিয়েছিল।

২. আদর্শচ্যুতি ও বিজ্ঞ সাহাবিদের অনুপস্থিতি : হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফত কালের শেষের দিকে বড় বড় বিজ্ঞ সাহাবিগণ ইনতিকাল করতে থাকেন। সাহাবিদের আদর্শ, ত্যাগ ও চরিত্র সাধারণ মানুষের প্রেরণার উৎস ছিল। বড় বড় সাহাবিগণ প্রথম খলিফা ও দ্বিতীয় খলিফাকে প্রশাসন চালাতে নানাভাবে উপদেশ ও সাহায্য করতেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে হযরত উসমান (রা.) এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তাছাড়া যে অল্পসংখ্যক সাহাবি সে সময়ে জীবিত ছিলেন তাঁরাও উসমান (রা.) কে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারেন নি। স্বার্থবাদীরা সুযোগ খুঁজতে থাকে ক্ষমতা দখল করার জন্য। ফলে বিদ্রোহীদেরকে বাধা দান করার মতো লোকের অভাব ছিল।

৩. হাশেমী ও উমাইয়া দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি : মহানবি(সা.) এর আবির্ভাবের আগে থেকেই হাশেমী ও উমাইয়া দ্বন্দ্ব চলছিল। রাসুলের আগমনে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) এর সময়ে তা তেমন মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে নি। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) খিলাফতের দায়িত্বে আসার পর কিছু কিছু দুর্বল কারণে উভয় বংশের লোকদের মধ্যে ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা ও বিদ্বেষ দেখা দেয়। হযরত উসমান (রা.) এর বংশের কেউ কেউ দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত হলে এটাকে স্বজনপ্রীতি বলে অভিযোগ তোলা হয়। এরই সূত্র ধরে পরবর্তী সময়ে বিদ্রোহীরা হাশেমী ও উমাইয়াদের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়াতে সক্ষম হয়।

৪. কুরাইশ ও অ-কুরাইশদের মধ্যে দ্বন্দ্ব : ইসলামের বিজয় অভিযানে এবং অন্যান্য সকল কাজে সাধারণ মুসলমানগণ কুরাইশদের সাথে এক সাথে কাজ করে। হযরত উসমান (রা.) হযরত উমর (রা.) এর নীতি পরিবর্তন করে কুরাইশদের আরবের বাইরে বিজিত অঞ্চলে জমি-জমা খরিদ করার সুযোগ দেন। এতে কুরাইশ ও অকুরাইশ জমি মালিকদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। বসরা ও কুফায় এ দ্বন্দ্ব চরম আকার ধারণ করে। বিদ্রোহীরা সুযোগ বুঝে সাধারণ মুসলমানদের ক্ষেপিয়ে তোলে। কিন্তু খলিফার সঙ্কটজনক সময়ে কুরাইশগণ খলিফাকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাহায্য করেন নি; বরং হাশেমী গোত্রের অনেকটা অসহযোগিতা বিদ্রোহীদেরকেই উৎসাহিত করে।

৫. অমুসলিম সম্প্রদায়ে অসন্তোষ : ইসলামের উন্নতি ও অগ্রযাত্রায় ইহুদি, খ্রিস্টান ও অগ্নিপূজকেরা ভালো চোখে দেখেননি। পূর্ণ ধর্মীয় ও নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও এরা সব সময় ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করে। হযরত উসমান (রা.) এর সময়ে তারা বিদ্রোহীদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্রে যোগদান করে।

৬. আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে বিভেদ : হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) এর সময়ে আনসার-মুহাজির নির্বিশেষে সকলেই সমানভাবে ইসলামের খেদমতে অবদান রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও সংহতি পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল, কোনো রকম বিভেদ দেখা দেয়নি। হযরত উসমানের সময়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুহাজিররা অবহেলিত হয় এবং তারা মজলিস উস-খাস-এর সদস্যপদ হতে বঞ্চিত থাকে। এতে তাঁদের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি হয়।

৭. হযরত উসমান (রা.) এর উদারতা : খলিফা হযরত উসমান (রা.) এর উদারতা ও সরলতা তাঁর বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। অনেক সময় ঘোর অপরাধীকেও শাস্তি না দিয়ে তিনি ক্ষমা করে দিতেন। এ উদারতার সুযোগে দুষ্কৃতকারীরা বিদ্রোহের সাহস পায়। মানুষকে তিনি অবিশ্বাস করতে পারেন নি। তিনি অপরাধী ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে শাস্তি বিধানে সমর্থ হলে তাঁর এ নির্মম পরিণতি হতো না। ধর্মপরায়ণ ও সৎলোক হলেও তিনি খুব নরম চরিত্রের লোক ছিলেন, অনর্থক দুঃখ, কষ্ট ও রক্তক্ষয় তিনি পছন্দ করতেন না। এমনকি বিরোধিদের সাথে কঠোর ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ না নিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে সবকিছু মীমাংসা করতে চাইতেন। কাজেই তাঁর উদারতার সুযোগ বুঝে বিদ্রোহীরা সর্বত্র বিশৃঙ্খলার আগুন জ্বালাতে থাকে। আমীর আলী ও বার্নড লুইস বলেনঃ 'তাঁর দুর্বলতা ছিল যে তিনি বিদ্রোহের কারণ অনুধাবন, নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিকারে অসমর্থ ছিলেন।'

৮. কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ : অবস্থার পরিবর্তন ও কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বিদ্রোহের অন্যতম কারণ ছিল। কেন্দ্রীয় শাসন অনভ্যস্ত দুরন্ত আরবদের কাছে ভালো লাগেনি। তাছাড়া হযরত উসমানের সময়ে বিজয় অভিযান বন্ধ রাখা হয়। যুদ্ধ বন্ধ হওয়াতে তাদের অলসভাবে কাটাতে হয়, যা তারা পছন্দ করত না। এছাড়া যুদ্ধ থাকলে বিজয়ের সাথে সাথে প্রচুর অর্থ-সম্পদ পাওয়া যেত- তাও বন্ধ হয়ে যায়। তাছাড়া তাদের আয়ের অন্যতম উৎস 'ফাইভূমি' হযরত উমর (রা.)-এর সময় রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে যায়। এ কারণে আরব যোদ্ধারা অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে এবং ফাইভূমির সমস্ত আয় দাবি করে। হযরত উসমান (রা.) পূর্ববর্তী খলিফার রাজস্ব নীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু আরব যোদ্ধাদের ঐ দাবি মেনে নিতে পারলেন না। ফলে তাদের অসন্তোষ বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। বার্নাল লুইস এ ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন যে, 'এ বিদ্রোহ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যাযাবরদের বিদ্রোহ, যা কেবল উসমান এর খিলাফতের বিরুদ্ধে নয়, যেকোনো ব্যক্তির পরিচালিত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ।'

হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার ঘটনা

পূর্বে উল্লিখিত কারণসমূহে হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষের দিকে দেশময় গোলযোগ বাড়তে থাকে। হযরত উসমান (রা.) সমস্ত গভর্নরদের এক পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। মতবিরোধ নিরসনের উপায় বের করাই ছিল এ পরামর্শ সভার মূল লক্ষ্য। গভর্নরগণ সমবেত হন, অধিকাংশ গভর্নরই বিদ্রোহীদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনের কথা বলেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) বলেন, এটা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। আমি যথাসম্ভব কোমলতা ও ক্ষমতাশীলতার সাথে চেষ্টা করব। আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে বলেন– আপনি মদিনা ছেড়ে আমার সাথে সিরিয়া চলুন। অন্যথায় ভয়াবহ বিপদ দেখা দিতে পারে। তিনি জবাব দেন 'আমার মাথা কাটা গেলেও আমি প্রিয় নবি (সা.)-এর মদিনা ছেড়ে যাব না।' মুয়াবিয়া (রা.) বলেন, নিরাপত্তা বাহিনী পাঠিয়ে দেই। হযরত উসমান (রা.) বলেন, 'আমার কাছে নবির প্রতিবেশীদের কষ্ট দেওয়াও পছন্দ নয়।' এভাবে তিনি গর্ভনরদের বিদায় করে দিলেন।

এদিকে বিদ্রোহীরা ঠিক করে পরামর্শ সভা থেকে গভর্নররা ফিরে এলে তারা তাঁদেরকে প্রদেশসমূহে প্রবেশ করতে দেবে না। এভাবে তারা গণবিদ্রোহ শুরু করবে। তাদের ষড়যন্ত্র সফল হল না। তবে কূফার গভর্নর হযরত সাইদ ইবনুল আস (রা.) কে কূফায় প্রবেশ করতে দিল না। হযরত উসমান (রা.) কুফা বাসীদের ইচ্ছানুসারে হযরত আবু মুসা আশআরীকে কুফায় গভর্নর নিযুক্ত করেন।

গভর্নরদের ফিরে যাওয়ার পর হযরত উসমান (রা.) কেন্দ্র থেকে তদন্ত দল প্রত্যেক প্রদেশে পাঠান। মিসর ব্যতীত অন্যসব প্রদেশের তদন্ত রিপোর্ট বিদ্রোহীদের বিপক্ষে গেল। এসময় হঠাৎ মিসরের কিছু লোক মদিনায় এসে খলিফার কাছে মিসরের শাসক আবদুল্লাহ ইবনে আবী সারাহর নির্যাতনের অভিযোগ পেশ করে। হযরত উসমান (রা.) মিসরের শাসককে তিরস্কার করে চিঠি লেখেন। এতে ক্ষমা প্রার্থনা বা ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হওয়ার পরিবর্তে সে অভিযোগকারীদের নির্মমভাবে প্রহার করল। ফলে একজন মারা গেল।

এ ঘটনার প্রতিবাদে ৬২৬ খ্রিঃ মিসর থেকে প্রায় সাতশ লোক মদিনায় গিয়ে মসজিদে নববিতে নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করে। একই সময় বসরা ও কূফার বিদ্রোহীরাও এসে জমায়েত হলো গোলযোগ ব্যাপক আকার ধারণ করে। হযরত উসমান (রা.) গোলযোগ নিরসন ও জনগণের যথার্থ অভিযোগের প্রতিবিধান করতে সব সময়ই তৈরি ছিলেন। তিনি এ জনসমাবেশের খবর শুনে হযরত আলী (রা.)-কে ডেকে বললেন, আপনি এসব লোককে বুঝিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিন। আমি তাদের ন্যায্য দাবিসমূহ মেনে নিতে প্রস্তুত আছি।

তিনি মিসরের গভর্নর আব্দুললাহ ইবনে আবী সারাহকে পদচ্যুত করে মিসরীয় প্রতিনিধি দলের ইচ্ছানুসারে তার স্থানে হযরত মুহম্মদ ইবনে আবু বকর (রা.)-কে মিসরের গভর্নর নিয়োগ করেন। এতে বিদ্রোহীরা ফিরে যায়। ঘটনা তদন্তের জন্য মুহাজির ও আনসারদের একটি দলও তাদের সাথে মিসর যাত্রা করে। জুমআর দিন হযরত উসমান (রা.) মসজিদে ভাষণ দিলেন এবং বিস্তারিতভাবে তাঁর সংস্কার পরিকল্পনা ও ভবিষৎ কর্মপন্থা তুলে ধরলেন। লোকজন সবাই আনন্দিত হলো এই ভেবে যে, এখন বিরোধ ও বিপর্যয়ের সমাপ্তি ঘটবে।

মিসরীয় প্রতিনিধি দলটি মদিনা থেকে রওয়ানা হয়ে সবেমাত্র তিন মাইল পথ এগিয়ে গেছে। এমন সময় দেখা গেল একজন হাবশী দাস উটের পিঠে চড়ে অতি দ্রুত মিসরের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সন্দেহ হওয়ায় তাকে পাকড়াও করা হল। সে বলল আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রা.) আমাকে মিসরের গভর্নরের কাছে পাঠিয়েছেন। তার কথায় সন্দেহ দেখা দিল। দেহ তল্লাশি করে তার নিকট হযরত উসমানের সীল মোহরকৃত গভর্নর ইবনে আবী সারাহকে দেয়ার জন্য একটি চিঠি পাওয়া গেল। তাতে লেখা ছিল মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর (রা.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করে ফেল। এ চিঠি দেখে মুহম্মদ ইবনে আবু বকর (রা.)

ও অন্যান্যরা উত্তেজিত হয়ে মদিনায় ফিরে আসেন। হযরত তালহা, জুবাইর, সাদ ও আলী (রা.)-কে ডেকে চিঠি দেখান। তারা সবাই চিঠি, উট ও দাসটিকে নিয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে গেলেন। হযরত উসমান (রা.) কসম (শপথ) করে চিঠি অস্বীকার করলেন, পরে জানা গেল, পত্রদাতা হচ্ছে মারওয়ান। হযরত উসমান (রা.) এর ব্যাপারে সবাই সন্দেহমুক্ত হলেন।

কিন্তু বিদ্রোহীরা দাবি করে বসল যে, মারওয়ানকে আমাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হোক। হযরত উসমান (রা.) তা করতে রাজি হলেন না। এ পরিস্থিতিতে উত্তেজনা বেড়ে চলে। এবার বিদ্রোহীরা খলীফার অপসারন দাবি করে বসল, উত্তরে তিনি বললেন : 'আমার মধ্যে জীবন থাকতে আমি আল্লাহর দেয়া খিলাফত নিজ হাতে খুলে ফেলবো না এবং মহানবি (সা.) এর অসীয়ত মতো শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ধৈর্য অবলম্বন করব।'

এরপর বিদ্রোহীরা অত্যন্ত কঠোরভাবে হযরত উসমানের বাসভবন অবরোধ করে রাখল। অবরোধ ৪০ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকল এবং তাঁর বাড়িতে পানি পর্যন্ত পৌছানো নিষেধ করে দেয়া হল। হযরত আলী (রা.) অনেক কষ্টে কয়েকবার পানি পৌছান। হযরত উসমান (রা.) বারবার বিদ্রোহীদের বুঝানোর চেষ্টা করেন, মর্মস্পর্শী ভাষণ দেন। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাতে কোনো রকম সাড়া দেয়নি। ভক্ত-অনুরক্ত এবং আনসার ও মুহাজিরগণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তাদেরকে সে অনুমতিও দেননি।

হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত জুবাইর ও হযরত সাদ (রা.) প্রমুখ তাঁদের কর্তব্য স্থির করতে পারছিলেন না। কারণ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অনুমতি নেই তাঁরা তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু খলিফার পদত্যাগ অথবা মারওয়ানকে হস্তান্তর ছাড়া তারা তাদের স্থান ত্যাগ করতে রাজি হয় নি। অবশেষে বাধ্য হয়ে হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত জুবাইর (রা.) তাদের ছেলেদেরকে সশস্ত্র অবস্থায় হযরত উসমানের বাড়ি পাহারায় মোতায়েন করেন। প্রতিরোধ করতে গিয়ে ইমাম হাসান (রা.) আঘাতপ্রাপ্ত হলেও আপন জায়গায় অনড় থাকেন। কাউকে ভেতরে প্রবেশ করতে দিলেন না।

বিদ্রোহীরা দেখলেন, হজ্জের মওসুম শেষ হয়েছে। লোকজন শীঘ্রই মদিনায় ফিরে আসবে এবং সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তারা সম্মুখের দরজা দিয়ে ঢুকতে না পেরে প্রাচীর টপকিয়ে ছাদে ওঠে হযরত উসমান (রা.)-এর কাছে গিয়ে পৌছে। এদের সামনে ছিল মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর। তিনি হযরত উসমান (রা.)-এর দাড়ি ধরে টান দেন। হযরত উসমার (রা.) বললেন ভাতিজা তোমার পিতা হযরত আবু বকর (রা.) যদি বেঁচে থাকতেন, তা হলে এদৃশ্য মোটেই পছন্দ করতেন না। একথা শোনামাত্র তিনি ফিরে যান। অন্যরা অগ্রসর হয়ে হামলা চালায়, একজন লোহার খণ্ড ও দ্বিতীয় জন বর্শা দিয়ে আঘাত করে। তখন তিনি কুরআন শরীফ পাঠ করছিলেন। তৃতীয়জন তরবারি দিয়ে আঘাত করে। স্ত্রী হযরত নায়েলা হাত দিয়ে তা ঠেকাতে গেলে তাঁর তিনটি আঙ্গুল কেটে পড়ে যায়। তরবারির দ্বিতীয় আঘাতে হযরত উসমান (রা.)-এর জীবন প্রদীপ নিভে যায়। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

৩৫ হিজরির ১৮ যিলহাজ্জ জুমআর দিন আসরের সময় মোতাবেক ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন তারিখে হযরত উসমান (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। লাশ দুদিন পর্যন্ত দাফনহীন অবস্থায় পড়ে থাকে, বিদ্রোহীদের ভয়ে কেউ অগ্রসর হওয়ার সাহস করল না। শনিবার রাতে কিছুসংখ্যক মুসলমান জীবন বাজি রেখে জানাযা আদায় করে জান্নাতুল বাকির পেছনে তাঁর দেহ মোবারক দাফন করেন। হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ড ইসলামের ইতিহাসে একটি বেদনাবিধুর ঘটনা। তাঁর শাহাদাত ইসলামের ইতিহাসে সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এটি একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ঘটনা এবং তা ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসের ধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।

খিলাফতের মর্যাদাহানি :

খিলাফত একটি পবিত্র আসন, কিন্তু হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার ফলে খিলাফত ও খলিফার প্রতি জনসাধারণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভক্তি শিথিল হয়ে যায়। বার্নার্ড জিওস বলেন, 'বিদ্রোহী কর্তৃক খলিফার হত্যাতে যে বেদনাবিধূর দৃষ্টান্তের সৃষ্টি হয়, তা ইসলামের ঐতিহ্যের প্রতীক, খিলাফতের ধর্মীয় ও নৈতিক মর্যাদাকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করেছিল।' নিরস্ত্র খলিফাকে বিদ্রোহীরা হত্যা করে খিলাফতের প্রতি চরম অবমাননা প্রদর্শন করে। খলিফা ও খিলাফতের প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা কমে আসে। ঐতিহাসিক খোদাবক্স বলেন, ' এ হত্যাকাণ্ড সর্বকালের জন্য খলিফার ব্যক্তিগত পবিত্রতা নষ্ট করে।'

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি :

হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের ফলে ইসলামের একতা বিনষ্ট হয়। বিভিন্ন কার্যাবলির প্রতিবাদে এবং হত্যার প্রতিবাদে যে সকল মতবাদ ও দল-উপদলের উদ্ভব হয়, তা পরবর্তীকাল মুসলিম উম্মাহকে শতধা বিভক্ত করে। মুসলিম জাতি শিয়া, সুন্নি, খারেজি, রাফেজি প্রভৃতি বিভিন্ন ফিরকা বা উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়।

ঐক্য বিনষ্ট :

হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকাণ্ডের ফলে মুসলমানদের মধ্যে যে ঐক্য, সম্প্রীতি ও সংহতি ছিল, তা বিনষ্ট হতে শুরু করল। এর ফলে ইসলামি মূল্যবোধের অবক্ষয়ের সূত্রপাত ঘটে। সহনশীলতা ও ধৈর্য পরস্পরের প্রতি আস্থা ও মমত্ববোধ এবং ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হতে থাকে। আরব-অনারব, কুরাইশ, অকুরাইশদের বিরোধের জন্ম দেয়। এ হত্যাকাণ্ড মক্কার হাশেমী ও উমাইয়াদের মধ্যে সুদূরপ্রসারী বিভেদের সৃষ্টি করে। এর ফলে উমাইয়া বংশের সিরিয়ার শাসনকর্তা আমীরে মুয়াবিয়া মদিনার কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার প্রতিশোধ ও বিচারের অজুহাতে গৃহযুদ্ধের সূচনা করেন। অবশেষে আমীরে মুয়াবিয়া রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে খিলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন।

গৃহযুদ্ধের সূচনা :

এ হত্যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে নাশকতামূলক অন্তর্দ্বন্দ্বের উদ্ভব হয়। হযরাত উসমান (রা.) এর হত্যা ছিল গৃহযুদ্ধের বিপদ সংকেত। হযরত আলী (রা.) এর খিলাফতে যে কয়টি গৃহযুদ্ধ হয় তা এ হত্যাকাণ্ডেরই প্রতিক্রিয়া। উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠা এবং পতনের পরও এ দ্বন্দ্বের অবসান হয়নি।

মদিনার প্রাধান্য লোপ :

এরপর থেকে মদিনার প্রাধান্য লোপ পায়। কেননা পরবর্তী খলিফাগণ সুবিধামত রাজধানীকে কুফা, দামেস্ক, বাগদাদ, কায়রো এবং কর্ডোভায় স্থানান্তর করেন। ফলে মদিনার রাজনৈতিক মর্যাদা কমে যায়। মদিনা একটি পবিত্র ধর্মীয় নগরী হিসাবে পরিগণিত হয়।

ইসলামি গণতন্ত্রের বিলুপ্তির সূচনা :

হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের পরবর্তী সময়ে যে সকল রাজনৈতিক হট্টগোল দেখা দেয়, তাতে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ ধীরে ধীরে রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করতে থাকেন এবং হযরত আলী (রা.) এর খিলাফতের অবসানের সাথে সাথে ইসলামি গণতন্ত্রের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং রাজতন্ত্রের উত্থান শুরু হয়।

সামগ্রিক বিবেচনায় হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকাণ্ডের পেছনে কুচক্রী মহলের কারসাজিই কাজ করেছে। ফলে ইসলামি বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে, যার খেসারত মুসলমান কখনও শোধ করতে পারে নি।

হযরত উসমান (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

চরিত্র : ইসলাম ও রাসুলের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন হযরত উসমান (রা.)। তাঁর অনুপম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কর্মাদর্শের কারণে ইসলামের ইতিহাসে তিনি এক বিশেষ আসন দখল করে আছেন। তিনি ১২ বছর খিলাফত পরিচালনা করে ৮২ বছর বয়সে ১৭ জুন, ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দে বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাত বরণ করেন। তিনি মধ্যমাকৃতির, শ্মশ্রুমণ্ডিত সুপুরুষ ছিলেন।

মহানবি (সা.) এর নিত্য সঙ্গী : হযরত উসমান (রা.) মহানবি (সা.) এর সার্বক্ষণিক সঙ্গী হয়ে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সকল সংকটে ও বিপদে তিনি রাসুলের পাশে ছিলেন।

দানশীল ব্যক্তি : হযরত উসমান (রা.) ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী। ইসলাম প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে তিনি অকাতরে অর্থ-সম্পদ দান করেন। এক্ষেত্রে তিনি সর্বকালের বিত্তশালী লোকদের জন্য আদর্শ।

দেশত্যাগ : ইসলাম গ্রহণ করায় স্বজাতির লোকের সীমাহীন নির্যাতন চালালে তিনি নির্যাতিত বহু সাহাবিকে নিয়ে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তারপর মহানবি (সা.) এর পূর্বে মদিনায়ও হিজরত করেন।

যুদ্ধ-জিহাদ দান : হযরত উসমান (রা.) ইসলামের দুর্দিনে বিভিন্ন যুদ্ধের সময় অকাতরে দান করতেন। তাবুক যুদ্ধে তিনি ১০০০ দিরহাম দান করেন। রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য এক হাজার উট দান করেন।

মসজিদে নববির সম্প্রসারণ : স্থান সংকুলান না হওয়ায় মহানবি (সা.) মসজিদে নববির সম্প্রসারণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তিনি মসজিদ সংলগ্ন জমি ক্রয় করে এর সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন।

দুস্থ ও দাসদের সেবা : তিনি দুস্থ মানবতার সেবায় অর্থ ব্যয় করতেন। দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য বিতরণ করতেন। তিনি মুসলিম দাসদেরকে অত্যাচারী মনিবদের কাছ থেকে ক্রয় করে আযাদ করে দিতেন।

কুরআন সংকলন : হযরত উসমান (রা.)-এর সবচেয়ে বড় অবদান পবিত্র কুরআনের বিশুদ্ধ সংকলন। ইসলামী সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির ফলে বহু অনারব ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয়। সেসব জাতির লোকেরা আরবি শব্দের সঠিক উচ্চারণ করতে পারত না। তাছাড়া আঞ্চলিক ভাষায় কুরআন পাঠের অনুমতি থাকায় বিশুদ্ধ কুরআনের বিশুদ্ধ সংকলন করার ব্যবস্থা করেন এবং অধিকতর সাবধানতার জন্য আঞ্চলিক ভাষার কুরআনের পাঠগুলো জ্বালিয়ে দেন। এ অমর অবদানের জন্য তাঁকে মুসলিম উম্মাহ 'জামিউল কুরআন' বা 'কুরআন সংকলন কারী' উপাধিতে ভূষিত করে। হযরত উসমান (রা.) ছিলেন ইসলামের জন্য

নিবেদিত প্রাণ। তিনি আজীবন ইসলামের খেদমতে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছেন। এমনকি খিলাফতের শেষের দিকে রাষ্ট্রের সংহতি ও ইসলামি ভ্রাতৃত্ব অটুট রাখার জন্য নিজের জীবন দান করে গেছেন। জগতের ইতিহাসে এর তুলনা বিরল।

ধর্মনিষ্ঠা ও সততা : হযরত উসমান (রা.) ছিলেন একজন ধর্মপরায়ণ, ন্যায়নিষ্ঠ ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তি। তাঁর সততা, দানশীলতা, ধর্মভীরুতা এবং বিনয়ের জন্য তিনি ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। জন্মগতভাবেই তিনি ছিলেন কোমল হৃদয়ের অধিকারী। নিরহংকারী, বিনয়ী, আমানতদার, দানশীল হিসেবে তিনি মহানবি (সা.) এর প্রিয়পাত্র ছিলেন। মিথ্যা ও পাপাচার হতে তিনি ছিলেন পবিত্র এবং আল্লাহর ভয়ে সবসময় তাঁর চোখ সজল থাকত। অবসর সময়ে আল্লাহর এবাদাতে মগ্ন থাকতেন।

সহজ-সরল ও দয়ালু মানুষ : তিনি ছিলেন খুব সহজ-সরল দয়ালু মানুষ। তিনি অতিরিক্ত উদার, স্নেহপ্রবণ এবং অমায়িক ছিলেন। এজন্য গুরুতর অপরাধীকেও ক্ষমা করে দিতেন। প্রয়োজনের সময়ও তিনি কারো প্রতি কঠোর হতে পারেন নি। তাঁর সরলতার সুযোগে অসৎ ও দুষ্ট লোকেরা তাদের স্বার্থসিদ্ধ করেছিল। আসলে তাঁর মতো জনদরদী, দীন-দুঃখীর বন্ধু, প্রজাবৎসল শাসক পৃথিবীতে বিরল। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক মহান খলিফা।

নম্র ও ভদ্র : মহানবি (সা.) এর একটি বাক্যে হযরত উসমানের চরিত্র চিত্রিত করা যায়। তিনি বলেন, 'আমার সাহাবিদের মধ্যে উসমান (রা.) সবচেয়ে নম্র ও লজ্জাশীল।' বস্তুত হযরত উসমান (রা.) এর চরিত্রে বিনয়, ধৈর্য, সততা, সারল্য, সহনশীলতা, ন্যায়নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা, বিশ্বাস প্রভৃতি গুণাবলির সমাবেশ ঘটেছিল। তিনি এত প্রিয় ছিলেন যে, তাঁর দুটি কন্যার ইনতিকালের পরও অপর কোনো কন্যা থাকলে উসমানের সাথে বিয়ে দিতেন বলে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আরবের শ্রেষ্ঠ ধনী হয়েও তিনি দীন-হীন ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। খলিফা হিসেবে বাইতুল মাল হতে এক কপর্দকও গ্রহণ করেন নি। ইসলামের উদ্দেশ্যে তাঁর যথাসর্বস্ব অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন।

ধৈর্য ও সহনশীলতার মূর্ত প্রতীক : রাষ্ট্রের সংহতি অটুট ও মুসলিম ভ্রাতৃত্ব অক্ষুন্ন রাখার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর যথাসর্বস্ব অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন। অন্যের রক্তপাত অপেক্ষা নিজ জীবন কুরবানির মাধ্যমে তিনি যে মহান ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের নজীর স্থাপন করেছেন, জগতের ইতিহাসে এর তুলনা বিরল। তিনি ছিলেন ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতীক। তিনি অপরাধীকেও খুব অনুকম্পা প্রদর্শন করতেন। এ সুযোগে চতুর ও স্বার্থন্বেষী মারওয়ান তাঁর খিলাফতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ পায়। মারওয়ানের কুচক্রান্তের ফলেই চতুর্দিকে বিদ্রোহ দেখা দেয়। তা তিনি কঠোর হস্তে দমন না করে অত্যধিক স্নেহ ও উদারতা প্রদর্শন করেন, যা তাঁর জীবনে চরম দুর্যোগ নিয়ে আসে। কোমল হৃদয়ের অধিকারী হযরত উসমান (রা.) এর চরিত্র ছিল অগণিত গুণাবলিতে ভাস্বর।

হযরত উসমান (রা.) এর শাসন ব্যবস্থা ও কৃতিত্ব

আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রা.) খিলাফতের দিক হতে সফল খলিফা ছিলেন। তাঁর খিলাফতের প্রথম দিকে হযরত উমর (রা.) এর আমলে বিজিত অনেক অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। হযরত উসমান (রা.) তা দৃঢ়তার সাথে দমন করে বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। তিনি বিরাট নৌ-বহর তৈরি করেন, যার দ্বারা অনেক উপদ্বীপ জয় করেন। তিনি বিজিত অঞ্চলে শাসন ব্যবস্থা এমন সুদৃঢ় করেছিলেন যে, মুসলমানদের গৃহবিবাদের সময়ও সেসব অঞ্চল বিদ্রোহ করতে সাহস পায়নি।

সুযোগ্য শাসক : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামি শাসন শুরু হয়। ফারুকে আযম (রা.) একে পরিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক করেন। এ নীতি হযরত উসমানের খিলাফতে বহাল ছিল। কিন্তু উমাইয়াদের প্রভাবে তাতে পরিবর্তন ঘটে। মারওয়ান হযরত উসমান (রা.) এর নমনীয়তা ও ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে প্রশাসনে পুরোপুরি অবৈধ প্রভাব খাটিয়েছিল। তবুও কোনো ব্যাপারে হযরত উসমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি তা তৎক্ষণাৎ সমাধান দিতে সচেষ্ট হতেন। জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণ এবং শাসকদের দোষত্রুটি শোধরাবার প্রতি তিনি মনোযোগী ছিলেন। জনমতের প্রতি সদা দৃষ্টি রাখতেন।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ : রাষ্ট্রীয় সীমানা বিরাট হওয়ায় প্রদেশগুলোকে শাসনের সুবিধার্থে আরও কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন। সিরিয়াকে তিনটি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত করেন। সাইপ্রাস, আরমেনিয়া ও তিবরিস্তানকে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ ঘোষণা করেন। সকল প্রদেশের মধ্যে পাঁচটি ছিল সবচেয়ে বড় প্রদেশ। এগুলোতে সেনাবাহিনীর প্রধান দপ্তর ছিল। অন্যান্য প্রদেশ এদের অধীন ছিল। যদিও সকল প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন গভর্নর (ওয়ালি) থাকতো। কিন্তু বড় পাঁচটি প্রদেশের গভর্নরদের মর্যাদা ছিল গভর্নর জেনারেলের।

সুষ্ঠু বায়তুল মাল ব্যবস্থা : হযরত উসমান (রা.) সুষ্ঠু বায়তুল মাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে হযরত ওকবা ইবনে আমরকে এর তত্ত্বাবধানে এবং হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেতকে বিচারপতি (কাজি) নিযুক্ত করেন। এছাড়া শাসকদের কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য হযরত মুহম্মদ ইবনে মোছলেমা এবং হযরত উসামা ইবনে যায়েদাকে নিযুক্ত করেন।

পূর্ববর্তী খলিফার নীতি অনুসরণ : হযরত উমর (রা.) রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি যেভাবে নির্ধারণ করেছিলেন, হযরত উসমান (রা.) সেভাবেই রাখেন। বিভিন্ন বিভাগ ও উপবিভাগগুলোর উৎকর্ষ সাধন করেন। বৃত্তিসমূহ বাড়িয়ে দেয়া হয়। তাঁর সময় দেশে অর্থ-সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। সাধারণভাবে জনসাধারণ সুখ-শান্তিতে বসবাস করত।

জনহিতকর কার্যাবলী : তাঁর সময় স্থাপত্য শিল্পের অগ্রগতি হয়। বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন দফতরের জন্য প্রাসাদ তৈরি করা হয়। জনকল্যাণের জন্য সড়ক, গৃহ, মসজিদ, মোসাফিরখানা, অতিথি শালা স্থাপন করেন। খায়বরের দিক হতে মাঝে মাঝে জলোচ্ছ্বাস আসত, এর ফলে জনসাধারণকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হত। হযরত উসমান (রা.) মদিনার কিছু দূরে মাহজুর নামক স্থানে একটি বেড়ীবাঁধ তৈরি করেন। ২৯ হিজরিতে বিশেষ ব্যবস্থাধীনে মসজিদে নববির সম্প্রসারনের কাজ নতুন করে আরম্ভ করেন। আশে পাশের জমিগুলো খরিদ করে দশ মাসের অবিরাম চেষ্টার পর সম্প্রসারণ শেষ করেন।

সামরিক ব্যবস্থা : সৈন্য বাহিনী সংগঠনে হযরত উমর (রা.) এর রীতিনীতি বহাল রেখে এর উৎকর্ষ সাধন করেন। সেনাবাহিনীর ব্যারাক সংখ্যা বাড়ানো হয়। যুদ্ধের ঘোড়া, উটের সংখ্যা যখন বেড়ে যায়, তখন তিনি এদের জন্য চারণভূমি সম্প্রসারণ করেন। নৌ-বহরের আবিস্কার হযরত উসমান (রা.)-এর সময়ই হয়।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার : রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সহচর এবং প্রতিনিধি হওয়ায় হযরত উসমান (রা.) এর ইসলামের প্রচার ও প্রসারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল। যুদ্ধবন্দীদেরকে ইসলাম ও খলিফার গুরুত্ব বর্ণনা করে দীন ইসলামের দাওয়াত দিতেন। হযরত উসমান (রা.) নিজে মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিতেন। ইসলামি দর্শন ও চিন্তাধারা বর্ণনা করতেন। তিনি নিজে ব্যবসায়ী হওয়ায় তাঁর অঙ্ক শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান ছিল। তিনি হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-কে সাথে নিয়ে ইলমে ফারায়েজ (উত্তরাধিকার আইন)-কে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিন্যস্ত করেন।

কুরআন সংকলন : হযরত উসমান (রা.) এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল কুরআন মজীদকে সকল প্রকার বিকৃতির হাত হতে রক্ষা করা এবং এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার দান। ৩০ হিজরি সনে আজারবাইজান এবং 'বাবুল আবওয়াব' বিজয়ের সময় বিভিন্ন দেশের ফৌজ একত্র হয়। তাদের মধ্যে কুরআন পড়া নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। মিসরীয়দের পড়ার রীতি ছিল এক রকম, ইরাকি ও সিরিয়াবাসীদের পড়ার রীতি ছিল অন্য রকম। তাই তাদের মধ্যে কুরআন মজীদে পাঠের রীতি নিয়ে মতপার্থক্য দেখা দেয়। এ মত পার্থক্যকারীগণ নিজেদের পড়া শুদ্ধ এবং অপরের পড়া অশুদ্ধ ভাবতে থাকেন। হযরত হোযায়ফা (রা.) সাহাবা কেরামের সাথে পরামর্শক্রমে সিদ্দিকে আকবর (রা.) এর সময়কার লিখিত সংকলনটি এনে হযরত জায়েদ ইবনে সাবিত এবং হযরত সায়ীদ ইবনে আ'ছ (রা.) এর দ্বারা এর আট কপি করে বিভিন্ন ইসলামি দেশে পাঠিয়ে দেন। এভাবে বিশুদ্ধ সংকলনটি বিভিন্ন দেশে ও শহরে প্রচার করা হয়, সাথে সাথে হযরত উসমান (রা.) এর নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, যারা নিজের উদ্যোগে সংকলন করেছে, তাদের সংকলনগুলো নষ্ট করে দিবে, এ নির্দেশ পুরোপুরি পালিত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

হযরত আলী (রা.) (৬৫৬-৬৬১ খ্রিঃ)

প্রাথমিক জীবন :

ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) ৬০০ খ্রিষ্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (সা.)এর চাচা আবু তালিবের পুত্র। তাঁর মাতার নাম ফাতিমা বিনতে আসাদ। হযরত আলী (রা.) এর ডাক নাম ছিল আবু তোরাব ও আবুল হাসান।

আবু তালিবের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল ছিল না বলে মহানবি (সা.) নিজেই আলী (রা.) এর প্রতিপালনের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। হযরত আলী (রা.) কে মহানবি (সা.) অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এমনকি নিজের আদরের কন্যা হযরত ফাতিমা (রা.) কে তিনি আলীর সাথে বিয়ে দেন।

ইসলাম গ্রহণ ও মদিনায় গমন :

রাসুল (সা.) এর নবুয়তের শুরুতেই হযরত আলী (রা.) ইসলাম গ্রহণ করেন। তখন আলী (রা.) এর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। বালকদের মধ্যে হযরত আলী (রা.) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আর্থিকভাবে অসচ্ছল থাকলেও অসি ও মসি দ্বারা ইসলাম সেবা করেন। মাওলানা মুহম্মদ আলী বলেন, 'দীক্ষাকালে তরুণ বয়স হলেও হযরত আলী (রা.) ধর্মপ্রচার অভূতপূর্ব উদ্দীপনা প্রকাশ করেন'। মহানবি (সা.)এর সাথে হযরত আলীও কুরাইশদের হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত হন। বিশেষত মহানবি (সা.) যখন মক্কা ত্যাগ করে মদিনায় চলে যান, তখন তিনি মহানবি (সা.)এর ঘরে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মহানবি (সা.) এর বিছানায় শায়িত ছিলেন। সকালবেলা হযরত আলী (রা.) কে মহানবির বিছানায় দেখতে পেয়ে কুরাইশগণ বিস্মিত হন। পরিশেষে হযরত আলীও মদিনায় হিজরত করে মহানবির সাথে মিলিত হলেন এবং ইসলামের সেবায় আত্মনিয়োগ করলেন।

হযরত আলী (রা) এর বিবাহ :

মহানবি (সা.) হযরত আলী (রা.) এর সাথে তাঁর আদরের কন্যা হযরত ফাতিমাকে বিয়ে দেন। হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.) এর দাম্পত্য জীবন খুব সুখের ছিল। হযরত ফাতিমা (রা.) এর গর্ভে হাসান, হুসাইন ও মুহসিন নামে তিনটি ছেলে এবং জয়নব ও উম্মে কুলসুম নামে দুটি কন্যা জন্ম নেয়। মুহসিন বাল্যকালে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনের বংশধরগণ 'সৈয়দ' নামে ইতিহাসে পরিচিত। হযরত ফাতেমা (রা.) এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.) অন্যত্র বিয়ে করেন এবং ওই সংসারে আরও কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে ইসলামের জন্য তাঁর অবদান :

ইসলামের জন্য হজরত আলী (রা.) এর অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি তাঁর অসীম সাহস, শক্তি ও বীরত্বকে ইসলামের খেদমতে নিয়োজিত করেছিলেন। রাসুল (সা.) এর জীবনের প্রায় সব যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেন এবং প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি তাঁর শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দেন।

বদরের যুদ্ধে তিনি মহানবি (সা.) এর পতাকা বহন করেন। এ যুদ্ধে সম্মুখ সমরে তিনি কুরাইশদের বিখ্যাত বীর আমর ইবন আবুজদকে পরাজিত ও নিহত করেন। এ সময় বীরত্বের জন্য তিনি মহানবি (সা.) এর কাছ হতে 'জুলফিকার তরবারি' লাভ করেছিলেন। এমনিভাবে তিনি উহুদ, খন্দক, বিশেষত খায়বার যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে পরাজিত করে বিখ্যাত কামুস দুর্গ জয় করে অসাধারণ শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করেন। তাঁর বীরত্বে ও রণনৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হয়ে মহানবি (সা.) তাঁকে আসাদুল্লাহ বা আল্লাহর সিংহ উপাধিতে ভূষিত করেন।

ঐতিহাসিক হুদায়বিয়া সন্ধির সময় তিনি চুক্তি লেখকের দায়িত্ব পালন করেন। মক্কা বিজয়ের পর মহানবি (সা.) যখন দশ হাজার অনুগামীসহ শহরে প্রবেশ করেন, তখন হযরত আলী (রা.) হযরত সাদের হাত হতে ইসলামী পতাকা বহন করেন। হুনায়নের যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তবে তাবুক অভিযানের সময় মহানবি (সা.) তাঁকে মদিনায় অবস্থান করতে বলেন। কিন্তু তিনি অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য বড়ই অনুরোধ করতে থাকলে রাসুল (সা.) বলেন, 'হযরত হারুনের সাথে হযরত মুসার যেমন সম্পর্ক ঠিক তোমার আমার সেই সম্পর্ক-শুধু পার্থক্য এই যে, আমার পর কোনো নবি নেই'। সূরা তাওবা অবতীর্ণ হলে মহানবি (সা.) শত্রুদের নিকট এ সংবাদ জানানোর ভার হযরত আলীর উপর অর্পণ করেছিলেন। হিজরি দশ সনে তিনি মহানবি (সা.) এর নির্দেশে ইয়ামেনে ইসলাম প্রচার করতে যান। তাঁর মাধ্যমেই ইয়ামেনে সর্বপ্রথম ইসলাম প্রচারিত হয়। পরবর্তীতে সেখানে বিচারক নিযুক্ত হন।

পূর্ববর্তী খলিফাদের প্রতি হযরত আলী (রা.) এর আনুগত্য

পূর্ববর্তী সমস্ত খলিফার সময়েই তিনি তাঁর যথাযথ ভূমিকা পালন করেন। খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর নির্বাচনের পর তিনি তাঁকে নির্বিঘ্নে মেনে নেন এবং বিভিন্নভাবে সহায়তা করেন। বিশেষত ভন্ড নবিদের আবির্ভাবের ফলে যে মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তিনি এদের প্রতিরোধের জন্য যথাযথ ভূমিকা পালন করেন।

হযরত আবু বকর (রা.) এর মৃত্যুর পর তিনি খলিফা হযরত উমর (রা.) এর আনুগত্য স্বীকার করলেন। হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা.) এর খিলাফতকালে তিনি মজলিস-উস-শুরার সদস্য ছিলেন। শাসন সংক্রান্ত অধিকাংশ বিধি-বিধান তাঁর পরামর্শে হয়েছিল। তিনি নিজ কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমকে হযরত উমর (রা.) এর সাথে বিবাহ দেন।

মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফা নির্বাচনের সময় তিনি হযরত উসমান (রা.) এর প্রতি সমর্থন জানান। হযরত উসমান (রা.) গৃহে শত্রু বেষ্টিত হলে তিনি পুত্র হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনকে তাঁর গৃহদ্বার পাহারায় নিযুক্ত করেছিলেন। এভাবে খিলাফত লাভের পূর্বে তিনি নানাভাবে ইসলামের সেবা করেন।

হযরত আলী (রা.) এর খিলাফত লাভ : হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার পর খিলাফতের সর্বত্র বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হয়। নতুন খলিফা নির্বাচনের ব্যাপারে বিদ্রোহীদের মধ্যে কোনো ঐক্যমত ছিল না। এ সময় মদিনার এক ব্যক্তি হযরত উসমান (রা.) এর রক্তাক্ত জামা ও তাঁর স্ত্রীর কর্তিত আঙ্গুল প্রদর্শন করে পরিস্থিতি আরও জটিল করে তোলে। বিদ্রোহী দলগুলোর মধ্যে মিসরের দলটি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। মিসরীয় বিদ্রোহী দলের নেতা আবদুল্লাহ ইবন সাবা খলিফা হিসেবে হযরত আলী (রা.) এর নাম প্রস্তাব করল। কুফা ও বসরায় বিদ্রোহীগণও হযরত আলী (রা.) কে খিলাফতের দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ জানাল। কিন্তু হযরত আলী (রা.) অনীহা প্রকাশ করলেন। তিনি হযরত তালহা অথবা হযরত জুবাইর (রা.) এর নিকট আনুগত্যের শপথ নেওয়ার প্রস্তাব করলেন। তাঁরা উভয়েই এ ব্যাপারে অসম্মতি জানালেন অবশেষে মদিনার বিশিষ্ট নাগরিকদের অনুরোধে হযরত আলী (রা.) ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুন মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বিদ্রোহীরা এবং সকল নাগরিক তাঁকে খলিফা বলে মেনে নিলেন এবং আনুগত্যের অঙ্গীকার করলেন।

হযরত আলী (রা.) এর অসুবিধাসমূহ :

হযরত আলী (রা.) খলিফা হওয়ার পর নানা সমস্যার সম্মুখীন হলেন। এ সমস্ত সমস্যার মধ্যে হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি, হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের রদবদল এবং উমাইয়াগণ কর্তৃক অন্যায়ভাবে দখলকৃত জায়গির ও ভূসম্পত্তি সরকারের নিকট ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি উল্লেখযোগ্য।

হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শাস্তিদানের দাবি :

হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার খবর চারিদিকে পড়লে আরবের সর্বত্র খলিফার রক্তের প্রতিশোধ গ্রহণের আওয়াজ ওঠল। হযরত তালহা (রা.) ও হযরত জুবাইর (রা.) খলিফা হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শাস্তি বিধানের জন্য খলিফা হযরত আলী (রা.) কে অনুরোধ জানান। হযরত আয়শা (রা.) ও হযরত উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে তৎক্ষণাৎ হত্যাকারীদের সনাক্ত করে শাস্তি প্রদান করা সহজ ছিল না। অধিকন্তু খেলাফতের এ সংকটময় পরিস্থিতিতে হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদান করা হলে খিলাফতের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে মনে করে হযরত আলী (রা.) জানালেন যে, রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

বস্তুতপক্ষে খলিফা হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকান্ড কেবল কতিপয় ব্যক্তি বিশেষের কার্য ছিল না যে, সহজেই তাদের সনাক্ত করে শাস্তি বিধান করা যাবে। তিনটি কেন্দ্রের বহুসংখ্যক লোক এ হত্যাকান্ডে জড়িত ছিল। সুতরাং সে মুহূর্তে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন তিনি সংগত মনে করলেন না। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণকে কেন্দ্র করেই শেষ পর্যন্ত সিরিয়ার শাসনকর্তা আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) এর সাথে হযরত আলী (রা.) এর ঘোরতর মতানৈক্য দেখা দেয়। এ মতানৈক্যই পরে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে।

প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পরিবর্তন :

আরবের রাজনৈতিক অঙ্গনের এরূপ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে হযরত আলী (রা.) প্রাদেশিক শানকর্তাদের রদবদল করতে মনস্থ করলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এ ব্যবস্থায় বিদ্রোহীরা শাসনকর্তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে এবং রাজ্যে শান্তি ফিরে আসবে। হযরত আলী (রা.) এর বন্ধুদের অনেকেই অন্তত আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) কে সিরিয়ার শাসনকর্তার পদ হতে অপসারণ না করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কেননা খলিফা হযরত উমর (রা.) এর আমল হতে তিনি এ পদে বহাল রয়েছেন। শাসক হিসেবেও তিনি বিচক্ষণ ও যোগ্য ছিলেন। অতএব, হযরত আলী (রা.) তাঁর সাথে সদ্ভাব ও সৌহার্দ রক্ষা করে চললে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয় দিতেন। ঐতিহাসিক মুইর বলেন, 'খলিফার ঘাতকের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সিরিয়াবাসীকে কাজে লাগালে এবং গোষ্ঠীসমূহের বিদ্রোহ দমন করলেই আলী (রা.) বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন। এভাবে তিনি মুয়াবিয়ার আকাঙ্ক্ষা বিনাশ করে উমাইয়াদের ক্ষমতা লাভের পথ রুদ্ধ করতে পারতেন।' কিন্তু হযরত আলী (রা.) তাঁর সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তিনি কুফা, বসরা, মিসর ও সিরিয়ার শাসনকর্তাকে পদত্যাগের নির্দেশ দিলেন। হযরত উসমান বিন হানিফকে তিনি বসরায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমিরের স্থলাভিষিক্ত করলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন সা'দের স্থলে হযরত কায়েস বিন সা'কে মিসরে নিয়োগ করা হল। কুফা ও সিরিয়ার শাসনকর্তাগণকেও পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হল। কুফার শাসনকর্তা হযরত আবু মুসা (রা.) পদত্যাগ করতে রাজি হলেন। কিন্তু সিরিয়ার শাসনকর্তা আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) খলিফার নির্দেশ মানতে অস্বীকার করলেন। ফলে হযরত আলী (রা.) ও আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) এর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হল।

উমাইয়াদের স্বার্থহানী :

হযরত আলী (রা.) উমাইয়াগণ কর্তৃক অন্যায়ভাবে দখলকৃত সরকারি ভূ-সম্পত্তি সরকারের নিকট প্রত্যার্পণের নির্দেশ দেন। এর ফলে সিরিয়ার গভর্ণর আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) ও অন্যান্য স্বার্থন্বেষী উমাইয়াদের স্বার্থহানী ঘটে। সুতরাং তারা খলিফার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে।

হযরত আলী (রা.) এর সময়ে সংঘটিত গৃহযুদ্ধসমূহ :

খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যা ইসলামের ইতিহাসে একটি সুপরিকল্পিত ঘটনার মর্মান্তিক পরিণতি। তাঁর খিলাফতকালে রাজনৈতিক কোন্দল, ব্যক্তি-স্বার্থের সংঘাত, গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি কারণে মুসলমানদের মধ্যে যে অর্ন্তদ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় তা কেবল খলিফা হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যায় পরিসমাপ্তি ঘটেনি, এর জের খলিফা হযরত আলী (রা.) এর শাসনামলে চলতে থাকে এবং পর পর তিনটি গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হয়ে ইসলামের ঐক্য, সংহতি, নিরাপত্তা ও গৌরবের ইতিহাসকে সাময়িকভাবে বাধ্যগ্রস্থ করে। এগুলো ছিল (ক) উষ্ট্রের যুদ্ধ, (খ) সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ, (গ) নাহরাওয়ানের যুদ্ধ।

উষ্ট্রের যুদ্ধ ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দ :

ইসলামের ইতিহাসের এক বেদনাদায়ক ঘটনা হল উষ্ট্রের যুদ্ধ। মুসলমানগণ পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার দৃষ্টান্ত উষ্ট্রের যুদ্ধেই প্রথমবার হল। আত্মঘাতী যুদ্ধের এটাই শেষ নয়, আরম্ভ মাত্র। এরূপ রক্তক্ষয়ী অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে ইসলামের ভিত্তিমূল ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে।

উষ্ট্রের যুদ্ধের কারণ :

হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের দাবি : হযরত আলী (রা.) কে খলিফা হিসেবে মেনে নিলেও হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর (রা.) এর দাবি ছিল যে, খলিফা তাৎক্ষণিকভাবে হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদান করবেন। খলিফা এ ব্যাপারে তাদের আশ্বস্তও করেছিলেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) এর হত্যা কোনো ব্যক্তি বিশেষের কাজ ছিল না। এর সাথে কুফা, বসরা ও মিসরের অনেক লোক জড়িত ছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে তাদেরকে সনাক্ত করা সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া তখনকার পরিস্থিতি এমনিতেই ছিল জটিল ও সংকটময়। এমতাবস্থায় খলিফা বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেন নি। এতে হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর (রা.) অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত আলী (রা.) এর বিরুদ্ধাচারণ শুরু করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) এর অসন্তুষ্টি : মহানবি (সা.) এর শত্রুগণ ও মুনাফিক প্রকৃতির দুই-একজন মুসলিম যখন হযরত আয়েশা (রা.) এর পূত চরিত্রের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করেছিল, তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) এ বিষয়ে হযরত আলী (রা.) এর পরামর্শ চাইলেন। তিনি হযরত আয়েশা (রা.) এর দাসীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য আল্লাহর রাসুলকে পরামর্শ দেন। অবশেষে ওহী নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ হযরত আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র সম্পর্কে জানিয়ে দেন। তখন থেকে হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আলী (রা.) এর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তাই তিনি হযরত তালহা ও হযরত যুবাইর (রা.)-এর দলে যোগ দেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনা

উপর্যুক্ত কারণে হযরত তালহা (রা.), হযরত জুবাইর (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি আনুগত্যের শপথ বিস্মৃত হয়ে একটি জোট গঠন করেন। শিগগিরই তাঁরা মক্কা, মদিনা ও ইরাক হতে তিন সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করে বসরা আক্রমণ করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) এর উপস্থিতিতে অধিকাংশ বসরাবাসী হযরত আলী (রা.) এর পক্ষ ত্যাগ করে তাঁদের সঙ্গে যোগদান করে। বসরার শাসনকর্তা ওসমান বিন হানিফ ত্রিশক্তির মোকাবিলা করে পরাজিত ও ধৃত হন। বিজয়ী বাহিনী হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার সাথে জড়িত কতিপয় দুষ্কৃতিকারীকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

শান্তি আলোচনা :

ইতোমধ্যে হযরত আলী (রা.) বসরার উদ্ভূত পরিস্থিতি আয়ত্তে আনার জন্য আমীরে মুয়াবিয়া (রা.) এর বিরুদ্ধে সিরিয়ায় অগ্রসর না হয়ে কুফার পথে বসরার দিকে রওয়ানা হলেন। কুফার শাসনকর্তা হযরত আবু মুসা আল-আসয়ারী (রা.) বসরা আক্রমণে খলিফাকে সাহায্য করতে অস্বীকৃত হলে তিনি পদচ্যুত হলেন। কিন্তু কুফার সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহ দমনে খলিফার বাহিনীর সাথে মিলিত হল। ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে হযরত আলী (রা.) সৈন্য সমভিব্যবহারে বসরায় উপস্থিত হন। স্বভাব সুলভভাবে তিনি বিদ্রোহীদেরকে আত্মকলহ হতে নিবৃত্ত করার জন্য শান্তিপূর্ণ আলোচনার প্রস্তাব দেন। হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবাইর (রা.) শান্তি প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কয়েকদিন যাবত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল যে, খলিফা প্রাথমিক বিপর্যয়গুলো কাটিয়ে ওঠে অনতিবিলম্বে হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার সাথে জড়িত অপরাধীদের সমুচিত দন্ডবিধান করবেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধের ঘটনা :

এরূপ অবস্থা যখন শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার অনুকূলে তখন খলিফা উসমান (রা.) এর হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট কুফা, বসরা ও মিসরীয় বিদ্রোহীগণ উদ্বিগ্ন ও আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তারা যে কোনো চক্রান্ত দ্বারা শান্তি আলোচনা বানচাল করতে বদ্ধপরিকর হল। অবশেষে ৬৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর তারিখে রাত্রির অন্ধকারে আশতার, নাখয়ী ইবন সাওদা প্রমুখ বিদ্রোহী নেতা নগরের উপকণ্ঠে কোরায়বা নামক স্থানে উভয়পক্ষের শিবির আক্রমণ করল। তাই প্রকৃতপক্ষে কেনো পক্ষই জানার সুযোগ পেল না যে কারা প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করেছে। মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের ইহাই প্রথম যুদ্ধ। উভয় পক্ষই যুদ্ধে ভীষণভাবে জড়িয়ে পড়ল। প্রত্যুষে হযরত আয়েশা (রা.) উষ্ট্রে এবং হযরত আলী (রা.) অশ্বে আরোহণ করে অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও আয়ত্তে আনার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। ইতোমধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে হযরত তালহা (রা.) ও হযরত যুবায়ের (রা.) শিবিরে প্রত্যাগমনের পথে স্বার্থন্বেষী দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক নিহত হন। হযরত আয়শা (রা.) উষ্ট্রের পৃষ্ঠে উপবেশন করে যুদ্ধ পরিচালনা করেন বলে এ যুদ্ধকে 'উষ্ট্রের যুদ্ধ' বলা হয়। যুদ্ধে পরাজিত হলে হযরত আলী (রা.) তাঁকে সসম্মানে তাঁর ভ্রাতার তত্ত্বাবধানে মদিনায় প্রেরণ করেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধের ফলাফল :

উষ্ট্রের যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম গৃহযুদ্ধ। এ যুদ্ধে মুসলমানরা একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে রক্তপাতের সূচনা করে এবং যুগযুগ ধরে স্বার্থ-সংঘাত, গোত্রীয় দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক লিপ্সা প্রভৃতি কারণে এটা চলতে থাকে। এ যুদ্ধে হযরত আয়েশা (রা.) বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাঁর নিরাপত্তার জন্য কমপক্ষে ৪,৭০০ সৈন্য, হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবাইর (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবিদের মৃত্যু ইসলামের পক্ষে ক্ষতিস্বরূপ বলে ঘোষণা করলেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত আলী (রা.) এর এ বিজয় হত্যাকারীদেরই বিজয়। কারণ, তাদের উস্কানি ও প্ররোচনায় হযরত আলী (রা.) ও হযরত আয়েশা (রা.) এর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি হয়।

উষ্ট্রের যুদ্ধের অন্যতম ফলাফল ছিল এই যে, এর ফলে মক্কা, বসরা ও কুফার মুসলমানদের মধ্যে মতবিরোধের অবসান হয় এবং এতদঞ্চলে হযরত আলী (রা.) এর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত আলী (রা) বিদ্রোহ সমূলে উৎপাটন করার জন্য প্রশাসনিক পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। কায়েস ইবন-সা'দ, সাহল ইবন-হানিফ এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবন-আব্বাস (রা.) কে মিসর, হেজাজ ও বসরায় শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করলেন।

উষ্ট্রের যুদ্ধের পর খলিফা হযরত আলী (রা.) এর অন্যতম প্রশাসনিক পদক্ষেপ ছিল মদিনা হতে কুফায় রাজধানী স্থানান্তর। ইরাকিদের সমর্থনের প্রতিশ্রুতিতে এবং বিশাল ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যস্থলে রাজধানী প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে খলিফা ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কুফাকে রাজধানীর মর্যাদা দান করলেন। রাজধানী স্থানান্তরিত হলে ধর্মীয় কেন্দ্রস্থল হিসেবে মদিনার গুরুত্ব হ্রাস পেল। ফলে মদিনার জীবিত সাহাবিদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগল। তাঁরা খিলাফতে সক্রিয় অংশগ্রহণ হতে দূরে সরে গেলেন। অপরদিকে কুফায় রাজধানী স্থানান্তরিত করে হযরত আলী (রা.) এর উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কারণ অস্থির প্রকৃতির কুফাবাসীদের উপর তিনি অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়লে খোলাফায়ে রাশেদীনের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে।

খলিফা হযরত আলী (রা.) ও সিরিয়ার আমির মুয়াবিয়া (রা.) এর মধ্যকার সংঘর্ষ

উষ্ট্রের যুদ্ধের পর মক্কা, মদিনা, ইরাক ও মিসরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত এবং সুষ্ঠু হল বটে; কিন্তু এ যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে খলিফা হযরত আলী (রা.) এর সাথে সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা.) এর দ্বন্দ্ব ও তিক্ততা চলছিল। কুফায় রাজধানী স্থানান্তর করে এবং প্রশাসনিক রদবদল দ্বারা খলিফা আলী (রা.) স্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন এবং বিদ্রোহী শাসনকর্তাকে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে নির্দেশ দেন। একটি পত্রে খলিফা আলী (রা.) সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা.) কে ইসলামের স্বার্থে তাঁর আনুগত্য স্বীকারের আহবান জানান। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা.) খলিফার আদেশ অমান্য করেন। উপরন্তু তিনি নিহত খলিফা উসমান(রা.) এর রক্তে রঞ্জিত পোষাক ও তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তিত আঙ্গুল প্রদর্শন করে পরিস্থিতি জটিল করতে থাকেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের বিচার না হলে তিনি খলিফার আনুগত্য স্বীকার করবেন না। এভাবে খলিফার বিরুদ্ধে তিনি প্রায় ৬০,০০০ সিরীয় সৈন্য গঠন করে হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সংঘর্ষের কারণ :

খলিফার বশ্যতা স্বীকার এবং শাসনক্ষমতা হস্তান্তরে মুয়াবিয়া (রা.) এর অসম্মতি : মাসুদী, পি, কে হিট্টি, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ ঐতিহাসিকের মতে, হযরত আলী (রা.) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়েই হযরত উসমান (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত সকল দুর্নীতিপরায়ণ প্রাদেশিক শাসনকর্তাকে অপসারিত করে তাদের স্থলে নিষ্ঠাবান, দক্ষ ও উপযুক্ত শাসনকর্তা নিযুক্ত করে পাঠান। তিনি মনে করলেন যে, এ নীতি অবলম্বন করলে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের সংহতি রক্ষিত হবে। হযরত মুগিরা (রা.) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁকে এরূপ দুঃসাহসিক নীতি গ্রহণ না করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু খলিফা হযরত আলী (রা.) তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেননি। ফলে সাম্রাজ্যে ঐক্য ও শান্তির পরিবর্তে সমস্যা আরও জটিল হলো। সিরিয়ার শাসনকর্তা মুয়াবিয়া (রা.) ব্যতীত সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ খলিফার আদেশ পালন করেন।

বায়তুলমালের প্রত্যার্পন :

খলিফা হযরত উসমান (রা.) উমাইয়াগণকে যে সমস্ত জায়গির এবং সরকারি ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেছিলেন হযরত আলী (রা.) তৎসমুদয় সরকারকে প্রর্ত্যপণ করার নির্দেশ দিলেন। এতে মুয়াবিয়া (রা.) সংক্ষুব্ধ হন। কারণ খলিফা হযরত উসমান (রা.) এর

রাজত্বে মুয়াবিয়া (রা.) এ সমস্ত উৎস হতে অজস্র ধন-সম্পদ লাভ করে প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুত আর্থিক সুবিধা নষ্ট হওয়ায় উমাইয়াগণ হযরত আলী (রা.) এর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিল।

উমাইয়া ও হাশেমী গোত্রের দ্বন্দ্ব :

কুরাইশ বংশের হাশেমী ও উমাইয়া গোত্রের মধ্যে যুগ যুগ ধরে যে কলহ ও বিদ্বেষ বিদ্যমান ছিল তা হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর তিক্ত সম্পর্কে ইন্ধন যোগাচ্ছিল। মুয়াবিয়া (রা.) কেবল উমাইয়া বংশের লোক ছিলেন না, তিনি হযরত উসমান (রা.) এর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও ছিলেন। হযরত উসমান (রা.) এর খিলাফতে তিনি অশেষ ধন-সম্পত্তি ও প্রভুত্ব ক্ষমতা অর্জন করে রাষ্ট্রে সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। কিন্তু খলিফা পরিবর্তনের ফলে তিনি কোনোভাবেই তা সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই খিলাফতে পুনরায় উমাইয়া প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য উমাইয়াগণ ঐক্যবদ্ধভাবে মুয়াবিয়া (রা.) খলিফা হযরত আলী (রা.) এর শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে।

মুয়াবিয়া (রা.) এর আকাঙ্ক্ষা ও সমর প্রস্তুতি :

মুয়াবিয়া (রা.) খলিফা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। হযরত আলী (রা.) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে মুয়াবিয়া (রা.) হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জানান। হযরত আলী (রা.) এর পক্ষে হত্যাকারীদের তৎক্ষণাৎ সনাক্ত করে শাস্তি প্রদান করা সহজ ব্যাপার ছিল না। তাছাড়া খেলাফতের এ সংকটময় পরিস্থিতিতে হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদান করলে খিলাফতের শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে মনে করে হযরত আলী (রা.) আপাতত শাস্তি প্রদানে অসমর্থ হলে, মুয়াবিয়া (রা.) এর বিরূপ ব্যাখ্যা দান করে খলিফার বিরুদ্ধে এই মর্মে অপপ্রচার চালাতে থাকে যে, এ হত্যাকাণ্ডে খলিফা আলী (রা.) পরোক্ষভাবে জড়িত আছে। এই জন্য তিনি শাস্তি প্রদানে কালক্ষেপণ করেছেন। হযরত উসমান (রা.) এর রক্তাক্ত বস্ত্রাদি এবং তাঁর স্ত্রী নায়লার কর্তিত আঙ্গুলী প্রদর্শন করে সিরিয়াবাসীদেরকে হযরত আলী (রা.) এর বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলেন। এরূপে উভয়ের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সিফফিনের যুদ্ধ :

মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক খলিফার নির্দেশ পালন না করা সর্বোপরি যুদ্ধ তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আলী (রা.) ৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে ৫০,০০০ সৈন্যসহ সিরিয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। এ সংবাদ শুনে মুয়াবিয়া(রা.) ও খলিফাকে বাধা দেওয়ার জন্য ৬০,০০০ সৈন্যসহ ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম তীরে সিফফিন নামক প্রান্তরে উপস্থিত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েও মুসলমানদের অনর্থক রক্তপাত এড়ানোর জন্য হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) কে বশ্যতা স্বীকার করে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় আহবান জানান। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) এর যুদ্ধংদেহি মনোভাবের পরিবর্তন না হওয়ায় যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। এভাবে প্রতি ক্ষেত্রে উত্যক্ত হওয়া সত্ত্বেও খলিফা হযরত আলী (রা.) তাঁর সৈন্যবাহিনীকে শত্রু দ্বারা আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেন।

অবশেষে ৬৫৭ খ্রি. ২৬ জুলাই সর্বপ্রথম মুয়াবিয়া (রা.) এর সৈন্যবাহিনী আক্রমণ রচনা করে। হযরত আলী (রা.) বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে, যুদ্ধের তৃতীয় দিবসে মুয়াবিয়া (রা.) কে বিপর্যস্ত করে তুললেন। মুয়াবিয়া (রা.) এর বাহিনী শোচনীয় পরাজয়ের মুখে রণে ভঙ্গ দিতে উদ্যত হলে কৌশলী সেনাপতি ও কূটনীতিবিদ আমর ইবন আল-আস (রা.) এর পরামর্শে মুয়াবিয়া (রা.) এর সৈন্যগণ বর্শার অগ্রভাগে পবিত্র কুরআন শরীফ বেধে যুদ্ধ বন্ধ করার এক অভিনব কৌশল গ্রহণ করে।

খলিফা হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়া(রা.)-এরএই রাজনৈতিক চালের তাৎপর্য বুঝতে পেরে বিজয় লাভ না করা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। কিন্তু হযরত আলী (রা.)-এর সৈন্যদের মধ্যে যারা হাফিজ-ই-কুরআন ছিলেন, তাঁরা কুরআন শরীফের পবিত্রতা ও সম্মানার্থে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য হযরত আলী (রা.)-কে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তিনি তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, এটি শত্রুদের একটি রাজনৈতিক চালমাত্র। কিন্তু তারা তা বুঝতে চেষ্টা করেনি। অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.) যুদ্ধ বিরতিতে সায় দেন।

দুমাতুল জন্দলের মীমাংসা (জানুয়ারি, ৬৫৯ খ্রিঃ) :

হযরত আলী (রা.) এর সাথে মুয়াবিয়া(রা.) এর সংঘর্ষের পরিসমাপ্তির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে, তাঁরা উভয়ে মধ্যস্থতকারী নিযুক্ত করে বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন। হযরত আলী (রা.) এর পক্ষ হতে কুফার পদচ্যুত গভর্নর সরল মনের হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.) এর পক্ষ থেকে আমর ইবন আল-আস (রা.) প্রতিনিধি মনোনীত হন। সিদ্ধান্ত মোতাবেক উভয় সালিশ ৪০০ লোক সঙ্গে নিয়ে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী স্থানে মিলিত হবেন এবং কুরআনের নির্দেশানুসারে বিরোধ মীমাংসা করবেন। যদি তারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীতি হতে না পারেন, তাহলে মীমাংসার দায়িত্ব আটশত লোকের উপর বর্তাবে এবং তাদের ভোটাধিক্যে যে সিদ্ধান্ত হবে তা উভয়পক্ষকে মেনে নিতে হবে। এ সিদ্ধান্ত হওয়ার পর হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) পর্যায়ক্রমে কুফা ও দামেস্কে চলে যান।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক হযরত আবু মুসা আল আশআরী (রা.) ও আমর ইবন আল-আস (রা.) প্রত্যেকে ৪০০ লোকসহ 'দুমাতুল জন্দল' নামক স্থানে হাজির হলেন। মক্কা ও মদিনা থেকেও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি এ সালিসী মজলিশে উপস্থিত হলেন। প্রকাশ্যে সালিসী মজলিশ শুরু হওয়ার পূর্বে হযরত আবু মুসা (রা.) ও আমর (রা.) এর মধ্যে গোপন আলোচনা হল। আমর (রা.) সরলমনা হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রা.) কে বুঝালেন যে, ইসলামের শান্তি-শৃঙ্খলার স্বার্থে হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) উভয়কেই অপসারিত করতে হবে এবং তৃতীয় একজনকে খলিফা নিযুক্ত করতে হবে। আরও স্থির হল যে, প্রথমে আবু মুসা (রা.) হযরত আলী (রা.) এর পদচ্যুতি ঘোষণা করবেন এবং পরে আমর ইন আল-আস (রা.) মুয়াবিয়া (রা.)-এর পদচ্যুতি ঘোষণা করবেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রথমে হযরত আবু মুসা (রা.) বললেন, হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) খলিফা পদে অনুপযুক্ত বিধায় উভয়কে অপসারণ করা হল। এখন আপনারা নতুন একজনকে মনোনীত করবেন। তিনি আরও বললেন, 'আমি আলী (রা.)-এর পদচ্যুতির ঘোষণা দিলাম।' তারপর আমর ইবন আল-আস (রা.) দাঁড়িয়ে বললেন, হে জনতা! আপনারা আবু মুসার (রা.) রায় শুনলেন, তিনি তাঁর লোককে পদচ্যুত করেছেন। আমি তা গ্রহণ করলাম এবং মুয়াবিয়া (রা.) কে সে পদে নিযুক্ত করলাম। এ রায়ে হযরত আলী (রা.)-এর অনুসারীরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন, ক্রুদ্ধ মনে তারা কুফায় প্রত্যাবর্তন করল। দুমাতুল জন্দলের সালিসীর রায় হযরত আলী (রা.)-এর জন্য এক মর্মান্তিক ঘটনা। খলিফার সাথে একজন প্রাদেশিক শাসকের খিলাফত ভাগের প্রশ্নই ওঠে না। এ ব্যাপারে চূড়ান্ত রায় দেয়ার এখতিয়ার জনগণেরই। এতে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির অধিকার নেই।

দুমাতুল জন্দলের রায়ে তাৎপর্য বিশ্লেষণ :

পক্ষপাতহীন ও আবেগমুক্ত দৃষ্টিকোণ হতে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সালিসীর প্রস্তাব, বৈঠক এবং রায় এসবগুলিই নিতান্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে খিলাফতে উপবিষ্ট খলিফার স্বার্থের পরিপন্থী। এটি ছিল সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক ভোজবাজি। এটি কীভাবে হযরত আলী (রা.) এর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে এবং মুয়াবিয়া (রা.) এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তা নিম্নের আলোচনা হতে প্রতীয়মান হবে।

(ক) হযরত আবু মুসা (রা.) বয়োজ্যেষ্ঠ হলেও আমর (রা.) -এর তুলনায় ছিলেন সরল, অকপট, নীতিজ্ঞান সম্পন্ন অপরদিকে আমর (রা.) ছিলেন কৌশলী। এর ফলে হযরত আবু মুসা (রা.) আমর (রা.) -এর কৌশলের কাছে হেরে যান। কারণ আমর(রা.)ই তাঁর নিকট উভয়কে পদচ্যুত করার জন্য প্রস্তাব দেন এবং বয়োজ্যেষ্ঠতার দোহাই দিয়ে আমর (রা.) হযরত আবু মুসা (রা.) কে প্রথমে রায় ঘোষণা করতে বলেন।

(খ) হযরত আবু মুসা (রা.) খলিফাকে পদচ্যুত করলে হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদাহানি হয়। কিন্তু এতে মুয়াবিয়া (রা.) -এর শক্তি হ্রাস হয়নি। কারণ, মুয়াবিয়া (রা.) প্রাদেশিক শাসনকর্তা থাকায় তাঁকে খিলাফত হতে অপসারিত করার কোন প্রশ্নই আসে না। উপরন্তু তাঁকে সিরিয়ার শাসনকর্তার পদ হতে অপসারণ করা হবে, এরূপ কোন প্রস্তাব অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নি। অধ্যাপক পি. কে. হিট্টি বলেন, 'উভয় মধ্যস্থ ব্যক্তি তাঁদের প্রভুদের পদচ্যুত করলে আলী ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। মুয়াবিয়ার পদচ্যুতির জন্য কোন খিলাফত ছিল না। বস্তুত সালিসী তাঁকে আলীর সমকক্ষ করে তোলে এবং হযরত আলীকে একজন মিথ্যা দাবিদারের পর্যায়ের নামিয়ে ফেলে।' সুতরাং নির্বাচিত খলিফার সাথে একজন অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্তার খিলাফত ভাগের প্রশ্ন শুধু অবাস্তবই নহে, সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবৈধ।

(গ) আমর (রা.) ও হযরত আবু মুসা (রা.) উভয়ের সালিশ এই মর্মে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁরা তাদের প্রভুদের পদচ্যুত করবেন এবং পরবর্তী খলিফা মুসলমানদের একটি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। সুতরাং দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পুনরায় প্রার্থী হতে পারেন না। কিন্তু আমর (রা.)-এর কৌশলের ফলে মুসলমানদের একটি সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচন ছাড়াই খিলাফতে মুয়াবিয়া (রা.)-এর দাবি প্রতিষ্ঠা ছিল আইনত অগ্রহণযোগ্য।

(ঘ) সালিসীর মূল বিষয় ছিল মুয়াবিয়া (রা.) কর্তৃক উত্থাপিত হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যার শাস্তি দাবি এবং হযরত আলী (রা.) কর্তৃক মুয়াবিয়া (রা.)-এর অপসারণের বৈধতা চ্যালেঞ্জ। কিন্তু আমর (রা.) এর কৌশলে রায় প্রদানের ব্যাপারে এ দুটি মূল বিষয় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় এবং তদস্থলে হযরত আলী (রা.)-এর মনোনয়নের প্রকাশ্য সমালোচনা প্রাধান্য পায়।

(ঙ) কুরআনের পাতায় শরবিদ্ধ করে যুদ্ধ স্থগিত করা হয় সত্য; কিন্তু দুমাতুল জন্দলে আল্লাহর কুরআনকে শপথ ও অনুসরণ করে বিরোধ মীমাংসা করা হয়নি। এ কারণে খলিফা আলী (রা.) এ সিদ্ধান্ত মানতে পারেন নি। তিনি ৬৬১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মুসলিম জাহানের খলিফার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর নৃশংস হত্যার পর মুয়াবিয়া নিজেকে খলিফা বলে ঘোষণা করেন।

খারেজি সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

অধ্যাপক পি. কে. হিট্টির মতে খারেজিরা হলেন ইসলামের প্রাচীনতম ধর্মীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায়। আরবি 'খারাজ' ক্রিয়াটি হতে খারেজি এই বিশেষ্য পদটি উদ্ভুত। 'খারেজি' শব্দের অর্থ দলত্যাগী। দুমাতুল জন্দলের কৌশলী রায়কে অমান্য করে হযরত আলী (রা.) এর সমর্থক ১২ হাজার সৈন্য দলত্যাগ করে হারুরা নামক গ্রামে যেয়ে মিলিত হয়েছিল। তারা মানুষের বিচার মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এ আওয়াজ তুলে যে, 'লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহর আইন ছাড়া কোনো আইন নেই। তাই সিফফীনের যুদ্ধের পর দুমাতুল জন্দলের সালিসের রায়কে অমান্য করে যে দলটি হযরত আলী (রা.) এর পক্ষ ত্যাগ করে তাদেরকে ইতিহাসে খারেজি বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। তারা দল ত্যাগ করে হারুরা নামক গ্রামে মিলিত হয়েছিল বলে হারুরীয়া এবং আল্লাহর হুকুমের প্রবক্তা ছিলেন বলে 'মুহাককিমা' নামেও পরিচিত।

খারেজি আন্দোলনের সূচনা ঃ নাহরাওয়ানের যুদ্ধ (৬৫৯ খ্রিঃ)

হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষ বর্জন করে খারেজিরা আবদুল্লাহ ইবনে ওহাবকে তাদের নেতা নির্বাচন করে এবং তাঁর নেতৃত্বে নাহরাওয়ানে শিবির স্থাপন করে। সালিসের সিদ্ধান্ত যখন হযরত আলী (রা.) এর বিরুদ্ধে যায়, তখন তারা হযরত আলী (রা.) কে যুদ্ধ ঘোষণা করতে অনুরোধ জানায়। হযরত আলী (রা.) তাদের কথায় রাজি না হওয়ায় তারা খারেজিদের দলে যোগদান করে। হযরত আলী (রা.) খারেজিদের আন্দোলনের সংবাদ পেয়ে নাহরাওয়ানের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদেরকে পরাজিত করেন (৬৫৯ খ্রিঃ)। কিন্তু নহরাওয়ানের যুদ্ধে খারেজি আন্দোলনের চূড়ান্ত অবসান ঘটেনি। তারা রাজ্যের সর্বত্র গোলযোগের বীজ ছড়িয়ে দেয়।

খারেজিদের মতবাদ

রাজনৈতিক মতবাদ :

খারেজিরা পূর্ণ গণতান্ত্রিক নীতির দ্বারা চালিত হত। তাদের মতে, খলিফাকে গোটা মুসলিম সমাজ কর্তৃক নির্বাচিত হতে হবে। প্রয়োজনবোধে অযোগ্য খলিফাকে অপসারণ করে যোগ্যতর ব্যক্তিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতে হবে। খলিফার পদ কোনো গোত্র বা পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। যোগ্য ব্যক্তি হলে যেকোনো মুসলমান, খলিফা পদে নির্বাচিত হতে পারবেন। যোগ্যতাই খলিফা নির্বাচনের মাপকাঠি, তবে তাঁকে খাঁটি বা প্রকৃত মুসলমান হতে হবে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করত যে, শরীয়া হতে অভিজ্ঞ জনসাধারণ ঐশী আইন কার্যে প্রয়োগ করতে সমর্থ হলে ইমাম বা খলিফার কোনো প্রয়োজন নেই। খারেজিরা হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.) কে আইনসংগত খলিফা এবং অন্যান্য খলিফাকে অবৈধ দখলকারী মনে করত।

ধর্মীয় মতবাদ :

খারেজিদের মতবাদ অনুযায়ী যে মুসলমান নিয়মিত নামাজ ও অন্যান্য ধর্মীয় কর্তব্য পালন করে না, সে কাফেরদের সমপর্যায়ভুক্ত বা ধর্মদ্রোহী এবং তাকে ধর্মদ্রোহিতার জন্য পরিবারবর্গসহ হত্যা করা কর্তব্য। এরূপ লোক খলিফা বা ইমাম হলে তাকে খিলাফত বা ইমামতী হতে বঞ্চিত করা হবে। খারেজিরা মনে করে যে, কোনো মুসলমান গুনাহ করে বিনা তওবায় মারা গেলে তার জন্য অনন্তকাল ধরে জাহান্নামের শাস্তি নির্ধারিত থাকবে। তাদের মতে, একটি অন্যায় পদক্ষেপ কোনো মুসলমানকে ইসলামের বাইরে নিয়ে যায়।

খারেজিরা তাদের দলবহির্ভূত লোকদেরকে কাফের বা ধর্মদ্রোহী মনে করত এবং তাদের ঘোর বিরোধী ছিল। অমুসলমানদের প্রতি তারা খুব উদার ছিল। মাওয়ালীদের (অনারব মুসলিম) জন্য তাদের সহানুভূতি ছিল এবং তারা তাদেরকে আরব মুসলমানদের সমমর্যাদায় উন্নীত করার চেষ্টা করত। খারেজিদের সম্পর্কে খোদাবকস বলেন, 'খারেজিরা ছিল ইসলামের বিশুদ্ধতাবাদী– ধর্মের দিক দিয়ে গোড়া এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক।'

বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ :

মুয়াবিয়া(রা.)এর সৈন্যবাহিনী মক্কা ও মদিনা দখলের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। বসরাবাসীগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে সেখানকার শাসনকর্তা হযরত ইবন আব্বাস(রা.)এর সহকারী জিয়াদ এ বিদ্রোহ কঠোর হস্তে দমন করেন। আহওয়াজ ও কিরমানে বিদ্রোহ দেখা দিলে হযরত আলী (রা.) সে বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন।

হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর মধ্যে আপোস মীমাংসা :

এরূপে খিলাফতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ ও অশান্তি দেখা দিলে হযরত আলী (রা.) পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচেনা করে মুয়াবিয়া (রা.)এর সাথে সন্ধি চুক্তি করতে সম্মত হন। সন্ধি অনুযায়ী সিরিয়া ও মিসর মুয়াবিয়া (রা.)এর শাসনাধীনে থাকবে এবং সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ হযরত আলী (রা.)-এর শাসনে থাকবে। এভাবে খলিফা হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.)এর মধ্যে সংঘটিত গৃহযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলাফল :

হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে যে নীতিগত বিরোধ ও সশস্ত্র সংঘর্ষ সংঘটিত হয় তার ফলাফল ছিল সুদূর প্রসারী। নিঃসন্দেহে এ বিবাদ ইসলামের সংহতি ও সমৃদ্ধির পক্ষে ঘোর অমঙ্গলজনক হয়েছিল।

সাম্রাজ্যের বিভক্তিকরণ সন্ধি :

দুমার সালিশী এবং খারিজী বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আলী (রা.) মুয়াবিয়া (রা.)-এর সাথে লজ্জারজনক সন্ধি সম্পাদন করে খিলাফতকে সংকুচিত করেন। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে সিরিয়া ও মিসরের যাবতীয় কর্তৃত্ব আমীরে মুয়াবিয়া (রা.)-এর উপরে ন্যস্ত হয়। সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশে হযরত আলী (রা.)-এর কর্তৃত্ব বজায় থাকে। ফলে খিলাফতের সংহতি বিনষ্ট হয়।

খিলাফতের মর্যাদা লোপ :

হযরত আলী (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে সাম্রাজ্য বন্টনের ফলে খিলাফতের বৈশিষ্ট্য ও বুনিয়াদ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে খলিফা ও খিলাফতের প্রতি জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লোপ পেতে থাকে। এক খলিফার নিয়ন্ত্রণে জাতীয় চেতনা ও ধর্মীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের মনে এ যাবত খলিফার কার্যকলাপের প্রতি যে সংশয় ছিল না, তা এখন সূচিত হয়।

খারেজিদের উদ্ভব ও নাশকতামূলক তৎপরতা :

হযরত আলী (রা.) এবং মুয়াবিয়া (রা.)-এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে ইতিহাসে 'খারেজি' নামে একটি নতুন ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের উদ্ভব হয়। তারা সর্বদা নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত থেকে খিলাফতের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট করে। খারেজিরা হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফতের এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয়া খিলাফতেও অরাজকতা সৃষ্টি করে।

হযরত আলী (রা.) এর মৃত্যু এবং গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা :

খলিফা হযরত আলী (রা.) ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দের খারেজি সম্প্রদায়ের আবদুর রহমান ইবনে মুলজাম কর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথেই খিলাফতের অবসান ঘটে এবং মুয়াবিয়া (রা.) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হয়ে বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও ঐক্যে ফাটল ধরে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক পি. কে. হিট্টি বলেন,'বংশানুক্রমে সংঘটিত যে সংঘর্ষসমূহ ইসলামের ভিত্তিমূলকে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত ও শক্তিহীন করে তার উৎপত্তি এখানেই নিহিত।'

উমাইয়াদের নৃশংস কার্যাবলি ও এর প্রতিক্রিয়া :

হযরত আলী (রা.) ও মুয়াবিয়া (রা.) মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে পরবর্তীকালে ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা; মারজরাহিতের যুদ্ধ, আরাফাতের যুদ্ধ এবং কারবালার মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞের দ্বারা ইমাম হুসাইন পরিবারের হৃদয়বিদারক পরিসমাপ্তি ঘটে। উমাইয়াদের এ সমস্ত নৃশংস কার্যাবলি মুসলমানদের মনকে গুরুতরভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে। এ সমস্ত নৃশংস কার্যাবলির প্রতিক্রিয়া পরবর্তীকালে উমাইয়া বংশের পতনের পটভূমি রচনা করেছিল।

হযরত আলী (রা.) এর ব্যর্থতার কারণ

রাজনৈতিক সরলতা :

হযরত আলী (রা.) যোদ্ধা ও বিদ্বান হিসেবে মুয়াবিয়া (রা.) অপেক্ষা অধিকতর শ্রেষ্ঠ হলেও রাজনীতিবিদ হিসেবে তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শ উপেক্ষা করে তিনি মুয়াবিয়া (রা.) এর ন্যায় প্রভাবশালী শাসনকর্তাকে অপসারণ করে রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচয় দেন। কিন্তু মুয়াবিয়া (রা.) এর মত বিচক্ষণ ও শক্তিশালী ব্যক্তির সাথে সৌহার্দ্য রক্ষা করে চললে হযরত আলী (রা.) তাঁর রাজনৈতিক জীবনের দুর্যোগ এড়াতে ও খিলাফতের শক্তি সঞ্চয়ে সক্ষম হতেন। কিন্তু তিনি সিফফীনের যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের মুহূর্তে যুদ্ধ বন্ধ করে এবং পরবর্তী সময়ে মুয়াবিয়া (রা.) এর সাথে অহেতুক আপোষ মীমাংসা করে নিজের পতনকে ত্বরান্বিত করেন।

হযরত উসমান (রা.) এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদানে দীর্ঘ সূত্রীতা :

হযরত আলী (রা.) খিলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে হযরত তালহা, হযরত যুবাইর, হযরত আয়েশা ও মুয়াবিয়া (রা.)হযরত উসমান (রা.)-এর হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদানের দাবি জানান। খিলাফতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকায় হযরত আলী (রা.) হত্যাকারীদের শাস্তি প্রদানের ব্যাপারটি স্থগিত রেখে মারাত্মক ভুল করেন এবং পরিণামে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনেন।

হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সুবিধা :

উষ্ট্রের যুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতির জন্য প্রকৃতপক্ষে হযরত উসমান (রা.) এর হত্যার অপরাধীরাই ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অবস্থার চাপে পড়ে অথবা ঘটনাচক্রে হযরত আলী (রা.) কে তাদের উপর নির্ভর করতে হয়। অন্য কথায় তারা হযরত আলী (রা.)-এর প্রধান সমর্থক হয়। এতে মুয়াবিয়া (রা.) হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধে দুস্কৃতিকারীদের প্রশ্রয় ও আশ্রয়দানের অভিযোগ আনার সুযোগ পান। এ অপপ্রচার সাধারণ মানুষের মনে খলিফার প্রতি বিষিয়ে তুলে এবং তারা খলিফার আন্তরিকতায় সন্দিহান হয়ে ওঠে। এটিও হযরত আলী (রা.)-এর ব্যর্থতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

হযরত তালহা ও হযরত জুবাইয়ের মৃত্যুতে হযরত আলী (রা.)-এর ক্ষতি :

খিলাফতের উপর স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার সময় খলিফা হযরত আলী (রা.) পাননি। কেননা হযরত আলী (রা.)-এর খিলাফত প্রাপ্তির চতুর্থ মাসে সংঘটিত উষ্ট্রের যুদ্ধে হযরত তালহা, হযরত জুবাইর ও হযরত আয়েশা (রা.)-এর সম্মিলিত সৈন্য বাহিনীর বিরুদ্ধে তাঁকে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ যুদ্ধে জয়লাভের ফল হযরত আলী (রা.)-এর কোনো লাভ হল না। কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে দুস্কৃতিকারীগণ কর্তৃক হযরত তালহা ও হযরত জুবাইর (রা.) এর হত্যার ফলে হযরত আলী (রা.) এর শক্তি হ্রাস পায়। অপরদিকে হযরত আলী (রা.) উষ্ট্রের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার সুযোগে মুয়াবিয়া (রা.) যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। অধিকন্তু হযরত আয়েশা (রা.) এর সাথে হযরত আলী (রা.) প্রকাশ্য সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ায় মহানবি (সা.)-এর ধর্মভীরু অনুসারীদের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে হযরত আলী (রা.) ব্যর্থ হন। এই পরিস্থিতিও মুয়াবিয়া (রা.) এর জন্য বিশেষ সুযোগের সৃষ্টি হয়েছিল।

হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রা.) এর সরলতা :

হযরত আলী (রা.) দুমার মীমাংসায় তাঁর পক্ষে বয়োবৃদ্ধ ও সরলমনা হযরত আবু মুসা আল-আশআরী (রা.) কে সালিস নিয়োগ করে মারাত্মক ভুল করেন। কারণ আবু মুসা (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) এর সালিস আমর ইবন আল-আস (রা.) এর কৌশলের অন্তর্নিহিত গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন নি। কাজেই চরম সমস্যাপূর্ণ ব্যাপারে এহেন সরলমনা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীলতা হযরত আলী (রা.) এর পতনকে ত্বরান্বিত করেছে।

কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতা :

মদিনা হতে কুফায় রাজধানী পরিবর্তন করে হযরত আলী (রা.) মারাত্মক ভুল করেন। এর ফলে তিনি মক্কা-মদিনার প্রভাবশালী কুরাইশদের আস্থা হারান। কেননা কুফাবাসীরা কুরাইশ আভিজাত্যের পরিপন্থী ছিল। তাছাড়া তাদের কোনো চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল না। তারা ছিল অত্যাধিক চপলমতি ও আবেগপ্রবণ। গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে তিনি তাদের নিকট হতে আশানুরূপ সাহায্য ও সহানুভূতি লাভে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে মুয়াবিয়া (রা.) এর শক্তির উৎস সিরিয়ার জনগণ সকল অবস্থায় তাঁর পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছিল।

বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ :

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ বিশেষ করে মিসর, বসরা, পারস্যে বিদ্রোহ দেখা দেওয়ায় হযরত আলী (রা.) মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হন। এ বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে মুয়াবিয়া (রা.) মিসর দখল করে নিজের বিজয়ের পথকে সুপ্রশস্ত করেছিলেন।

হযরত আলী (রা.) এর শাহাদাত, ২৭ জানুয়ারি, ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ

বিদ্রোহী খারেজিগণ হযরত আলী (রা.), মুয়াবিয়া (রা.) ও আমর ইবন আল-আস (রা.) কে ইসলামের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনাশের কারণ বলে দায়ী করে। তাই তারা এ তিনজনকে একই দিনে হত্যা করার গোপন ষড়যন্ত্র করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, কুফা, দামেস্ক ও ফুসতাতের মসজিদ হতে নামাজের ইমামতি শেষে ফেরার পথে তিনজন আততায়ী তাদের প্রাণ সংহার করবে। সৌভাগ্যক্রমে আমর (রা.) নির্দিষ্ট দিনে মসজিদে অনুপস্থিত ছিলেন। মুয়াবিয়া (রা.) সামান্য আহত হলেও প্রাণে রক্ষা পেলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আবদুর রহমান ইবন মুলজামের বিষাক্ত ছুরির অব্যর্থ আঘাতে হযরাত আলী (রা.) গুরুতররূপে আহত হন (২৪ জানুয়ারি, ৬৬১ খ্রিঃ)। ৬৬১ খ্রিঃ ২৭ জানুয়ারি হযরত আলী (রা.) শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে ধর্মীয় সারল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত খুলাফায়ে রাশেদিনের পবিত্র খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে।

হযরত আলী (রা.) এর চরিত্র ও কৃতিত্ব

আদর্শ চরিত্র :

ঐতিহাসিক মাসুদীর বর্ণনা মতে, মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) রক্তিম বর্ণবিশিষ্ট, দীর্ঘশ্মশ্রু, ঘনভ্রূসহ প্রশস্ত নেত্র ও উজ্জ্বল টাকবিশিষ্ট মধ্যম আকৃতির দেহের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের একনিষ্ঠ প্রেমিক, বিশ্বাসে দৃঢ়, রণক্ষেত্রে সাহসী, ব্যক্তিগত আচরণে ন্যায়পরায়ণ এবং আলোচনায় সুবিজ্ঞ হযরত আলী (রা.) ইসলামি গুণাবলির মহান আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তিনি ছিলেন সকল যুদ্ধে নবির বিশ্বস্ত সঙ্গী, পূর্ববর্তী খলিফাদের সুহৃদ ও পরামর্শদাতা, রিক্তের বন্ধু, ধর্মের অনুসারী এবং ন্যায়পরায়ণতার প্রতীক।

সরল ও অনাড়ম্বর জীবন :

মহানবি (সা.) ও ইসলামের আদর্শসমূহের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভালোবাসা হিসেবে হযরত আলী (রা.)-এর জীবন সরলতা ও সংযমে বিভূষিত ছিল। তিনি ছিলেন সরলতা ও আত্মত্যাগের মূর্ত প্রতীক। মুসলিম জাহানের খলিফা হয়েও তিনি এবং তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতেমা (রা.) স্বহস্তে সংসারের কাজ করতেন। দরিদ্রতা ছিল তাঁর নিত্য সঙ্গী। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি থাকা-খাওয়া, বেশভূষা ইত্যাদিতে মহানবি (সা.) ও পূর্ববর্তী খলিফাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। স্বচ্ছ, সরল, অনাড়ম্বর ও নিষ্কলুষ জীবন যাপন করতে তিনি গর্ববোধ করতেন। কর্ণেল ওসবর্ণ তাঁকে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মবিশিষ্ট মুসলমান' বলে অভিহিত করেছেন।

ইসলামের সেবা :

হযরত আলী (রা.) মাত্র দশ বছর বয়সে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। বালকদের মধ্যে তিনিই প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। মহানবি (সা.) তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে 'আসাদুল্লাহ' (আল্লাহর সিংহ) উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর সামরিক দক্ষতা ও দূরদর্শিতার কারণেই ইসলামি রাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বহু নতুন পরিকল্পনা সংযোজিত হয়েছিল।

তাঁর পাণ্ডিত্য :

হযরত আলী (রা.) অসাধারণ পাণ্ডিত্য, স্মৃতি শক্তি ও জ্ঞান-গরিমার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি কুরআন, হাদিস, কাব্য দর্শন ও আইনশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। কুরআনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবেও তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হাদিস বা সুন্নাহ সংরক্ষণেও তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। তাঁর লিখিত 'দীওয়ানে আলী' আরবি সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁরই তত্ত্বাবধানে আবুল আসওয়াদ সর্বপ্রথম আরবি ব্যাকরণ রচনা করেন। এ সমস্ত কারণে আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেন, 'আমি জ্ঞানের নগরী এবং আলী এর দ্বারস্বরূপ।'

দূরদর্শিতা ও কঠোরতার অভাব :

হযরত আলী (রা.) মহানুভব, দয়ালু, সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর চরিত্রের বহু গুণের সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সতর্কতা ও সময়োপযোগী তৎপরতার অভাব দেখা যায়। সমঝোতা এবং আপোসের মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান করতে চেয়ে তিনি মারাত্মক ভুল করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে উইলিয়ম মূইর বলেন, 'সমঝোতা এবং দীর্ঘসূত্রতা তাঁর পতনের অনিবার্য কারণ হয়েছে।' বস্তুত তাঁর সদাশয়তা ও উদারতার সুযোগ গ্রহণ করে স্বার্থন্বেষী মহল তাঁর চরম সর্বনাশ করে। ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন, 'তাঁর চরিত্রে যদি উমরের কঠোরতা থাকত তবে তিনি দুর্দান্ত আরবজাতিকে আরও কৃতকার্যতার সাথে শাসন করতে সমর্থ হতেন। কিন্তু তাঁর ক্ষমাশীলতা ও উদারতাকে ভুল বুঝা হল এবং তাঁর সদাশয়তা ও সত্যপ্রিয়তাকে শত্রুগণ নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার করল।' ফলে তাঁকে খিলাফত ও নিজের জীবন বিসর্জন দিতে হয়।

ইমাম হাসান (রা.) ৬৬১ খ্রিষ্টাব্দ

খলিফা হযরত আলী (রা.) এর ইন্তেকালের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ইমাম হাসান (রা.) কুফাবাসিগণ কর্তৃক খলিফা মনোনীত হন। মক্কা ও মদিনার অধিবাসীগণ তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নেন। তিনি ছিলেন রাজনীতি ও সমরনীতিতে অনভিজ্ঞ। রাজনীতি অপেক্ষা ধর্মচর্চায় তাঁর বেশি আগ্রহ ছিল। প্রকৃতপক্ষে, খিলাফতের চরম সংঘাতের দিনে তিনি মুসলিম জাহানের রাজনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণের অনুপযোগী ছিলেন। ইমাম হাসানের (রা.) ন্যায় সরল ও দুর্বল ব্যক্তিকে খলিফা নিযুক্ত করা মুয়াবিয়া (রা.) এর পথ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ইতোপূর্বে তিনি শুধু সিরিয়া ও মিসরের অধিপতি ছিলেন। এখন নিজেকে সমগ্র মুসলিম জাহানের একচ্ছত্র খলিফা বলে ঘোষণা করেন। ফলে আরব জাহানের দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী খিলাফতের সূত্রপাত হল এবং ইমাম হাসানের (রা.) সাথে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

মুয়াবিয়া (রা.) খিলাফতের এই অনিশ্চয়তা দূরীকরণার্থে বিপুল সৈন্যসহ কুফা আক্রমণ করেন। ইমাম হাসান (রা.) তাঁর ৪০,০০০ সৈন্যবাহিনীকে দুই ভাবে বিভক্ত করে মুয়াবিয়া (রা.) এর সিরিয়া বাহিনীর গতিরোধের জন্য সেনাপতি কায়েসের নেতৃত্বে ১২,০০০ সৈন্যসহ একটি দল প্রেরণ করেন এবং প্রধান সৈন্যদলসহ তিনি মাদায়েনের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। সেনাপতি কায়েস প্রাণপণে সিরীয় বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে তাদের প্রতিরোধ করতে থাকেন। এদিকে স্বভাব সুলভ কূটনীতিবিদ মুয়াবিয়া (রা.) গুজব ছড়ালেন যে, কায়েস যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত ও নিহত হয়েছেন। এতে ইমাম হাসানের (রা.) সৈন্য দলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল।

ইমাম হাসান (রা.) সৈন্যবাহিনীকে এ গুজবে বিশ্বাস না করে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে নির্দেশ প্রদান করলে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং লুটতরাজ শুরু করে। কুফাবাসীদের বিশ্বাসঘাতকতায় ইমাম হাসান (রা.) বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং ভগ্ন হৃদয়ে কুফা ত্যাগ করে পারস্যের রাজধানীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

অবশেষে ইমাম হাসান (রা.) মুয়াবিয়ার (রা.) এর নিকট বশ্যতামূলক এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেন। সন্ধির শর্তানুসারে ইমাম হাসান (রা.) মুয়াবিয়া (রা.) এর অনুকূলে খিলাফত ত্যাগ করতে এবং মুয়াবিয়া (রা.) খুৎবায় হযরত আলী (রা.) এর প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ বন্ধ করতে সম্মত হন। সৈয়দ আমীর আলী উল্লেখ করেছেন যে, মুয়াবিয়া (রা.)এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.)-এর দ্বিতীয় পুত্র হযরত হুসাইন (রা.) খিলাফত লাভ করবেন– এরূপ একটি শর্তও মুয়াবিয়া (রা.) মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক পি. কে. হিট্টি, উইলিয়াম, মুইর, তাবারী প্রমুখ বিজ্ঞ ঐতিহাসিকদের বর্ণনায় এ শর্তের কোনো উল্লেখ নেই।

এরপর ইমাম হাসান (রা.) সপরিবারে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করে রাজকোষ হতে বৃত্তি ভোগ করতে থাকেন এবং রাজনীতি হতে সম্পূর্ণ অবসর গ্রহণ করেন। অবশেষে ৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে মুয়াবিয়া (রা.) এর পুত্র ইয়াজিদের প্ররোচনায় স্বীয় স্ত্রী কর্তৃক বিষ প্রয়োগে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শিয়া সম্প্রদায়

উৎপত্তি :

'শিয়া' শব্দটির অর্থ দল। ইতিহাসে হযরত আলী (রা.) এর দল সাধারণত শিয়া নামে পরিচিত। শিয়া মাযহাব প্রথমে রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু পরে ধর্মীয় মাযহাবে পরিণত হয়। খলিফা হিসাবে হযরত আবু বকর (রা.) এর নির্বাচনের সময় হতে শিয়া আন্দোলনের বীজ বপন করা হয়। মহানবি (সা.) এর ওফাতের সময় তাঁর জামাতা হযরত আলী (রা.) খলিফা হবেন বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দাবি উপেক্ষিত হলে আলীর সমর্থকগণ নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে। অতঃপর হযরত উমর (রা.) ও হযরত উসমান (রা.) যখন খলিফা পদ লাভ করেন, তখনও আলীর সমর্থকগণ তাঁকে খলিফা হিসেবে পাবার আশা পোষণ করেছিল। এভাবে আলীর (রা.) সমর্থকগণ তাঁকে না জানিয়ে তাঁর দাবির স্বপক্ষে গোপন আন্দোলন শুরু করে।

সিফফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.) এর পরাজয় এবং পরবর্তীকালের খারিজীদের হাতে তাঁর মৃত্যু ইসলামে দলীয় বিরোধের ক্ষেত্র আরও প্রসারিত করল এবং তাঁর সমর্থকদের যে দলটি রাজনৈতিক দল হিসেবে গড়ে ওঠেছিল, তাদের উদ্দেশ্যকে আরও বলিষ্ঠ করে তুলল। মুয়াবিয়া (রা.) সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলে এ দলটি 'শিয়া' নাম গ্রহণ করল। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা হযরত আলী (রা.)-এর সমর্থকদের মধ্যে প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্বলিত করল। কারবালার বিয়োগান্তক ঘটনা শিয়াদের ইতিহাসে যুগান্তর সৃষ্টি করে। অধ্যাপক পি. কে. হিট্টির মতে, 'হুসাইনের রক্ত শিয়া মাযহাবের বীজ বলে প্রমাণিত হয় এবং ১০ মুহররম তারিখে শিয়া মতবাদ জন্মলাভ করে।' এভাবে হযরত-হুসাইনের হত্যার ফলে ধর্মীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায় হিসেবে শিয়া মতবাদের জন্ম হয়।

উমাইয়া ও আব্বাসীয় আমলে :

শিয়া মতবাদ পারস্যে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করে। উমাইয়া শাসনে অসন্তুষ্ট হয়ে পারসিকগণ শিয়াদের উদ্দেশ্য সমর্থ করে। তারা এই মতবাদকে স্বীকৃতি দান করে। হযরত আলীর বংশের খিলাফতের অধিকার পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে তারা উমাইয়া বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। উমাইয়া বংশকে খিলাফতের অধিকার হতে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে শিয়া সম্প্রদায়

আব্বাসীয় প্রচারণায় যোগদান করে। আব্বাসীয় আমলে তাদের দাবি পূরণ না হলে তারা বিদ্রোহের চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আব্বাসীয়দের হাতে তাদের পরাজয়ের পর কিছু বিদ্রোহী উত্তর আফ্রিকায় পলায়ন করে এবং ইমাম হুসাইনের অন্যতম বংশধর ইদ্রিসের নেতৃত্বে সেখানে একটি রাষ্ট্র গঠন করে।

শিয়া মতবাদ :

১. মহানবি (সা.)-এর পর হযরত আলী (রা.) এর খিলাফতের স্বীকৃতি এবং আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমার (রা.) এর বংশধরদের মধ্যে পুরুষাণুক্রমিক খিলাফতের অধিকার নিয়ে শিয়া মতবাদের সূচনা হয়। শিয়াদের মতে, ইমামত বা নেতৃত্বে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)–এর বংশধরদের বংশগত অধিকার এবং সে কারণে তা হযরত আলী (রা.) ও তাঁর পত্নী নবি-নন্দিনী হযরত ফাতিমা (রা.) এর বংশধরদের মধ্য সীমাবদ্ধ। ইমামতের মতবাদ শিয়াদের নিকট ইমানের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হয়।

২. হযরত আলী (রা.) এর ইমামতের সংগতি রক্ষার জন্য শিয়ারা প্রথম তিন খলিফা এবং উমাইয়া ও আব্বাসীয় খলিফাগণকে খিলাফতের অবৈধ দাবিদার মনে করে।

৩. শিয়ারা কালিমায়ে তাইয়িব 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহম্মাদুর রসুলুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রাসুল)-এর সঙ্গে 'আলী খলিফাতুল্লাহ' (আলী আল্লাহর প্রতিনিধি) কথাটি সংযোজন করে থাকে।'

৪. শিয়াদের মতে, ইমাম মুসলিম সমাজের একচ্ছত্র নেতা। তিনি আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত এবং তাঁর নির্বাচনের ব্যাপারে মানুষের কোনো অধিকার নেই। কারণ মানুষের নির্বাচন কখনও কখনও ত্রুটিপূর্ণ হয়।

৫. শিয়ারা ধারণা পোষণ করে যে, দ্বাদশ ইমাম মুহম্মদ আল-মুনতাজার 'মাহদী' হয়ে সত্যিকার ইসলামের পুনরুদ্ধার, সমগ্র বিশ্বজয় ও কিয়ামতের পূর্ববর্তী সহস্রাব্দের সূচনা করার জন্য আবির্ভূত হবেন।

৬. শিয়াদের বিশ্বাস হযরত আলী (রা.) হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর নিকট হতে আধ্যাত্মিক শক্তির আলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর দেহে আল্লাহর পবিত্র গৌরবের রোশনী প্রতিফলিত হয়েছিল। শিয়াদের মতে ইমাম বা আধ্যাত্মিক নেতার মধ্যে অভ্রান্ততা ও নিষ্পাপতার দুটি গুণ যুগপৎ বিদ্যমান থাকে।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন (নমুনা)

১। সাওরাইল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নোমান সাহেবের মৃত্যুর পর ফারহান সাহেব চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ফারহান সাহেব চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়ে অনেক সমস্যা ও বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হন। এ সময় কিছু ভণ্ডপীর ও ইউনিয়নের কর দিতে অস্বীকারকারীগণ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটান। কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব অত্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সাথে এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন। এ জন্য তাঁকে বিশেষ উপাধীতে ভূষিত করা হয়

ক. 'রিদ্দা' শব্দের অর্থ কী?

খ. মজলিস উস-শূরা বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফারহান সাহেবের সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন খলিফার সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত খলিফাকে ইসলামের ত্রাণকর্তা বলা যায় কী? মতামত দাও।

২। আল মদীনা নামক সমবায় সমিতির আওতা বেড়ে গেলে এটির সম্পদ-সম্পত্তিও অনেকগুণ বেড়ে যায়। ফলে পরিচালনা কর্তৃপক্ষ সমিতির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। তাছাড়া সম্পদ-সম্পত্তি সংরক্ষণ ও লভ্যাংশ বিলি-বন্টনের জন্য একটি আলাদা কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে একটি ক্যাশ কাউন্টার স্থাপন করে। এ কার্যালয় সকল প্রকার মুনাফা সংগ্রহ করে কোষাগারে জমা রাখে এবং সদস্যদের মধ্যে তা সুষ্ঠভাবে বন্টন করে দেয়।

ক. 'সিদ্দিক' কোন খলিফার উপাধী?

খ. জিযিয়া বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকের উপদেষ্টা পরিষদ গঠনে হযরত উমরের (রাঃ) কোন নীতি অনুসৃত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে সমিতির সম্পদ-সম্পত্তি সংরক্ষণ ও বিলি-বন্টনে হযরত উমর (রাঃ) প্রতিষ্ঠিত দিওয়ান ও বায়তুল মাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য লক্ষণীয় উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

৩। জনাব হাসিব ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে রাজ্যে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যে পূর্বের শাসকের নিযুক্ত প্রাদেশিক গভর্ণদের বরখাস্ত করেন। হাবিল নামক গভর্ণর ব্যতীত অন্যান্য গভর্ণরগণ তাঁর নির্দেশের প্রতি সম্মান দেখান। তাছাড়া হাবিল সাহেব পূর্বেকার শাসকের সময়ে অনেক সরকারি সম্পত্তির মালিক ছিলেন। হাসিব সাহেব হাবিল সাহেবের সরকারি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। পরিশেষে উভয়ের মধ্যে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ক. 'সাইফুল্লাহ' কার উপাধী?

খ. খারেজি সম্প্রদায় বলতে কী বুঝ?

গ. উদ্দীপকের সংঘর্ষের দ্বারা তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন সংঘর্ষের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত সংঘর্ষে খলিফার ব্যর্থতার ফলে ইসলামে গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতন্ত্রের সূচনা হয়- উক্তরের স্বপক্ষে তোমার মতামত দাও।

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। খলিফা কারা?

(ক) হযরত আবুবকর (রা.) (খ) মুসলিম উম্মাহর নেতা

(গ) প্রশাসনিক সর্বোচ্চ কর্মকর্তা (ঘ) পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি

২। ন্যায় পরায়ণতা > দৃঢ়চিত্ততা > ?

ইবনে খালদুন নির্ধারিত খলিফার গুণাবলির মধ্যে প্রশ্ন বোধক (?) চিহ্নিত স্থানে বসবে-

(ক) গণতন্ত্রমনা (খ) চরিত্রবান

(গ) কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানের অধিকারী (ঘ) ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সুস্থতা

৩। হযরত আবু বকর (রা) কত খ্রিস্টাব্দে খিলাফত লাভ করেন?

(ক) ৫৮২ (খ) ৬১০

(গ) ৬৩২ (ঘ) ৬৪৪

হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতেকালের পর মুসলমানদের এমন সব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় যে যদি আল্লাহতায়ালা হযরত আবুবকর (রা) এর মাধ্যমে আমাদের উপর করুনা করতেন তাহলে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম।

উপরের অনুচ্ছেদ পড় এবং ৪-৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

৪। এখানে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতাম বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়েছে।

(ক) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) পরিবারবর্গকে (খ) খলিফা গণকে
(গ) মুসলমানদেরকে (ঘ) সাহাবিগণকে

৫। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর ইনতেকালের পর মুসলমানদের যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তা হচ্ছে–

i. ভন্ড নবির আবির্ভাব
ii. বিশিষ্ট সাহাবিদের ইনতেকাল
iii. স্বধর্ম ত্যাগীদের বিদ্রোহ

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) iii
(গ) i এবং ii (ঘ) i এবং iii

৬। হযরত আবুবকর (রা.)-এর মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ বলতে বোঝানো হয়েছে–

(ক) রিদ্দা যুদ্ধে জয়লাভ (খ) ইসলামি শাসন বা খেলাফত সুসংহত করণ
(গ) যাকাত আদায়ে কৃতিত্ব (ঘ) ইরাক বিজয়

৭। তার উপাধী ছিল 'ফারুক'– এখানে কার কথা বলা হয়েছে?

(ক) হযরত আবুবকর (রা.) (খ) হযরত উমর (রা.)
(গ) হযরত উসমান (রা.) (ঘ) হযরত আলী (রা.)

৮। নামারিকের যুদ্ধ, জসরের যুদ্ধ, ওয়ারেবের যুদ্ধ ইত্যাদি কোন অঞ্চল বিজয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট।

(ক) পারস্য (খ) ইরাক
(গ) সিরিয়া (ঘ) রোমান সাম্রাজ্য

শ্রেনি কক্ষে শিক্ষক বললেন, হযরত উমর (রা.) ইসলামের অন্যতম বিজেতা, তার সময়ে ইসলাম বিস্তৃতি লাভ করেছিল। শাসন কার্য পরিচালনায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৯-১১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৯। হযরত উমরের সামরিক বিজয় সমূহের অন্যতম ছিল

(ক) পারস্য বিজয় (খ) জালুলার যুদ্ধ
(গ) কাদেসিয়ার যুদ্ধ (ঘ) মাদায়েন বিজয়

১০। শাসনকার্যে উমরের কৃতিত্বের পরিচয় হচ্ছে

i. সাম্রাজ্যকে প্রদেশে বিভক্ত করা
ii. রাজস্ব ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন
iii. অমুসলিমের প্রতি বিদ্বেষ

কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i এবং iii
(গ) ii এবং iii (ঘ) i, ii এবং iii

১১। যুন নূরাইন উপাধি দেয়া হয় কোন খলিফাকে?

(ক) আবুবকর (রা.) (খ) হযরত উমর (রা.)

(গ) হযরত উসমান (রা.) (ঘ) হযরত আলী (রা.)

হযরত উসমান (রা.) খিলাফতের প্রথমার্ধ খুব শান্তিপূর্ণভাবে অতিক্রম করেন। দ্বিতীয়ার্ধে তার বিরুদ্ধে অযথা নানা অভিযোগ উত্থাপন করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১২-১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

১২। হযরত উসমান (রা.)-এর খিলাফতের প্রথমার্ধ বলতে কতো বছর সময়কালকে বুঝানো হয়েছে?

(ক) ৪ (খ) ৫

(গ) ৮ (ঘ) ১২

১৩। হযরত উসমান (রা.)-এর বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ উত্থাপিত হয় তা হচ্ছে

i. চারণভূমির ব্যক্তিগত ব্যবহার

ii. স্বজন প্রীতি

iii. জবরদস্তি

কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) iii

(গ) i এবং ii (ঘ) ii এবং iii

১৪। হযরত উসমান (রা.) কুরআন শরীফে অগ্নি সংযোগ করেছিলেন কেন?

(ক) ইসলাম ধ্বংস করা

(খ) কুরআন শরীফ নিশ্চিহ্ন করা

(গ) কুরআনের ভুল পাণ্ডুলিপি ধ্বংস করা

(ঘ) নিজের কৃতিত্ব দেখানো।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমন

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় উপমহাদেশের পরিচিতি ও সামগ্রিক অবস্থা

ভারতীয় উপমহাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম উপমহাদেশ। বিশাল ও বিস্তৃত এই উপমহাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে মায়ানমার এবং পশ্চিমে ইরান ও আরব সাগর অবস্থিত। বহু জাতি, বহু ধর্ম ও বহু ভাষাভাষি পৃথিবীর প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক ভারতীয় উপমহাদেশে বাস করে। প্রাচীন কালে ভারত নামে এক হিন্দু রাজা এদেশ শাসন করতেন। সম্ভবত তারই নামানুসারে এদেশের নাম ভারতবর্ষ হয়েছে।

মুসলিম বিজয়ের পূর্বে ভারতের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা

রাজনৈতিক অবস্থা : বস্তুতপক্ষে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতে কোনো কেন্দ্রীয় সরকার ছিল না। ফলে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হয়। যেমন :

কাশ্মীর : সপ্তম শতাব্দীতে কাশ্মীরে কর্কট বংশীয় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা ললিতাদিত্য অত্যন্ত উচ্চভিলাষী নৃপতি ছিলেন। তিনি মাতানের বিখ্যাত সূর্যমন্দির নির্মাণ করে ধর্ম ও স্থাপত্য অনুরাগের পরিচয় দেন। কিন্তু নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে কর্কট বংশ শক্তিহীন হয়ে পড়লে উৎপল বংশ কাশ্মীরের শাসন ক্ষমতা লাভ করে।

কনৌজ : অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে যশোবর্মণ এ রাজ্যের রাজা ছিলেন। তার সময়ে কনৌজ রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও সামরিক মর্যাদায় রাষ্ট্র হিসেবে উত্তর ভারতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে।

মালব : মালব প্রতিহার রাজপুত্র বংশ কর্তৃক শাসিত হয়। প্রথম নাগভট্টের অধীনে প্রতিহারগণ এতই প্রতাপশালী হয়ে উঠেছিল যে, আরবগণ যখন জুনায়েদের নেতৃত্বে প্রতিহার রাজ্যের পশ্চিমাংশ আক্রমণ করে তখন তারা আরবদেরকে পরাজিত করে তাদের রাজ্যের সুরক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল।

গুজরাট : গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর জনৈক গুরজর প্রধান গুজরাটের ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত গুরজর বংশ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কাল পর্যন্ত সেখানে রাজত্ব করে।

বুন্দেলখণ্ড : চান্দেলা বংশ নবম শতাব্দীতে বুন্দেলখণ্ডে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

আজমির ও দিল্লি : মুসলিম অভিযানের প্রাক্কালে আজমির ও দিল্লিতে শক্তিশালী চৌহান বংশীয় রাজপুতগণ রাজত্ব করত।

সিন্ধু : বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত সিন্ধু প্রদেশ হর্ষবর্ধনের রাজ্যভুক্ত ছিল। তবে আরব অভিযানের সময় চাচের পুত্র দাহির সিন্ধুর শাসনকর্তা ছিলেন। দাহিরের কুশাসনে তার রাজ্যে রাজনৈতিক বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং এর ফলে সেনাপতি মুহম্মদ-বিন-কাসিম সহজেই সিন্ধু বিজয় করতে সক্ষম হয়।

বাংলা : রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় মারাত্মক গোলযোগ দেখা দিলে অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলার জনসাধারণ একত্রিত হয়ে গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে তাদের শাসন কর্তা মনোনীত করলে পাল রাজা বংশের শাসন শুরু হয়।

সামাজিক অবস্থা : প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। জাতিভেদ হিন্দু সমাজের ঐক্য ও সংহতির মুলে কুঠারাঘাত করে। হিন্দু সমাজ মূলত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারটি স্তরে বিভক্ত ছিল। হিন্দুগণও চার বর্ণভুক্ত ছাড়া অপরাপর সকলকে অস্পৃশ্য মনে করত।

সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের প্রবল প্রতাপ ছিল। ব্রাহ্মণগণ সাধারণত ধর্ম-কর্ম, আচার-অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকতেন। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধ-বিগ্রহ, বৈশ্যগণ ব্যবসা -বাণিজ্য ও শূদ্রগণ ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষিকাজ ও সাধারণ কাজকর্ম করত। আন্তঃসাম্প্রদায়িক বিবাহের উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। হিন্দুরা একাধিক বিবাহ করতে পারত কিন্তু বিধবা বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল না। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীর সহ মরণ বরণ করতে হত। এ ঘৃণ্য প্রথাই সতীদাহ প্রথা নামে পরিচিত ছিল। জনসাধারণের অধিকাংশ নিরামিষভোজী ছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা : অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল থেকে একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসেবে পরিচিত এবং জনসাধারণ মোটামুটি অভাবমুক্ত ছিল। দেশে শিল্প-বাণিজ্য যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। তৎকালে বাংলা কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানির জন্য বিখ্যাত ছিল। কৃষিকাজই ছিল জনসাধারণের প্রধান পেশা। কৃষকেরা কঠোর পরিশ্রম করলেও অভিজাত ও উচ্চ শ্রেণির লোকেরা বিলাসবহুল জীবন-যাপন করত। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জনগণের জীবন দুঃখ-দুর্দশায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠত।

ধর্মীয় অবস্থা : মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কালে ভারতবর্ষে প্রধানত তিনটি ধর্ম বিরাজমান ছিল-বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম ও হিন্দুধর্ম। জৈনধর্ম তত জনপ্রিয় ছিল না এবং বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হওয়ার পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল। হিন্দুধর্ম ছিল দেশের প্রধান ধর্ম। অধিকাংশ রাজাই ছিলেন হিন্দু এবং তাঁরা হিন্দুধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই করতেন।

প্রশাসনিক ব্যবস্থা : প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় রাজাই ছিলেন সর্বেসবা। সকলক্ষেত্রে তাঁর মতামতই ছিল চূড়ান্ত। তিনি ন্যায় বিচারেরও উৎস ছিলেন। সাম্রাজ্য বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশ আবার কতগুলো জেলায় বিভক্ত ছিল। দেশের শাসন ব্যবস্থায় পল্লীগ্রাম ছিল সর্বনিম্ন ইউনিট।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরবদের সিন্ধু ও মুলতান অভিযান

৬৩৬-৩৭ খ্রিস্টাব্দে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর আমলে মুসলমানগণ ভারত অভিযানের প্রথম প্রচেষ্টা শুরু করে। কিন্তু দূরাভিযানের বিপদ এবং দুঃখ-দুর্দশার কথা বিবেচনা করে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) এবং উমাইয়া খলিফা মুয়াবিয়ার শাসনামলেও অভিযানের চেষ্টা করা হয়। সর্বশেষ বিখ্যাত উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালি-বিন-আবদুল মালিকের শাসনামলে পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মুহম্মদ-বিন-কাসিমের নেতৃত্বে ভারতের সিন্ধু ও মুলতান অঞ্চলে মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

সিন্ধু অভিযানের কারণ

উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সময় হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফকে পূর্বাঞ্চলীয় গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। এ সময় কতিপয় আরব বিদ্রোহী সীমান্ত অতিক্রম করে সিন্ধু রাজা দাহিরের নিকট আশ্রয় লাভ করে। হাজ্জাজ বিদ্রোহীদের প্রত্যার্পণের দাবী জানালে রাজা দাহির তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাছাড়া উমাইয়াদের পারস্য অভিযানের সময় সিন্ধুর শাসনকর্তা পারস্যবাসীকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিল।

পারস্য বিজয়ের ফলে মুসলিম সাম্রাজ্যের সীমা সিন্ধুদেশের অতি সন্নিকটে এসে পড়ে। ভারতীয় হিন্দু রাজাদের বৈরী মনোভাব ও সামরিক উস্কানীতে উমাইয়া খিলাফতের প্রতি হুমকি এবং খলিফা ওয়ালিদ ও গভর্নর হাজ্জাজের রাজ্য জয়ের ইচ্ছাই মুসলমানদের সিন্ধু অভিযানে ইন্ধন যোগায়।

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের সাথে আরব বণিকদের বাণিজ্যিক যোগসূত্র ছিল। সিন্ধুর সামুদ্রিক বন্দর দেবলের নিকট জলদস্যূগণ কর্তৃক মুসলমানদের বাণিজ্যিক জাহাজ লুণ্ঠনই ছিল সিন্ধু অভিযানের প্রধান ও প্রত্যক্ষ কারণ। কথিত আছে আরব বণিকদের পরিবার পরিজন ও উপঢৌকন নিয়ে আটটি জাহাজ সিংহল হতে আরবের পথে রওয়ানা হলে দেবল বন্দরের নিকট জলদস্যু কর্তৃক জাহাজগুলো লুন্ঠিত ও পরিবার পরিজন বন্দী হবার খবর শুনে হাজ্জাজ মর্মাহত হয়ে দ্রব্য ও বন্দীদের ফেরত দেওয়ার এবং অপরাধীদের শাস্তি প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে দাহিরকে পত্র পাঠান। কিন্তু রাজা দাহির তাতে অসম্মতি জানালে হাজ্জাজ ক্রুদ্ধ হয়ে খলিফা ওয়ালিদের অনুমতিক্রমে সিন্ধু বিজয়ের উদ্দেশ্য সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। প্রথমে ওবায়দুল্লা ও পরে বুদাইলের নেতৃত্বে পরপর দুটি অভিযান প্রেরণ করে ব্যর্থ হলে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ-বিন-কাসিমের নেতৃত্বে তৃতীয় অভিযান প্রেরণ করেন।

মুহাম্মদ-বিন-কাসিমের নেতৃত্বে সিন্ধু ও মুলতান অভিযান

হাজ্জাজের নির্দেশে মুহাম্মদ-বিন-কাসিম ৬০০০ সিরীয় ও ইরাকি যোদ্ধা, ৬০০০ উষ্ট্রারোহী এবং ৩০০০ রসদবাহী উষ্ট্র নিয়ে আরকানের মধ্য দিয়ে সিন্ধুর দিকে অগ্রসর হয়ে ৭১২ খ্রিস্টাব্দে দেবল দূর্গে এসে উপস্থিত হলেন। ইতোমধ্যে হাজ্জাজ-বিন-ইউসুফ জলপথে আজানিক বা আল-আরুস বা কনে নামক অস্ত্রশস্ত্রসহ অপর একটি সেনাবাহিনী তার সাহায্যার্থে পাঠালেন। দেবল দুর্গে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে হিন্দুদের শোচনীয় পরাজয় ও দেবল মুসলমানদের হস্তগত হয়।

দেবল অধিকার করার পর মুহাম্মদ-বিন-কাসিম প্রথমে আধুনিক হায়দ্রাবাদের নিকটে অবস্থিত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অধীনস্ত নিরুন ও অপর ক্ষুদ্র শহর সিওয়ান এবং সিসাম অধিকার করেন। মুসলমান সেনাপতির এরূপ অপ্রত্যাশিত বিজয়ে সিন্ধুরাজা দাহির সৈন্য-বাহিনী নিয়ে রাওয়ারে গমন করেন এবং তাদের পথরোধ করে দাড়ালেন। ৭১২ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে উভয় সৈন্যবাহিনীর ঘোরতর যুদ্ধ শুরু হলে দাহির বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে রাজা দাহির নিহত হলেন। রাজার মৃত্যুতে সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল এবং তারা যুদ্ধক্ষেত্র হতে পালিয়ে গেল। পরবর্তীতে প্রায় বিনাযুদ্ধে সিন্ধুর রাজধানীসহ সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

অতঃপর মহুম্মদ-বিন-কাসিম হিন্দুদের শক্তির শেষ উৎস মুলতান অভিমুখে অগ্রসর হয়ে রাভা নদীর তীরে অবস্থিত সিকা (উচ্) নামক দুর্গ অধিকার করলেন। মুলতানের হিন্দুরা প্রায় দুই মাস দুর্গটি রক্ষা করতে সক্ষম হলেও শেষ পর্যন্ত ৭১৩ খ্রিস্টাব্দে পরাজিত ও বিধ্বস্ত হল।

মুহম্মদ-বিন-কাসিমের রণনৈপুণ্য এবং শাসন কৃতিত্ব ভারতে মুসলিম শাসনের ইতিহাস এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছে। তিনি একাধারে কবি, দক্ষ সেনাপতি, বিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও সুশাসক ছিলেন। তিনি শত্রুর প্রতি কঠোর এবং মিত্রের প্রতি পরম দয়ালু ছিলেন। ৭১২ থেকে ৭১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় সোয়া তিন বছরের শাসনামলে তিনি স্থানীয় ব্রাহ্মণদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। তাদের ধর্মে তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। তিনি দেবলে একটি মসজিদ নির্মাণ ও প্রথম মুসলিম সেনানিবাস স্থাপন করেন।

সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল

ভারতবর্ষের ইতিহাসে সিন্ধু বিজয় নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই বিজয় আরবিয় মুসলমানদের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার সামুদ্রিক বাণিজ্যের পথকে প্রসারিত ও সুগম করে তুলেছিল। আরবদের প্রভাব সিন্ধুর বিভিন্ন এলাকায় কয়েকটি বাণিজ্য কেন্দ্রও স্থাপিত হয়।

এই বিজয়ের ফলে আরববাসী সর্বপ্রথম এই দেশীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসে। হিন্দু ও মুসলমান দুটি ভিন্ন জাতির সহাবস্থানের ফলে দেশের সমাজ ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। সামাজিক জীবনে তারা একে অন্যের রাজনীতি অনেকাংশে গ্রহণ করেন। আরব সৈনিকদের মধ্যে অনেকেই সিন্ধু দেশে বসতি স্থাপন করে সিন্ধু রমনীদের বিবাহ করে। এভাবে আর্য এবং সেমিটিক জাতির সংমিশ্রণে একটি নতুন জাতির উদ্ভব ঘটে। এ জাতিই ভারতে পরবর্তীকালে ইন্দো-আরবিয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে ইতিহাসে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

আরব বণিকদের সাথে ধর্মপ্রচারকগণ অনেক পূর্বকাল থেকে এদেশে আগমন করলেও সিন্ধু অভিযানের পরই তারা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের শাশ্বত বাণী ছড়িয়ে দেন। এই বিজয়ের সূত্র ধরে পরবর্তীকালে যে সকল আউলিয়া ও পীর-দরবেশ এই দেশে ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন তাঁদের মধ্যে দিল্লির হযরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া (রা.), আজমীরের খাজা মঈন উদ্দিন চিশতী (রা.), চট্টগ্রামের বায়োজিদ বোস্তামী (রা.), বগুড়ার সৈয়দ মাহমুদ সারওয়ার (রা.), সিলেটের হযরত শাহজালাল (রা.), রংপুরের হযরত কারামত আলী (রা) প্রমুখের নাম সবিশেষে উল্লেখযোগ্য। এদের প্রচারিত সাম্য, মৈত্রী, সহিষ্ণুতা ও উদারতা নির্যাতিত হিন্দু সম্প্রদায়কে আকৃষ্ট করে এবং তারা দলে দলে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়। বস্তুতঃ এই ভারতীয়, আরবিয় ও পারসিক চিন্তাধারার সংযোগেই সুফী মতবাদ ভারতীয় উপমহাদেশে বিস্তার লাভ করে।

মুসলিম সংস্কৃতির উপর সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল ছিল গভীর ও সুদূরপ্রসারী। হিন্দুধর্ম, দর্শন, আয়ুর্বেদশাস্ত্র, জ্যোর্তির্বিদ্যা, গণিত, সংগীত, লোকণীতি, সাহিত্য, দাবা, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প প্রভৃতি বিষয়ে আরবিয়গণ ভারতীয়দের নিকট হতে প্রভূত জ্ঞান লাভ করে। আরবের বহু শিক্ষার্থী এদেশে আগমন করে বিভিন্ন শাস্ত্রাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেন। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ভারতীয় বহু গ্রন্থ আরবি ভাষায় অনূদিত হয়। আরবরা ভারতীয়দের কাছ হতেই গাণিতিক সংখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ করে ছিলেন।

সুতরাং বলা যায় আরবিয় মুসলমানরা এদেশে সর্বপ্রথম ন্যায়নীতি ও উদারতার ভিত্তিতে শ্রেণিহীন এক নতুন সমাজ গঠনে ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। মুসলমানদের আগমনের ফলে এদেশে বর্ণভেদের কঠোরতা হ্রাস পায় এবং নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা কুশাসনের ভীতি হতে উত্তরণের প্রেরণা লাভ করে। ইসলামের সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে শান্তি ও স্বস্তি আনয়ন করেছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সুলতান মাহমুদ

গজনির সুলতান মাহমুদ (৯৯৭-১০৩০) প্রাথমিক জীবন ও সিংহাসনে আরোহণ : গজনীর অধিপতি সবুক্তগনী কর্তৃক ৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তুর্কি গজনবী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সবুক্তগীনের পুত্র মাহমুদ ৯৭১ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি যুদ্ধবিদ্যা, শাসন পদ্ধতি এবং রাজনীতিবিদ্যা সম্পর্কে যথেষ্ট শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। পিতার মৃত্যুর পর স্বীয় ভ্রাতা ইসমাইলকে পরাজিত ও কারারুদ্ধ করে ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে ২৬ বছর বয়সে মাহমুদ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য : গজনির সুলতান মাহমুদ ১০০০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট ১৭ বার ভারত অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্রত্যেকটি অভিযানেই জয়লাভ করেন। কিন্তু কী কারণে ও উদ্দেশ্যে সুলতান মাহমুদ বারবার ভারত অভিযান পরিচালনা করেন, সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এখন আমরা সংক্ষেপে তাঁর ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করব।

ধর্মীয় উদ্দেশ্য :

কতিপয় ঐতিহাসিক ধারণা যে, পৌত্তলিকতার ধ্বংস সাধন করে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমুদ ভারত অভিযান করেছিলেন। তাঁদের মতে, আব্বাসীয় খলিফা কাদির বিল্লাহ্ সুলতান মাহমুদের উপর ভারতে ইসলাম প্রচারের দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন। এ দায়িত্ব পালনের জন্যই মাহমুদ বার বার ভারতে অভিযান চালান এবং এ উপমহাদেশে ইসলামের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেন। তাদের যুক্তি হল, হিন্দুদের সুবিখ্যাত নগরকোট মন্দিরসহ অসংখ্য মন্দির তাঁর হস্তে বিধ্বস্ত হয়। কতিপয় রাজাসহ ভারতের বহু সহস্র হিন্দুকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে আমরা উপরে উল্লিখিত মতকে সত্য বলে গ্রহণ করতে পারি না। কারণ–

সুলতান মাহমুদ ধর্ম প্রচারক ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত বিজেতা। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান হলেও তিনি অন্যের উপর কখনও জোর করে তাঁর ধর্মমত চাপিয়ে দেন নি। তিনি একটি বিরাট হিন্দু সৈন্যদল পোষণ করতেন। এই হিন্দু সৈন্যরা মুসলমান সৈন্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করত। যদি সুলতান মাহমুদের ধর্মীয় উদ্দেশ্য থাকত তাহলে স্বধর্মীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব হত না। ধর্ম প্রচারের জন্য রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতার প্রয়োজন। সুলতান মাহমুদের অভিযানগুলোর পিছনে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করার কোনো উদ্দেশ্যই নিহিত ছিল না। তাছাড়া সুলতান মাহমুদ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত সহিষ্ণু। গজনিতে তিনি হিন্দুদের বসবাসের জন্য একটি পৃথক কলোনী স্থাপন করেন এবং হিন্দু সংস্কৃতি ও স্থানীয় সাহিত্য বিকাশের জন্য তথায় একটি কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন। তাই ধর্মীয় উদ্দেশ্য তাঁর ভারত অভিযানের পিছনে ছিল না।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য :

সুলতান মাহমুদ মধ্য-এশিয়ায় একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন। এই উদ্দেশ্যেই তাঁকে স্বীয় সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কিছু অংশ এবং পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্তি অপরিহার্য ছিল। ঐসব অঞ্চলে অধিকার করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতোপূর্বে তাঁর পিতা সবুক্তগীন ও জয়পালের মধ্যে কয়েকটি যুদ্ধও সংঘটিত হয়। পিতা কর্তৃক সমস্যাটির চূড়ান্ত সমাধান না হওয়ায় সুলতান মাহমুদ পাঞ্জাব ও মুলতানকে স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করে শক্তিশালী গজনি সাম্রাজ্য গঠন করেন। পরবর্তীকালে তাঁর এ ব্যবস্থা বানচাল করতে যে সব হিন্দু রাজা সক্রিয় ও তৎপর ছিলেন তাঁদেরকে এবং সন্ধির শর্তভঙ্গকারী, বিশ্বাসঘাতক ও শত্রুপক্ষকে সাহায্যদানকারী শাসকগণকে শাস্তিদানের উদ্দেশ্যেই সুলতান মাহমুদ ভারত অভিযান পরিচালনা করেন।

অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য :

ভারতবর্ষ ছিল ধনসম্পদে সমৃদ্ধ একটি বিরল দেশ। গজনির শাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, একটি বিরাট সেনাবাহিনী পোষণ ও তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ প্রদান করা এবং গজনিকে সমগ্র বিশ্বে একটি সমৃদ্ধশালী ও সুসজ্জিত নগরীতে পরিণত করার জন্য সুলতান মাহমুদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। তাই ভারতবর্ষের অফুরন্ত ধন-সম্পদ তাকে প্রলুব্ধ করে। ভারতবর্ষ থেকে ধনরত্ন আহরণ করেই তাঁর এসব মহাপরিকল্পনা বাস্তবে রূপদান করতে চেয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই সুলতান মাহমুদ ভারতবর্ষ অভিযানে উদ্বুদ্ধ হন। আরও স্পষ্ট করে বলা যায় যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারতবর্ষের নৃপতিদেরকে দুর্বল করে রেখেই সুলতান মাহমুদ মধ্য এশিয়াই একটি নির্বিঘ্ন ও নিষ্কন্টক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছিলেন।

সুলতান মাহমুদের প্রধান অভিযানসমূহ

সুলতান মাহমুদ ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও উদ্যমী। বাগদাদের খলিফা কাদির বিল্লাহর নিকট হতে স্বীয় সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি আদায়ের পর তিনি ১০০০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ১৭ বার ভারত আক্রমণ করেন। তার অভিযানগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

১. ভারতবর্ষে সুলতান মাহমুদ ১০০০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম অভিযান পরিচালিত করে খায়বার গিরিপথে অবস্থিত ভারতের কয়েকটি সীমান্ত নগরী এবং দুর্গ অধিকার করেন।

২. ১০০১ খ্রিস্টাব্দে ১০,০০০ সেনাবাহিনী নিয়ে সুলতান মাহমুদ পাঞ্জাবের রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেন। পেশোয়ারের নিকট উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে জয়পাল পরাজিত এবং অনুচরবর্গসহ বন্দী হন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রদান করে জয়পাল মুক্তিলাভ করলেও অপমানে ও ক্ষোভে পুত্র আনন্দ পালের উপর রাজ্যের শাসনভার অর্পণ করে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন।

৩. সুলতান মাহমুদ ১০০৪ খ্রিস্টাব্দে ভীরার রাজ্য বিজয় ও ১০০৬ খ্রিস্টাব্দে মুলতানের শাসনকর্তা আবুল ফাতাহ এর বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে জয় লাভ করেন।

৪. ১০০৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি পাঞ্জাবের শাসনকর্তা আনন্দ পালের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। আনন্দপাল তাকে বাধা দেবার জন্য এক বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন করে অগ্রসর হন। উন্দ নামক স্থানে উভয়ের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে মাহমুদ জয়ী হন এবং প্রচুর ধনসম্পদ হস্তগত হয়।

৫. ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ কাংড়া পাথরের নগর কোট দুর্গ দখল ও ১০১০ খ্রিস্টাব্দে মুলতানের বিদ্রোহী শাসনকর্তা দাউদকে পরাজিত করেন।

৬. ১০১৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আনন্দপালের পুত্র ত্রিলোচন পালের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে তাকে পরাজিত করে রাজধানী নন্দনা অধিকার করেন। একই বৎসর সুলতান মাহমুদ থানেশ্বরের বিরুদ্ধেও অভিযান প্রেরণ করে জয়লাভ করেন।

৭. ১০১৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ হিন্দুস্থানী সাম্রাজ্যের রাজধানী কনৌজের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করে ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে কনৌজের ফটকের সম্মুখে উপনীত হন। কনৌজের প্রতিহারে রাজ্যপাল ভীত হয়ে বিনাশর্তে সুলতান মাহমুদের বশ্যতা স্বীকার করেন। এতে প্রতিবেশী রাজ্যের রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে কালিঞ্জরের চান্দেলী রাজা গোন্ডার নেতৃত্বে রাজ্যপালকে আক্রমণ করে হত্যা করেন। সুলতান মাহমুদ এতে ক্ষিপ্ত হয়ে ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে চান্দেলা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে তাকে পরাজিত করেন।

৮. ১০২১-২২ খ্রিস্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়র ও ১০২৩ খ্রিস্টাব্দে গোন্ডার দুর্গ অধিকার করেন।

৯. সোমনাথ বিজয় সুলতান মাহমুদের সাধ্যের বাইরে বলে পুরোহিতগণ আস্ফালন করলে সুলতান মাহমুদ এক বিরাট ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে ১০২৬ খ্রিস্টাব্দে ৬ই জানুয়ারি সোমনাথের দ্বারে এসে উপনীত হন। হিন্দু রাজন্যবর্গ তাঁর গতিরোধকল্পে সংঘবদ্ধ হয়ে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হন। কিন্তু মুসলিম সেনাবাহিনীর অমিত বিক্রম, সাহস, তেজস্বীতা, যুদ্ধস্পৃহা ও রণকৌশলের নিকট হিন্দু সৈন্যগণ পরাজিত হয়। সুলতান মাহমুদ হিন্দুদের যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত অফুরন্ত-ধন-রত্ন হস্তগত করেন।

১০. সোমনাথ অভিযান হতে প্রত্যাবর্তন কালে মুসলিম সৈন্যগণ জাঠদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল বলে সুলতান মাহমুদ তাদের বিরুদ্ধে ১০২৭ খ্রিস্টাব্দে সপ্তদশ ও শেষ অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। যুদ্ধে জাঠগণ পরাজিত হলে তাদের অধিকাংশকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

সুলতান মাহমুদের ভারত অভিযানের ফলাফল

সুলতান মাহমুদ তাঁর বিজয়াভিযানসমূহ দ্বারা উত্তর ভারতীয় রাজ্যগুলোর আর্থিক বুনিয়াদ ধ্বংস করেন এবং অগণিত ধনরত্ন ও ঐশ্বর্য-বৈভব লাভ করেন। তা দ্বারা স্বীয় গজনি সাম্রাজ্যকে সমৃদ্ধিশীল ও গৌরবান্বিত করে গড়ে তোলেন। সুলতানের যুদ্ধ ও শান্তিকালীন মহাপরিকল্পনাসমূহ বাস্তবায়নে ভারতের সম্পদ তাঁকে সহায়তা দান করায় তিনি দ্রুত সাফল্য লাভে সমর্থ হন।

সুলতান মাহমুদের আক্রমনের ফলে মুসলিম যোদ্ধাদের সাথে স্বেচ্ছায় অনেক পীর-দরবেশও ভারতে আসেন এবং ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। ফলে ক্রমান্বয়ে উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য লোক ইসলাম গ্রহণ করে।

সুলতান মাহমুদের অভিযানের ফলে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদান এবং সমঝোতা হওয়ার পথ সুগম হয় এবং উভয়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নবযুগের সূত্রপাত হয়। তিনি শুধুমাত্র পাঞ্জাবেই স্থায়ীভাবে স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সেখান হতে হিন্দু রাজাদের রাজনৈতিক ও সামরিক দুর্বলতা লক্ষ্য করার সুযোগ লাভ করে। এটা পরবর্তীকালে মুসলমানগণ কর্তৃক ভারত বিজয়ের পথকে সহজসাধ্য করে তোলে।

সুলতান মাহমুদের সাফল্যের কারণ

সুলতান মাহমুদ একজন সুদক্ষ সেনা নায়ক ও প্রখ্যাত বিজেতা ছিলেন। সমর কুশলতা ও সামরিক মেধায় সেই যুগে কোনো নৃপতিই তার সমকক্ষ ছিলেন না। কঠোর অনুশীলন, প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলার দ্বারা তিনি একটি সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন। তাই হিন্দু বাহিনী মুসলমানদের অপেক্ষা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অনৈক্য অসাম্য ও অরাজকতা তাদের সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে দেয়। যা মাহমুদের বিজয়ে সহায়ক হয়েছিল। তাছাড়া সকল যুদ্ধ সুলতান মাহমুদের স্বয়ং উপস্থিতি মুসলিম সৈন্যদের মনে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করত। ফলে তাদের বিজয়লাভ সহজতর হয়। একদিকে জেহাদের মর্মবাণী ও ধর্মীয় পুন্যলাভের প্রেরণা এবং অপরদিকে যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য-সামগ্রী লাভের আকাঙ্ক্ষা মুসলিম সেনাবাহিনীকে মৃত্যুভয় তুচ্ছ জ্ঞান করে নেতার আদেশ পালনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল এবং শত্রুর বিরুদ্ধে অজেয় করে তোলে।

সুলতান মাহমুদের চরিত্র

সুলতান মাহমুদ সাহসী, ধৈর্যশীল ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তার চরিত্রে উচ্চাভিলাষ ও আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। শাসক হিসাবে তিনি প্রজাদের প্রতি দয়ালু ও সুবিবেচক ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রগাঢ় ধর্মনিষ্ঠ, আত্মপ্রত্যয়ী, অধ্যবসায়ী, কর্তব্যপরায়ন ও পর ধর্ম সহিষ্ণু ছিলেন। হিন্দুদেরকে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে ধর্মকর্ম করার অনুমতি দান করেন এবং বসবাসের জন্য নগরীতে আলাদা এলাকার ব্যবস্থা করেন। মানব সমাজের এই মহান নেতা ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে গজনিতে পরলোক গমন করেন।

সুলতান মাহমুদের উত্তরাধিকারীগণ

সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর তার দুই পুত্র মাসুদ এবং মুহাম্মদের মধ্যে উত্তরাধিকার স্বত্ব নিয়ে যুদ্ধশুরু হয়। যুদ্ধে মাসুদ জয়ী হয়ে ভ্রাতা মুহাম্মদকে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করেন। মাসুদ ছিলেন উদার ও সাহসী। তবে তিনি সেলজুক ও তুর্কি বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন নি এবং মার্ভের নিকট যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। সৈন্যবাহিনী তার অন্ধ ভ্রাতা মুহম্মদকে সিংহাসনে বসাল। পরে মুহম্মদ তার পুত্র আহমেদকে শাসনভার অর্পণ করলে সে মাসুদকে কারাগারে হত্যা করে। এদিকে মাসুদের পুত্র মওদুদ ক্ষীপ্ত হয়ে মুহম্মদের সমগ্র পরিবারের বিনাস সাধন করেন। নয় বছর রাজত্ব করার পর মওদুদ মৃত্যুমুখে পতিত হলে কয়েকজন দুর্বল শাসক গজনীর সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। কিন্তু তারা কেউই সেলজুকদের আক্রমণ প্রতিহত করতে পারেন নি। এই বংশের শেষ সুলতান ছিলেন খসরু মালিক। তিনি ১১৮৬ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদ ঘুরীর নিকট পরাজিত হন।
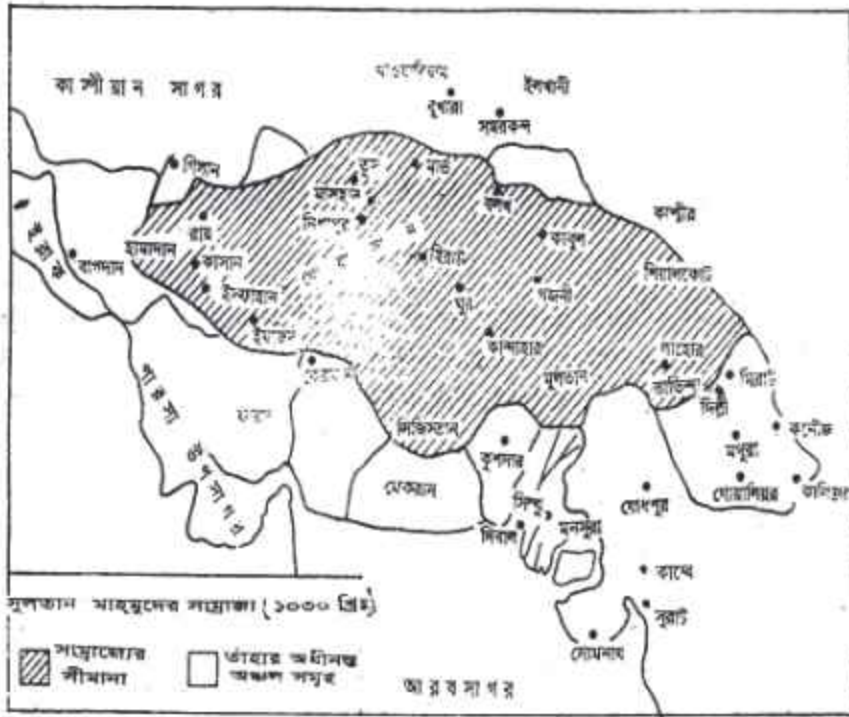
চিত্র ঃ সুলতান মাহমুদের সাম্রাজ্য।

গজনী বংশের পতনের কারণসমূহ :

প্রথমত : গজনি বংশের পরবর্তীকালের কোন শাসকই সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করে রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করে নি। কাজেই জনসমর্থনের অভাবে গজনী বংশের পতন ঘটে।

দ্বিতীয়ত : ভারতীয় উপমহাদেশ হতে আহরিত অগণিত ধন-রত্ন সুলতান মাহমুদের উত্তরাধিকারিগণকে আরামপ্রিয় ও বিলাসী করে তোলে। ফলে তারা শত্রুর আক্রমণ হতে সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে।

তৃতীয়ত: হত্যা, ষড়যন্ত্র, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বিভিন্ন দলের মধ্যে পরস্পর স্বার্থ সংঘাত সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূল দুর্বল করে। ফলে তাদের পতন ঘটে।

মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধ :

আফগানিস্তানের অন্তর্গত হিরাত ও গজনির মধ্যবর্তী পার্বত্যাঞ্চলে ঘুর রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। দশম শতাব্দীতে এটি একটি স্বাধীন রাজ্য ছিল। কিন্তু ১০০৯ খ্রিস্টাব্দে ঘুররাজ মুহাম্মদ বিন সুরকীকে পরাজিত করে সুলতান মাহমুদ ঘুর রাজ্যটি অধিকার করেন। সুলতান মাহমুদের দুর্বল ও অযোগ্য উত্তরাধিকারিগণের সুযোগে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ বিন সাম যিনি ইতিহাসে শিহাবউদ্দিন মুহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত, তিনি ঘুর রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তৃতীয় পর্যায়ে অভিযান পরিচালনা করে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বপ্রথম স্থায়ী মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গৌরব অর্জন করেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মুহম্মদ ঘুরী

মুহম্মদ ঘুরীর আক্রমণকালে উত্তর-ভারতের অবস্থা

রাজনৈতিক অবস্থা

মুহম্মদ ঘুরীর আক্রমণকালে ভারতবর্ষের রাজনীতি গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। সমগ্র ভারত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পরস্পর গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কোনো কেন্দ্রীয় শক্তি না থাকায় সমগ্র ভারতে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল। দেশের এ পরিস্থিতিতে মুহম্মদ ঘুরী অতিসহজেই ভারত জয় করে এ উপমহাদেশে মুসলিম সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পাঞ্জাব : সমগ্র পাঞ্জাব গজনি সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। খসরু শাহ ওজ বা সেলজুক তুর্কিদের দ্বারা গজনী হতে বিতাড়িত হয়ে পাঞ্জাবে আশ্রয় গ্রহণ করলে তাঁর উত্তরাধিকারিরা পাঞ্জাবে বসতি স্থাপন করেন। লাহোর তাঁদের রাজধানীতে পরিণত হয়। খসরু মালিক ছিলেন গজনি বংশের শেষ সুলতান। মুহম্মদ ঘুরীর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাঁর অযোগ্যতার জন্য গজনি সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।

মুলতান : কারামতী শিয়া আবুল ফতাহ দাউদকে পরাজিত করে সুলতান মাহমুদ মুলতান জয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর কারামতীরা এর স্বাধীনতা পুনরায় ফিরে পায়। মুহম্মদ ঘুরী যে সময় ভারত আক্রমণ করেন সে সময় মুলতানে কারামতী শিয়া সম্প্রদায় রাজত্ব করছিল।

সিন্ধু : সিন্ধু ছিল মুলতানের দক্ষিণে। সুলতান মাহমুদ সিন্ধু জয় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সুমরা নামক স্থানীয় একটি গোত্র যুদ্ধ করে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে। কারামতীদের ন্যায় তারাও শিয়া মুসলমান ছিল।

রাজপুত বংশ : উত্তর-ভারতের অবশিষ্ট অংশে কতিপয় শক্তিশালী রাজপুত বংশ শাসন করছিল। এ শক্তিশালী রাজপুত বংশগুলোর মধ্যে দিল্লি ও আজমিরের চৌহান বংশ, কনৌজের গাহড়বাল বা রাঠোর বংশ, মালবের পারামার বংশ, গুজরাটের চালুক্য বা বাঘেলা বংশ, বুন্দেলখণ্ডের চান্দেলা বংশ, চেদীর কলচুরী বংশ এবং বিহার ও বাংলার পাল ও সেন বংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল।

দিল্লি ও আজমির : দিল্লি ও আজমিরের চৌহান রাজ্য ছিল সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী। এ রাজ্যের বিখ্যাত রাজা ছিলেন পৃথ্বীরাজ রায়। প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর সাথে প্রায়ই তাঁর সংঘর্ষ হতো। তিনি মুসলিম আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য রাজপুত রাজাদের নিয়ে একটি মিত্রসংঘ গঠন করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মুসলমানদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

কনৌজ : কনৌজের গাহড়বাল বংশ এ সময় খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গোবিন্দ চাঁদ ছিলেন এ বংশের একজন খ্যাতনামা শাসক। তাঁর সময়ে কনৌজের রাজ্য সীমানা পাটনা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। গোবিন্দ চাঁদের পর বিজয় চাঁদ রাজা হন। তিনি তাঁর পূর্বপুরুষের আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করেন। জয়চাঁদ ছিলেন এ বংশের শেষ রাজা । তিনিও পরে মুহম্মদ ঘুরীর হস্তে পরাজয় বরণ করেন।

গুজরাট : মুহম্মদ ঘুরী যখন ভারতে অভিযান চালান তখন দ্বিতীয় ভীম গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন।

বিহার ও বাংলা : পূর্ব-ভারতে দুটি বিখ্যাত রাজপুত রাজ্য ছিল, একটি হল পাল এবং অপরটি সেন রাজ্য। এক সময় সমগ্র বঙ্গ ও বিহার পাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণ ভারত হতে সামন্ত সেন বিহার ও বাংলায় এসে পালদের পরাজিত করে সেন বংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের সময় লক্ষণ সেন বাংলায় রাজত্ব করছিলেন। গৌড় ছিল তার রাজধানী। মুহাম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের অনুমতিক্রমে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজী লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলা অধিকার করেন।

সামাজিক অবস্থা

মুহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের পূর্বে ভারতবর্ষে সামাজিক অনাচার, জাতিভেদ, হিংসা-বিদ্বেষ, কোন্দল চরম আকার ধারণ করে। জাতিভেদ হিন্দু সমাজকে দ্বিধাবিভক্তই করে নি, তাদের সামাজিক কাঠামোতে চরম আঘাত হানে। হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এ চার শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। এ চার শ্রেণি চারটি পৃথক পেশায় নিয়োজিত ছিল এবং তাদের মধ্যে কোনরূপ ঐক্য ও সংহতি ছিল না, বরং উচ্চ বর্ণের নিপীড়নের ফলে নিম্ন শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। হিন্দু সমাজে সামাজিক কুসংস্কার ব্যাপক আকার ধারণ করে। এমন সামাজিক অবস্থায় মুহাম্মদ ঘুরীর ভারতবর্ষে অভিযান ছিল সময়োপযোগী ও আশীর্বাদস্বরূপ। যার ফলে ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা তার জন্য সহজতর হয়েছিল।

মুহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান ও ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা

মুহম্মদ ঘুরী ছিলেন একজন উচ্চভিলাষী সুলতান। তাই গজনীতে স্বীয় ক্ষমতার নিরাপত্তা বিধান করে তিনি ভারতে রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করেন। তার ভারত অভিযানের পশ্চাতে কয়েকটি কারণ ছিল।

অভিযানের কারণসমূহ :

প্রথমত: চির বৈরী সেলজুক এবং গজনি রাজবংশের মধ্যে সংঘর্ষের সুযোগে আফগানের সাইবানী ঘুরী উপজাতীয় দল ক্রমশ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে আধিপত্য বিস্তার করে। মুহম্মদ ঘুরী গজনীতে স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে ভারতবর্ষ অভিযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মাহমুদের মতো তিনি অভিযানকারী ছিলেন না; কারণ তিনি বিজেতার মর্যাদা লাভ করেন। রাজ্য প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত : সুলতান খসরু মালিক গজনি পরিত্যাগ করে লাহোর বসবাস করতে থাকেন এবং ফলে গজনী রাজ্য সংকুচিত হয়ে পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। গজনিতে রাজবংশের উপস্থিতিতে ঘুরী বংশের নিরাপত্তা এবং প্রভূত্ব ক্ষুণ্ন হতে পারে- এ কথা মনে করে মুহম্মদ ঘুরী খসরু মালিকের বিরুদ্ধে অভিযান করেন।

তৃতীয়ত : গজনি রাজ্যের মতো ঘুরী সুলতানগণ মধ্য-এশিয়ায় রাজ্য বিস্তারে শুধু ব্যর্থই হন নি, বরং খাওয়ারিজম শাহের ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধিতে শংকিত হয়ে উঠেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিন মুহম্মদ রাজধানী ঘুরে সুদৃঢ়রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে উত্তরে খাওয়ারিজম শাহের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অপরদিকে তাঁর প্রতিনিধি কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুইজউদ্দীন মুহম্মদ গজনিকে প্রধান কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করে সোজা পূর্বদিকে গোমাল গিরিপথের মধ্য দিয়ে ভারতে অভিযান করে রাজ্য বিস্তার করেন।

মুহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানসমূহ

মুলতান ও উচ দখল : ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মুলতানের বিরুদ্ধে মুহম্মদ ঘুরীর প্রথম অভিযান পরিচালিত হয়। এ রাজ্যটি তখন কারামতি শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের দ্বারা শাসিত হচ্ছিল। মুহম্মদ ঘুরী মুলতান অধিকার করে সেখানে একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি সিন্ধুর উচের দিকে অগ্রসর হন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তা দখল করে স্বীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

গুজরাট অভিযানে বিপর্যয় : ১১৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী গুজরাটের রাজধানী আনহিলওয়ারা আক্রমণ করেন। কিন্তু আনহিলওয়ারা রাজা দ্বিতীয় ভীম কর্তৃক তিনি পরাজিত হন।

পাঞ্জাব বিজয় : সিন্ধু ও মুলতানের মধ্যে দিয়ে ভারত জয় করা অসম্ভব মনে করে তিনি পাঞ্জাব জয় করার সংকল্প করলেন। পাঞ্জাব ছিল ভারতের প্রবেশদ্বার। ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী পেশওয়ার অধিকার করেন। অতঃপর তিনি পাঞ্জাবে অভিযান পরিচরলনা করে ১১৮৫ খ্রিষ্টাব্দে শিয়ালকোট অধিকার করেন। ১১৮৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি গজনী বংশের শেষ সুলতান খসরু মালিককে পরাজিত ও বন্দি করলেন। এভাবে পাঞ্জাব দখল করে তিনি গজনী বংশের শাসনের অবসান ঘটান। পাঞ্জাব জয়ের ফলে মুহম্মদ ঘুরীর ভারত জয় আরো সহজতর হয়।

তরাইনের প্রথম যুদ্ধ (১১৯১ খ্রিঃ) : গজনি বংশের পতনের পর মুহম্মদ ঘুরী রাজপুতদের প্রবল বাধার সম্মুখীন হন। মুহম্মদ ঘুরীর দ্রুত সাফল্যে দিল্লি ও আজমিরের চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজ অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী সংগ্রহ করে ঘুর রাজ্যের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। ১১৯১ খ্রিষ্টাব্দে থানেশ্বরের প্রায় ১৪ মাইল দূরে তরাইন নামক স্থানে উভয় বাহিনী মিলিত হল। বহু রাজপুত বীর তাঁর সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। পৃথ্বীরাজের বাহিনীতে ২০ হাজার অশ্বারোহী, ৩ হাজার রণহস্তী ও অসংখ্য পদাতিক বাহিনী ছিল। পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা ও সেনাধ্যক্ষ গোবিন্দ রায় মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ করে পর্যদুস্ত করেন। যুদ্ধে মুহম্মদ ঘুরী তীরবিদ্ধ হয়ে আহত হন এবং মুসলমানগণ পরাজিত ও বিতাড়িত হয়। এই পরাজয় ঘুরীকে ভারত জয়ে আরো ক্ষিপ্ত করে তোলে।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ, (১১৯২ খ্রিঃ) : ভারতবর্ষের রাজ্য বিস্তারের আশায় এবং পরাজয়ের গ্লানি মুছবার উদ্দেশ্যে ১১৯২ খ্রিষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী ১,২০০,০০০ সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত অশ্বারোহীসহ এক বিশাল বাহিনী নিয়ে তরাইনের রণক্ষেত্রে পুনরায় শিবির স্থাপন করেন। পূর্বের মতো এবারেও পৃথ্বীরাজ রাজপুত রাজাদের সম্মিলিত ৩,০০,০০০ সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। তুমুল ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পৃথ্বীরাজের ভ্রাতা গোবিন্দ রায় নিহত হন। পৃথ্বীরাজ পলায়নকালে ধৃত হলে তাঁকে হত্যা করা হয়। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটলেও সুলতান মুহম্মদ ঘুরী অসীম বীরত্ব, উন্নতমানের যুদ্ধ-কৌশল এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার দ্বারা রাজপুত কনপেডারেসীকে নির্মূল করে ভারতে মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের গুরুত্ব : মুসলিম ভারতের ইতিহাসে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, তরাইনের বিজয় ভারতবর্ষে মুসলিম রাজনৈতিক আধিপত্যের ভিত্তি স্থাপন করে। দ্বিতীয়ত, রাজপুত সামরিক শক্তির অজেয়তাকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে। তৃতীয়ত, একটি মুসলিম বাহিনীর একতা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, নির্ভীকতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, নচেৎ পরবর্তী পর্যায়ে ঘুরীর নির্দেশে হানসী, সামানা, মিরাট, কোইল ও দিল্লি থেকে সুদূর বাংলায় সাফল্যজনক সমরাভিযান করা সম্ভবপর হতো না। যুদ্ধ জয়ের ফলে উত্তর ভারত ঘুর রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত হয়।

কুতুবউদ্দীন আইবেক কর্তৃক মিরাট, কোইল ও দিল্লি অধিকার : সম্মিলিত বাহিনীর বিরুদ্ধে বিজয় সাফল্যে উদ্দীপিত হয়ে মুহম্মদ ঘুরী তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর কুতুবউদ্দীন আইবেকের উপর অধিকৃত এলাকাসমূহের শাসনভার ন্যস্ত করে গজনি প্রত্যাবর্তন করলেন। কুতুবউদ্দীন আইবেক ছিলেন রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দক্ষ সেনানায়ক।

প্রভুর বিজিত সাম্রাজ্যের সংহতি বিধান করে তিনি এর সীমানা আরও সম্প্রসারিত করেন। তিনি মিরাট, কোইল (আধুনিক আলীগড়) ও দিল্লি জয় করেন (১১৯৩-৯৪)। তাঁর নব অধিকৃত এলাকা হতে লাহোরে অনেক দূরে অবস্থিত থাকায় তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে দিল্লিকে নির্বাচিত করেন।

কনৌজের জয়চাঁদের বিরুদ্ধে অভিযান : পরবর্তীতে পৃথ্বীরাজের প্রধান শত্রু এবং উত্তর-ভারতের প্রভাবশালী রাজা কনৌজের জয়চাঁদকে দমনের জন্য ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরী পুনরায় ভারতে আগমন করেন। প্রভুর সাহায্যের জন্য কুতুবউদ্দীন তাঁর বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন। চান্দওয়ারের যুদ্ধক্ষেত্রে এ মিলিত শক্তির হাতে রাজা জয়চাঁদ পরাজিত হন। অতঃপর মুসলিম সৈন্যবাহিনী আরও অগ্রসর হয়ে বারানসী দখল করে।

গোয়ালিয়র ও আনহিলওয়ারা বিজয় : অপরদিকে মুহম্মদ ঘুরী গজনি ফিরে গেলেও তাঁর সুযোগ্য প্রতিনিধি কুতুবউদ্দীন আইবেক বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখেন। ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দ্বিতীয় ভীমদেবকে পরাজিত করে গুজরাটের রাজধানী আনহিলওয়ারা অধিকার করেন।

কালিঞ্জর জয় : কুতুবউদ্দীন আইবেক ১২০২ খ্রিষ্টাব্দে বুন্দেলখণ্ডের চান্দেল্যরাজ পরমাদী দেবের রাজধানী কালিঞ্জর আক্রমণ করেন। মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথম দিকে মারাত্মক প্রতিরোধ গড়ে তুললেও চান্দেল্যরাজ শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। ফলে কালিঞ্জর দুর্গ মুসলমানদের হস্তগত হল। এর পর মাহোবা এবং কালপিও মুসলমানদের পদানত হল। এভাবে কুতুবউদ্দীন একের পর এক উত্তর-ভারতের সকল গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কুতুবউদ্দীন আইবক যখন উত্তর-ভারত তাঁর প্রভুর আয়ত্তাধীনে আনতে চেষ্টা করছিলেন, ঠিক সে সময়ে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী পূর্বভারতের বিহার ও বাংলা অধিকার করে মুসলমানদের রাজ্যসীমা সম্প্রসারণ করেন।

মুহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু : ১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে ঘুরী প্রকৃত অর্থে দিল্লি, গজনি ও ঘুর রাজ্যের সুলতানের মর্যাদা লাভ করলেন। অপরদিকে ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দে খাওয়ারিজম শাহের নিকট পরাজিত হলে তাঁর সামরিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়।

সাম্রাজ্যে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়; গজনী এবং মুলতানে তাঁর প্রবেশে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়; ইত্যবসরে পাঞ্জাবে দুর্ধর্ষ খোক্কার উপজাতি অরাজকতা শুরু করে। কুতুবউদ্দীনের সহায়তায় মুহম্মদ ঘুরী খোক্কারদের বিদ্রোহ দমন করেন কিন্তু লাহোর হতে গজনি প্রত্যাবর্তনের পর খোক্কার বংশীয় একজন আততায়ীর হাতে তিনি ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

মুহম্মদ ঘুরীর চরিত্র

সমসাময়িক শাসকদের মধ্যে সুলতান মুহম্মদ ঘুরী ছিলেন নিঃসন্দেহে অনুপম চরিত্রের অধিকারী একজন মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শাসক। তাঁর দূরদর্শী রণনৈপুন্য, নির্ভীকতা, ধার্মিকতা, বিদ্যোৎসাহীতা ও প্রজাবাৎসল্যের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ঐতিহাসিক আবুল কাসিম ফিরিশতা তাঁকে একজন খোদাভীরু, সত্যনিষ্ঠা ও প্রজারঞ্জক শাসক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি পরধর্মে ছিলেন সহিষ্ণু এবং ধর্মীয় গোড়ামি তার মধ্যে ছিল না। হিন্দুদের প্রতি তিনি উদারতার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। তাঁর সেনাদলে অনেক হিন্দু ছিল। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি যে সততা ও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করেছেন তা তাঁর চরিত্রকে উজ্জ্বল করে রেখেছে। তিনি বিজাতীদের প্রতি কঠোর ছিলেন। বিজিত এলাকায় লুণ্ঠনের দিকেও তার আগ্রহ ছিলো না। তিনি ছিলেন দয়ালু, দাতা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। অনুচরদের প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল পিতৃবৎ। ক্ষমা ছিল তাঁর চরিত্রের একটি মহৎ গুণ।

মুহম্মদ ঘুরীর সাফল্যের কারণ

ভারতবর্ষে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ ঘুরী সাফল্য লাভ করেন। তাঁর সামরিক বিজয়ের মূলে প্রধান কারণসমূহ ছিল-

প্রথমত : সমর কুশলী, অসীম বীরত্ব ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী মুহম্মদ ঘুরী পর্বত সঙ্কুল ঘুরী রাজ্যের দুর্ধর্ষ অধিবাসীদের নিয়ে একটি সংঘবদ্ধ সামরিক বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীতে কোনো বিভেদ না থাকায় তারা একটি শক্তিশালী সামরিক শক্তিতে পরিনত হয়ে বীর বিক্রমে এগিয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত : তুলনামূলকভাবে হিন্দু বাহিনী সামাজিক ও ধর্মীয় কারণে মুসলিম বাহিনী অপেক্ষা দুর্বল ছিল। মুহম্মদ ঘুরীর নেতৃত্বে সামরিক বিজয়ের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল উন্নতমানের যুদ্ধ-কৌশল, সৈন্য পরিচালনায় অপূর্ব দক্ষতা, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও নেতৃত্বের প্রতি সৈন্যদের দৃঢ় বিশ্বাস।

তৃতীয়ত : মুহম্মদ ঘুরীর ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনী ও উন্নতমানের অস্ত্রশস্ত্র থাকায় পৃথ্বীরাজের দুধর্ষ বাহিনীকে পরাস্ত করা সম্ভবপর হয়।

ঘুরী বংশের পতন : সুলতান মুহম্মদ ঘুরী ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন নিঃসন্তান অবস্থায়। এ কারণে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী ছিল না এবং তিনি কাউকে মনোনীত ও করেন নি। এর ফলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ। তিনি অযোগ্য ও দুর্বল শাসক ছিলেন। এর ফলে তাঁর পক্ষে বিশাল ঘুরী সাম্রাজ্য, যা ভারতবর্ষে বিস্তারিত ছিল, কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। গিয়াসউদ্দিন মাহমুদের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সামন্তরাজারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন: যেমন- গজনিতে তাজউদ্দীন ইয়ালদুজ, সিন্ধুতে নাসিরউদ্দিন কুবাচা এবং ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের কুতুবউদ্দীন আইবেক। এর ফলে শক্তিশালী অমাত্যদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই সুযোগে খাওয়ারিজমের শাহ ঘুর সাম্রাজ্য দখল করলে ঘুরী বংশের পতন হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

কুতুবউদ্দীন আইবেক (১২০৬-১০ খ্রিস্টাব্দ)

ক্রীতদাস হিসেবে কুতুবউদ্দীনকে অতি বাল্যকালে নিশাপুরের কাজি ফখরউদ্দীন আবদুল আজীজ কুফী ক্রয় করেন এবং তার সন্তানদের সাথে প্রশাসনিক এবং সামরিক শিক্ষা দান করেন। পিতার মৃত্যুর পর কাজির সন্তানেরা তাঁকে একজন বণিকের নিকট বিক্রয় করে এবং কুতুবউদ্দীন গজনিতে আনীত হলে মুইজউদ্দীন তাঁকে ক্রয় করেন। স্বীয় মেধা এবং অধ্যবসায়ের বলে তিনি অতি অল্প সময়ে মুইজউদ্দীন মুহম্মদ ঘুরীর অধীনে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। ক্রমে তিনি আমীর আকুব বা আস্তাবলের প্রধান নিযুক্ত হন। মুহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং এর পুরস্কার স্বরূপ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পর সুলতান গজনীতে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি ভারতের অধিকৃত অঞ্চলের দায়িত্বভার লাভ করেন। ঘুরীর প্রতিনিধি ও শাসনকর্তা হিসাবে কুতুবউদ্দীন প্রথমত বিজিত অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন দ্বারা স্থায়ী প্রভুত্ব কায়েম এবং বিজয়কে সুদূরপ্রসারিত করার জন্য অভিযান অব্যাহত রাখেন। মুহম্মদ ঘুরীর অর্পিত গুরুদায়িত্ব কুতুবউদ্দীন বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেন। ১১৯৩-৯৪ খ্রিষ্টাব্দে কুতুবউদ্দীন মিরাট, হানসী, দিল্লি, রণথম্ভোর, কোইল অধিকার করেন এবং ১১৯৪ খ্রিষ্টাব্দে মুহম্মদ ঘুরীর সাথে যুগ্ম অভিযানে কনৌজ দখল করেন। ১১৯৬-১২০২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বারানসী, কালিঞ্জর, গুজরাট, কনৌজ, মাহোবা প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যা সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে।

এভাবে উত্তর ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে তিনি প্রভুর বিশ্বাসের মর্যাদা বিশেষভাবে রক্ষা করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে মুহম্মদ ঘুরী তাঁকে ভারতের বিজিত অঞ্চলের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে 'মালিক' খেতাবে ভূষিত করেন।

দিল্লির স্বাধীন সুলতান হিসেবে কুতুবউদ্দীন আইবেক

মুহম্মদ ঘুরী ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করলে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসউদ্দীন মাহমুদ ঘুরীর সিংহাসন লাভ করেন। তিনি কুতুবউদ্দীন আইবেকের সুলতান উপাধি প্রদান এবং দাসত্বমোচন লিপি (খাত-ই-আজাদী) সহ রাষ্ট্রীয় চাদোয়া ও অন্যান্য রাজকীয় বিশিষ্ট চিহ্নসমূহ প্রদান করেন। এভাবে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীন দিল্লি সালতানাতের প্রতিষ্ঠা হয় এবং কুতুবউদ্দীনই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা শাসক।

কুতুবউদ্দীন আইবেকের স্বল্পকালীন রাজত্বকাল মুহাম্মদ ঘুরীর বিশিষ্ট অনুচর তাজউদ্দীন ইয়ালদুজের মোকাবিলা এবং খাওয়ারিজমের শাহের মত শক্তিশালী বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় অতিবাহিত হয়। গজনির অধিপতি তাজউদ্দীন ইয়ালদুজ ঈর্ষপরায়ণ হয়ে কুতুবউদ্দীনের শাসনাধীন ভারতের সমগ্র বিজিত অঞ্চলের কর্তৃত্ব গ্রহণের প্রস্তুতি নিলে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় কুতুবউদ্দীন এক যুদ্ধে তাজউদ্দীন ইয়ালদজকে পরাজিত করে গজনি অধিকার করে নেন। কিন্তু তার গজনি অধিকার স্থায়ী হয় নি। কারণ, সৈনিকদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে গজনির অধিবাসীরা তাজউদ্দীনকে গজনীর আধিপত্য গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে তিনি তাদের সহায়তায় কুতুবউদ্দীনকে গজনি ত্যাগে বাধ্য করেন। ফলে গজনির মুসলিম সাম্রাজ্য থেকে ভারত উপমহাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং ভারত উপমহাদেশে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন মুসলিম রাজ্য গড়ে ওঠে। অবশ্য বাংলার শাসনকর্তা বখতিয়ার খলজী এবং মুলতান ও উচের অধিপতি নাসিরউদ্দীন কুবাচা ইতোপূর্বে কুতুবউদ্দীন আইবেকের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেছিলেন। এমতাবস্থায় কুতুবউদ্দীন নিজেকে দিল্লীর সুলতান হিসেবে ঘোষণা করলে স্বাধীন সালতানাতের সূচনা হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি তার শ্রমলব্ধ ফল বেশিদিন ভোগ করতে পারেননি। ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে লাহোরে চৌগান (চৌগান আধুনিক পোলো খেলার মতো এক জাতীয় খেলা। মধ্যযুগের গোড়ারদিকে ইহা ভারত ও পারস্যে খুব জনপ্রিয় খেলা ছিল)। খেলার সময় অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। লাহোরে আনারকলির নিকটে এই মহান বীরকে সমাহিত করা হয়।

বাংলায় অভিযান ও লক্ষণ সেনের পলায়ন : ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী বিহারকে কেন্দ্রস্থল হিসাবে ব্যবহার করে পূর্বদিকে সেনরাজ্যে আক্রমণ করেন। তিনি ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলায় হিন্দু সেন বংশের সর্বশেষ নৃপতি লক্ষণ সেনের রাজধানী নদীয়ায় আগমন করেন। কথিত আছে যে, অশ্ব বিক্রেতার ছদ্মবেশে মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী নিয়ে তিনি আকস্মিকভাবে নদীয়া আক্রমণ করে রাজপ্রাসাদের রক্ষীদের হত্যা করেন এবং মুসলিম সেনাপতির আগমনে মধ্যাহ্নভোজে ব্যস্ত রাজা প্রসাদের পশ্চাৎ দিকের দরজা দিয়ে প্রাণভয়ে নদীপথে বর্তমান ঢাকার দিকে বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী একটি বিশাল সেনা বাহিনীর অগ্রভাগে ছিলেন এবং মূল সৈন্যদের আগমনের পূর্বেই তিনি কতিপয় অশ্বারোহীর সাহায্যে দুর্বল রাজাকে বিতাড়িত করে বিনা যুদ্ধে নদীয়া জয় করেন। বলা বাহুল্য বিহার এবং বাংলা জয় কুতুবউদ্দীনের নির্দেশেই সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে তিনি উত্তর দিকে অভিযান পরিচালনা করে লক্ষণাবতী অথবা গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তর করেন। বিজয়োন্মাদে বখতিয়ার খলজী গৌড় থেকে দেবকোট এবং সেখান থেকে তিব্বতে অভিযান করেন। বিশ্বস্ত দশ হাজার সৈন্যসহ তার এ অভিযান ব্যর্থ হয় এবং প্রত্যাবর্তনকালে অসংখ্য সৈন্য মৃত্যুবরণ করে। ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে দেবকোটে আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন। মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর সেনানায়কত্বে বাংলা এবং বিহার ঘুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পাল ও সেন বংশের অবসানে ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে সর্বপ্রথম মুসলিম রাজনৈতিক প্রাধান্য কায়েম হয়। যার ফলে দীর্ঘকাল এ অঞ্চলে মুসলিম প্রাধান্য বিরাজমান ছিল।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন (নমুনা)

১। উমাইয়া খলিফা ওয়ালিদ যখন স্পেন বিজয় করেন তখন স্পেনের সমাজ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। সমাজ মূলত শাসক ও শাসিত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। শাসক শ্রেণির মধ্যে ছিল রাজা, অভিজাত ও উচ্চ শ্রেণির যাজক গোষ্ঠী এবং শোষিত শ্রেণির মধ্যে ছিল বর্গাদার, ভূমিদাস, ক্রীতদাস ও ইহুদীগণ। শাসক শ্রেণিকে কোন কর দিতে হতো না কিন্তু শাসিত শ্রেণি করভারে জর্জরিত ছিল। উপরন্তু নিম্নবিত্তের যাজক শ্রেণি উচ্চবিত্তের যাজক শ্রেণি দ্বারা নিগৃহীত হতো। স্পেনের এই সামাজিক বৈষম্য মুসলমানদের স্পেন বিজয়ে উৎসাহিত করেছিল এবং এই বিজয় স্পেনের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী ফল রেখেছিল।

ক. সিন্ধু প্রদেশ বর্তমান কোন্ দেশে অবস্থিত?
খ. ভারতীয় উপমহাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভারতবর্ষ নামকরণ সম্পর্কে লিখ।
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত স্পেনীয়দের সাথে প্রাক মুসলিম ভারতের সামাজিক অবস্থার সাদৃশ্য বর্ণনা কর।
ঘ. তুমি কি মনে কর, মুসলিম বিজয়ের ফলে স্পেনের ন্যায় তৎকালীন ভারতেও কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা কর।

২। সপ্তদশবর্ষী সেনাপতি ইয়াছীন দুর্বার গতিতে মধুপুর রাজ্যে অভিযান চালিয়ে রাজা বিজয় সিংহকে পরাজিত করে তার রাজধানী দখল করে নেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই রাজার মৃত্যু হয়। এরপর সেনাপতি ইয়াছীন আরও কিছু নতুন নতুন অঞ্চল দখল করে সেখানে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

ক. মুসলমানরা সিন্ধু বিজয় করে কত খ্রিষ্টাব্দে?
খ. হাজ্জাজ বিন ইউসুফ কেন সিন্ধু অভিযান করেছিলেন তার প্রধান কারণটি উল্লেখ কর।
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সেনাপতির সঙ্গে কোন মুসলিম সেনাপতির কর্মকাণ্ডের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ইতিহাসের আলোকে উক্ত মুসলিম সেনাপতির কৃতিত্ব মূল্যায়ন কর।

৩। চীনের এক প্রতাপশালী রাজা তার পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহের দুর্বলতার সুযোগে একের পর এক রাজাকে পরাজিত করে বিজিত অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত অর্থ স্বীয় রাজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে খরচ করেন। কিন্তু অনেক রাজ্য জয় করলেও তিনি একটি ছাড়া আর কোন রাজ্যকেই নিজ রাজ্যভুক্ত করেননি।

ক. গজনবী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় কত খ্রিস্টাব্দে?
খ. সোমনাথ মন্দিরের উপর টীকা লিখ।
গ. উদ্দীপকের রাজার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ইসলামের ইতিহাসের কোন সুলতানের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. ইতিহাসের আলোকে উক্ত সুলতানের যুদ্ধাভিযানসমূহের উদ্দেশ্য কি ছিল? ব্যাখ্যা কর।

৪। আফ্রিকা অঞ্চলের একজন রাজা তার সম্রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধি করার জন্য এবং সেখানে নিজ ধর্মের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাশ্ববর্তী রাজ্যগুলোতে আক্রমণের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু প্রথমবার সেই রাজ্যগুলোর সম্মিলিত বাহিনীকে তিনি পরাজিত করতে ব্যর্থ হন। কিন্তু পরের বছরই তিনি তাদেরকে পরাজিত করে সেখানে নিজ ধর্ম ও শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

ক. বাংলায় সেন বংশের শেষ রাজা কে ছিলেন?
খ. ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজীর সহজ বঙ্গ জয়ের কারণটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রাজার সঙ্গে ইসলামের ইতিহাসের ঘুরী বংশের একজন শাসকের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মিল খুজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর। (যুদ্ধ জয়ের অদম্য আগ্রহ)

ঘ. ইতিহাসের আলোকে দ্বিতীয় যুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. *প্রাচীন কালে উত্তর ভারতীয় রাজ্য হিসেবে পরিচিত–*

ক) সিন্ধু খ) মুলতান

গ) কাশ্মির ঘ) কৌনজ

২. *প্রাচীন হিন্দু সমাজে ঐক্য ও সংহতির পথে প্রধানত আঘাত হানে–*

ক) সাম্প্রদায়িকতা খ) জাতিভেদ প্রথা

গ) ধর্মীয় অসহিঞ্চুতা ঘ) সতীদাহ প্রথা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩-৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

বহু পূর্ব থেকেই ভারতের সঙ্গে আরব বণিকদের একটা ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল। সে সময় আরব বণিকদের সঙ্গে ধর্মপ্রচারক গণের আগমন ঘটলেও ইসলামের কাজ ব্যাপকভাবে পৌছায় সিন্ধু বিজয়ের পর। সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ততটা গুরুত্বপূর্ণ না হলেও মুসলিম শিক্ষা সংস্কৃতির বিকাশে এর ফলাফল ছিল সুদুরপ্রসারী।

৩. **সিন্ধু অভিযান পরবর্তীকালে ভারতে ধর্ম প্রচারে আগত আউলিয়া ছিলেন–**

i) হযরত শাহজালাল (র.)

ii) হযরত আদম শহীদ (র.)

iii) সৈয়দ মাহমুদ সারওয়ার (র.)

কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii এবং iii

গ) i এবং iii ঘ) i , ii এবং iii

৪। **মুসলমানদের আগমনের ফলে প্রাচীন কালে ভারতে প্রধানত হ্রাস পায়–**

ক) বর্ণবাদের কঠোরতা খ) সাম্প্রদায়িকতা

গ) বিধবা বিবাহ প্রথা ঘ) সামাজিক কুসংস্কার

৫। **প্রাচীনকালে সিন্ধু বিজয়ের ফলে ভারতীয় সমাজে মুসলিম শিক্ষা সংস্কৃতির দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয়?**

ক) সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে

খ) সংস্কৃতির আদান প্রদানে

গ) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে

ঘ) আর্য ও ও সেমিটিক জাতির সংমিশ্রণে

৬। **নিচের সারণীর মুসলিম শাসকগণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন সারিটি সঠিক?**

ক.	মুহম্মদ ঘুরী	সোমনাথ মন্দির	গজনি
খ.	সুলতান মাহমুদ	দেবল বন্দর	চৌগান
গ.	কুতুব উদ্দীন আইবেক	আমির আকুব	মালিক
ঘ.	মুয়াবিয়া (রা.)	দেবল বন্দর	উমাইয়া

পঞ্চম অধ্যায়
বাংলাদেশে ইসলাম

পূর্বকথা : আল্লাহর প্রেরিত বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে মানব সভ্যতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে যে বিক্ষিপ্ত আলোচনা রয়েছে তা সামঞ্জস্যবিহীন নয়। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের মধ্যকার আলোচনায় আমরা জানতে পারি যে মানবজাতির আদি পুরুষ হযরত আদম (আ.)। তিনি বেহেশত হতে ভারত উপমহাদেশের সর্ব দক্ষিণে অবস্থিত সিংহলে অবতরণ করে এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের দিকে অগ্রসর হয়ে প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূমি আরব উপ-দ্বীপে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে তাঁরই বংশধরদের দ্বারা পৃথিবীতে মানবজাতি ও বিভিন্ন সভ্যতার বিস্তার ও প্রসার লাভ করে। তাই একথা স্বীকৃত যে হযরত আদম (আ.) ছিলেন প্রথম মানুষ ও আল্লাহর মনোনীত প্রথম নবি। মহা গ্রন্থ কুরআনের বর্ণনায় জানা যায়, মানব সভ্যতার প্রতি স্তরে আল্লাহ তাআলা সংশ্লিষ্ট যুগ ও অঞ্চলের উপযোগী নবি পাঠাতেন। নবিগণ মানুষের সাথে আল্লাহর সম্পর্ককে ভিত্তি করে বিভিন্ন সভ্যতা গড়ে তোলেন। এভাবে গঠিত সভ্যতায় দুটি সুস্পষ্ট ধারা লক্ষ্য করা যায়। একটি ধারা গড়ে উঠে নবিগণের শিক্ষা ও প্রচারের ভিত্তিতে, যাকে আমরা তৌহিদবাদ বলে থাকি। আর দ্বিতীয় ধারাটি হচ্ছে নবিগণের শিক্ষা ও প্রচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক ধারা। তাকে কুফর বা শিরকবাদ বলা হয়।

সভ্যতা সৃষ্টির এই ধারায় হাজার বছর ব্যাপী মানবজাতি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে বসতি স্থাপন করে। এক্ষেত্রে লক্ষাধিক নবির প্রচেষ্টা ও সাধনায় মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে হাজার হাজার বছরের নানাবিধ কার্যধারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাছাড়া ব্যবসা -বাণিজ্যের প্রসারের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নানাবিধ উন্নতি সাধিত হয়। এ অবস্থায় সারা বিশ্বে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুষ্ঠ বিকাশে একজন মহান সংগঠকের প্রয়োজন দেখা দিলে আল্লাহ তায়ালা শেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) কে প্রেরণ করে সেই প্রয়োজনও পূর্ণ করে দেন। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) সমগ্র বিশ্ববাসীকে দান করলেন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এ জীবন বিধান হচ্ছে আল্লাহর মনোনীত ইসলাম। আরবের তদানীন্তন পৌত্তলিক সাম্রাজ্যে তিনি ইসলামের বাণী ছড়িয়ে দিলেন।

নানা প্রতিকূলতার সাগর পাড়ি দিয়ে শেষ নবি হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এগিয়ে চললেন। একেশ্বরবাদের প্রতি তাঁর আহবানে সাড়া দেবার লোকের অভাব হলো না। সর্বপ্রথম তাঁর আহবানে সাড়া দিলেন তাঁর সহধর্মিনী হযরত খাদীজা (রা.), পিতৃব্যপুত্র কিশোর হযরত আলী (রা.), তাঁর গোলাম ও পালকপুত্র হযরত জায়েদ (রা.) এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। এভাবে ইসলামি কাফেলার শক্তি বৃদ্ধি পেয়ে শেষ নবি (সা.) এর দাওয়াত গ্রহণকারী মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে যেতে থাকলো দিনের পর দিন।

ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন

মানবতার শেষ নবি (সা.) নবদীক্ষিত মুসলমানদের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মক্কা ও মদিনায়একটি নতুন ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করলেন। পরবর্তিতে একদল নিবেদিত প্রাণ ইসলাম প্রচারকই সুফি, আউলিয়া ও পূত চরিত্রের মুসলিম ব্যবসায়ীর আদর্শ ও নিষ্ঠা সমগ্র বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছে।

প্রাচীন বাংলার সীমানা

বিশাল অঞ্চলব্যাপী প্রাচীন বাংলার সীমানা নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। কারণ আজকে আমরা বাংলা বলতে যেসব এলাকাকে বুঝি প্রাচীন যুগে এসব এলাকার ভিন্ন ভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। এসব ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় প্রতিষ্ঠিত ছিল একাধিক স্বাধীন রাজ্য। আবার বিভিন্ন সময়ে এদের নামের মধ্যেও পরিবর্তন দেখা গেছে। তবে মোটামুটি ভাবে প্রাচীন বাংলার

সীমানা ছিল উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে গারো-খাসিয়া, লুসাই, জয়ন্তিয়া, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণি এবং পশ্চিমে বিহারের রাজমহল পাহাড় ও কলিঙ্গ। এ চর্তুসীমানার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বাংলার প্রায় সমগ্র এলাকাটিই সমতলভূমি। যার বৃহত্তম অংশই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিমাটির দ্বারা গঠিত। বিভিন্ন নদ-নদী বাংলার সর্বত্র জালের মতো বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

নামকরণ

বাংলার নামকরণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে নানামত রয়েছে। বাংলার নামকরণ সম্পর্কে আবুল ফজল তাঁর আইন-ই আকবরী গ্রন্থে বলেছেন : এ দেশের জমিতে উঁচু উঁচু আল বেঁধে বন্যার পানি থেকে জমি রক্ষা করত। তাই সময়ের ব্যবধানে 'আল শব্দটিই দেশের নামের সাথে যুক্ত হলে বঙ্গ +আল= বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি হয়।

প্রাক-ইসলামি যুগে বাংলাদেশ

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ছিলেন আল্লাহ প্রদত্ত সত্য, সুন্দর, সুষ্ঠ ও কুসংস্কারমুক্ত জীবনবিধান ও সমাজ ব্যবস্থার শেষ শিক্ষক ও প্রতিষ্ঠান। তাঁর দায়িত্ব ছিল সমগ্র বিশ্ব মানবতাকে অন্ধকার, অজ্ঞানতা ও পংকিলতা থেকে মুক্ত করে আলোর পথে নিয়ে আসা। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর পরবর্তীকালে তাঁর সুশিক্ষিত সাহাবিবৃন্দ ইসলামের সত্য জীবনবিধান ও সমাজ ব্যবস্থার বাণী নিয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। এ সময় ব্যবসা-বানিজ্যে উন্নত আরবরা তাদের বাণিজ্য বহর নিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করতো। তাছাড়া ঐতিহাসিকগণের মতামতের ভিত্তিতে জানা যায় যে, আরব বণিকদের জাহাজ ভারতের পশ্চিম উপকূল পার হয়ে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে চিনদেশে যাতায়তা করত। কাজেই বলা যায় বাংলার উপকূলে তাঁদের আনাগোনা হতোই।

প্রাক-ইসলামি বাংলার বিভিন্ন অবস্থা

রাজনৈতিক অবস্থা :

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক পর্যন্ত সমগ্র বাংলায় অনার্য অধিবাসীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করে আসছিল। কিন্তু খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষের দিকে নন্দরাজ বংশের পতনের পর শক্তিশালী মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠার পর সমগ্র বাংলার বিভিন্ন অংশে আর্যদের প্রভাব প্রতিষ্ঠা হতে থাকে। তাই দেখা যায় সুদীর্ঘকালব্যাপী বাংলার বিভিন্ন অংশে আর্য ও হিন্দু শক্তির আধিপত্য বিরাজিত ছিল। এসময় কতিপয় রাজার হিংসা ও দমন নীতির কারণে বাংলার রাজনৈতিক অরাজকতা চরমে পৌছে। সমগ্র বাংলার অনৈক্য ও আত্মকলহ দেখা দেয়। এ অরাজকতার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তৎকালীন বাংলার নেতৃবৃন্দ একত্রিত হয়ে পারস্পরিক ঝগড়া বিবাদ ভুলে গিয়ে নিজেদের মধ্য থেকে গোপাল নামক একজনকে রাজা নির্বাচন করলে ৭৫০ অব্দে পাল রাজবংশের গোড়াপত্তন ঘটে। এ বংশ প্রায় ৪০০ বছর রাজত্ব করে।

একাদশ শতকের শেষভাগে পাল রাজবংশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তখন বিজয় সেন নামক এক শক্তিশালী সামন্ত রাজা সমগ্র বাংলাদেশে প্রভুত্ব স্থাপন করলে সেন বংশের শাসন শুরু হয়। অত:পর বখতিয়ার খলজীর লক্ষণাবর্তী অধিকারের দ্বারা বাংলার সাধারণ মানুষের উপর যে রাজনৈতিক নির্যাতন চলছিল তার অবসান হয়।

ধর্মীয় অবস্থা:

বাংলার যে সকল ধর্মীয় মতাদর্শ প্রচলিত ছিল তা হলো:

(ক) আর্যধর্ম : আর্যরা তৌহিদবাদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ছিল। তারা অগ্নি, ইন্দ্র, বারুন, পবন প্রভৃতির পূজা করত। সাধারনত হোম, যজ্ঞ ও বলিদানের মাধ্যমে তাদের এ সব পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন হতো।

(খ) ব্রাহ্মণ্যবাদ : ব্রাহ্মণগণ বিভিন্ন মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজা কার্য সম্পাদন করতেন। ধর্ম কর্ম অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মনদের এ প্রাধান্যের ভিত্তিতে ধীরে ধীরে আর্যধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মে পরিণিত হয়। এভাবে সমাজে বর্ণাশ্রমের উদ্ভব হয়। সৃষ্ট হয় ধর্মীয় শ্রেণি ব্রাহ্মন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের।

(গ) জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম : ধর্মীয় নানাবিধ বিশৃঙ্খলার উপর ভিত্তি করে ভারতে জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হয়। জৈনদের কোনো লিখিত ধর্মগ্রন্থ ছিল না। তাদের ধর্মগ্রন্থের একমাত্র উৎস ছিল মহাবীর। এ ধর্মের শিক্ষাসমূহ বিকৃতির বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ধীরে ধীরে হিন্দু ধর্মের অংশে পরিণত হয় এবং জৈন ধর্মও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক হলেন গৌতম বুদ্ধ। এ ধর্ম জাতিভেদকে প্রশ্রয় দেয়নি। এ ধর্মের শিক্ষা হচ্ছে অহিংস, দয়া, দান, সৎচিন্তা, সংযম, সত্যভাষণ, সৎকার্যসাধন, স্রষ্টাতে আত্মসমর্পন প্রভৃতি মানুষের মুক্তি লাভের প্রধান উপায়। বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বাসীদের মতে যাগ-যজ্ঞ ও পশুবলী দিয়ে ধর্মপালন করা যায় না। তবে বিকৃতি ও ষড়যন্ত্রের অসংখ্য আক্রমনে বৌদ্ধ ধর্মের আসল চেহারা অতলে তলিয়ে গেছে। এমনকি বহু সাধনার পর সূত্রের বাণী নিয়ে যিনি আসলেন সেই গৌতম বুদ্ধকেও তাঁর অনুসারীরা ভ্রান্ত ভাবে উপস্থাপন করেন।

অষ্টম শতকে বাংলায় পালরাজাগণের অভ্যুদয়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। একাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত এ প্রভাব অব্যাহত থাকে। তবে পরবর্তীতে হিন্দু ধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম দূর্বল হয়ে পড়ে।

(ঘ) হিন্দু ধর্ম : দ্বাদশ শতকের শেষভাগে সেন বংশের প্রভাবে বাংলায় হিন্দু ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। বিষ্নু ও শিবের পূজা ছাড়াও অন্যান্য দেব দেবীর পূজা তখন বাংলায় প্রসার লাভ করে। এক সময় সেনরাজগণ বাংলায় মূর্তি পূজার প্রচলন করেন। ধর্মের নামে সতীদাহর ন্যায় গর্হিত প্রথার প্রচলন বাংলায় দেখা যায়। হিন্দু যাজকরা জাতিভেদ ও বর্ণাশ্রম প্রথাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা

ষষ্ঠ শতক হতে বাংলায় বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজব্যবস্থা পুরোদমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এ সমাজ ব্যবস্থায় ব্রাহ্মনরা সমাজের শীর্ষে স্থান লাভ করে। ধর্মীয় কার্যাদি যেমন পূজানুষ্ঠান, ব্রতানুশীলন যাগ-যজ্ঞের পৌনঃপুনিক আচরণাদি প্রভৃতি ব্রাহ্মনদের দ্বারাই সম্পন্ন হতো। অপরদিকে নিম্নশ্রেণিতে চলত নিদারুন অভাব, দারিদ্র, ক্ষুধা, পীড়ন, শোষন যন্ত্রনা ও মৃত্যু। বাংলায় বিভিন্ন বর্ণবিন্যস্ত হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর ও ক্ষত্রীয়, বৈশ্য ও শুদ্র ইত্যাদি বর্ণের সামাজিক প্রতিষ্ঠা বর্ণগতভাবে কিছুই ছিলনা। সকলেই শুদ্রের পর্যায়ে গন্য হতো।

তদানীন্তন বাংলায় সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি সামাজিক কদাচারের জন্যও অনেকাংশে দায়ী। যেমন- বিবাহ ব্যাপারে নিম্নবর্ণের লোক কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে বিবাহ করতে পারত না। কিন্তু ব্রাহ্মণ নিম্নবর্নের যেকোনো রমনীকে বিবাহ করতে পারতেন। তবে এ স্ত্রীর মর্যাদা কখনই ব্রাহ্মণ'র সমান বলে গণ্য হতনা।

এভাবে বাংলার সমাজ দ্রুত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। একদিকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেহগত বিলাস অন্যদিকে সাহিত্য-কাব্য-কবিতার মধ্যেও যৌন কাম-বাসনার মদিরতা বাংলার সমাজকে অন্তঃসার শুন্য করে দিয়েছিল।

অর্থনৈতিক অবস্থা

আর্থিক প্রাচুর্য : খ্রিস্টের জন্মের পূর্ব থেকেই বাংলা একটি কৃষিপ্রধান দেশ। নদী-বিধৌত পলি মাটির দেশ হবার কারণেই প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। এদেশের বেশিরভাগ লোক গ্রামে বাস করত।

তবে কৃষিপ্রধান দেশ হলেও প্রাচীনকাল থেকে বস্ত্রশিল্পের জন্য বাংলা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন বিদেশের বাজারে সুনাম অর্জন করেছিল। তাছাড়া কাঠশিল্প ও হস্তশিল্পের কাজেও উন্নতি লাভ করেছিল। সে সময় শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতিও সাধিত হয়েছিল। দেশ-বিদেশের সাথে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য চলত।

ইসলামের প্রচার ও প্রসার

নবুয়ত লাভের পর হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ২৩ বছর ধরে সত্য ধর্ম প্রচার করে তৌহিদবাদের ভিত্তিতে একটি নতুন সমাজ গঠন করে যান। তাঁর ওফাতের পর তাঁর সুশিক্ষিত সাহাবিগণ, সাহাবিগণের কাছ থেকে সত্যের আলোকে উদ্দীপ্ত তাবেয়ীগণ, তাবেয়ীগণের কাছে দীক্ষাপ্রাপ্ত তাবয়-তাবেয়ীগণ এবং এভাবে পর্যায়ক্রমে মুসলমানদের বিভিন্ন দল ইসলামের সত্যবাণী নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলায় ইসলামের আবির্ভাব ঘটে।

বণিকদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচার : ইসলামের আগমণের পূর্ব হতেই আরবরা ব্যবসা-বাণিজ্যে পারদর্শী ছিল। ইসলাম প্রচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এক একজন ব্যবসায়ী এক্ষেত্রে ধর্মপ্রচারকের দায়িত্ব পালন করেছেন। বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে এভাবে মুসলিম বণিকদের সাহায্যে প্রথম যুগেই ইসলামের সত্যবাণী প্রবেশ করে বলে ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন।

উপরন্ত, আরবদেশ এশিয়া ও ইউরোপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হওয়ায় এশিয়া ও ইউরোপের চাবিকাঠি ছিল আরবদের হাতে। তাছাড়া ভারতের উপকূলীয় বাণিজ্যে একচেটিয়া আধিপত্য ছিল আরবদের।

প্রাচীন কাল থেকে আরবদের যোগাযোগের ফলে চট্টগ্রামের সংস্কৃতিতে তাদের প্রভাব লক্ষণীয়। চট্টগ্রামী ভাষায় প্রচুর আরবি শব্দ ব্যবহৃত হয়। চট্টগ্রামী লোকদের মুখের আদল অনেকেই আরবদের মতো মনে করে।

বস্তুত বাংলার উপকূল অঞ্চলে আরব বণিকদের আগমণের মাধ্যমেই এদেশে ইসলামের সূত্রপাত হয়। তাছাড়া অনেক বণিক এদেশের বহু বিধর্মী রমনীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এভাবে বহুস্থানীয় মহিলা ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন।

স্থল পথে ইসলামের আগমন

স্থলপথে প্রধানত সিন্ধুর পথে ইসলাম সমগ্র হিমালয়ান উপমহাদেশে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.) এর আমল হতেই বিভিন্ন মুসলিম সেনাপতি বারবার সিন্ধু সিমান্তে অভিযান প্রেরণ করেন। এসব অভিযানে মুসলমানরা কখনো সাফল্য আবার কখনো ব্যর্থতার সম্মুখিন হয়। অবশেষে ৭১২ খ্রিঃ মুহম্মদ ইবনে কাসিম সমগ্র সিন্ধু জয় করে ভারতে ইসলাম প্রবেশের পথ সুগম করেন। তাই বলা যায় হিজরি প্রথম শতকেই ইসলাম ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন।

ইসলাম প্রচারের প্রথম পর্যায়

প্রথম যুগে যে সকল একনিষ্ঠ ইসলাম প্রচারক বাংলায় আগমন করেছিলেন হযরত শাহ সুলতান বল্‌খী (র.) ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি প্রথমে ঢাকা জেলার হরিরাম নগরে ও পরে বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে ইসলাম প্রচার করেন। তবে কথিত আছে সুলতান বলখী সমুদ্র পথে বাংলায় আগমন করে চট্টগ্রামের সন্দ্বীপে অবতরণ করেন এবং সেখানে অবস্থান করে ইসলাম প্রচার করেন।

বর্তমান নেত্রকোনা জেলার অর্ন্তগত মদনপুর গ্রামে হযরত শাহ মোঃ সুলতান রুমীর মাজার রয়েছে। এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করার পর তিনি নিজের বহু অলৌকিক কার্যের মাধ্যমে স্থানীয় জনসাধারনকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করতে থাকেন। কথিত আছে, যে ব্যক্তি তাঁর সাথে একবার সাক্ষাত করেছেন সে-ই ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রানিত হয়েছেন।

বিস্ময়কর ও চমকপ্রদ কিংবদন্তির নায়ক হযরত বাবা আদম শহীদ (র.) বাংলায় আগমনকারী প্রথম যুগের মুজাহিদ সূফীগণের অন্যতম ছিলেন।

হযরত মাখদুম শাহ দৌলা শহীদ (র.) দলবলসহ শাহাজাদপুর এসে ইসলাম প্রচার করেন। হযরত জালালুদ্দিন তাবরিকী (র.) ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পরপরই গৌড় অঞ্চলে এসে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। যতদূর জানা যায়, পূর্ববঙ্গে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই হযরত শাহ নিয়ামতুল্লাহ (র.) ঢাকা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। রাজশাহী অঞ্চলে ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে হযরত শাহ মাখদুম (র.) সবচেয়ে প্রাচীন বলে মনে করা হয়। প্রাচীন সুফী দরবেশের মধ্যে খ্রিষ্টিয় নবম শতকে পারস্যের হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাছাড়া বহুসংখ্যক সুফি ও অলী দরবেশের আগমনের কারণেই সম্ভবত চট্টগ্রামকে 'বার আউলিয়ার দেশ' বলা হয়।

বাংলায় ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়

ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ হতে চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগ অবধি সময়সীমা ছিল বাংলায় ইসলাম প্রচারের দ্বিতীয় পর্যায়। প্রথম পর্যায়ের পর দ্বিতীয় পর্যায়েও সুফি ও দরবেশগণের দ্বারা বাংলায় ইসলাম প্রচার অব্যাহত থাকে। তবে দ্বিতীয় পর্যায় ইসলাম প্রচারে মুসলিম রাজশক্তি সহায়তা প্রদান করে।

দ্বিতীয় পর্যায় ইসলাম প্রচারের আলোচনায় সর্বপ্রথম হযরত শাহ তুর্কান শেখের কথা বলা হয়। উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলায় তিনি নিজের কেন্দ্র স্থাপন করে ইসলাম প্রচার অব্যাহত রাখেন।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে হযরত মাওলানা তকীউদ্দীন (র.) বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচার করেন। হযরত শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ (র.) সোনারগাঁও আগমন করে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচার ও সাধারণভাবে শিক্ষা সম্প্রসারনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ইসলামের বিভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য তিনি সোনারগাঁওয়ে একটি মাদরাসা স্থাপন করেন।

উত্তর ও পশ্চিম-দক্ষিন বঙ্গে ইসলাম প্রচারের সাথে যে মুজাহিদের নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তিনি হচ্ছেন হযরত উলুগ-ই-আজম খাজাজী (র.)। তিনি লাখনৌতির সুলতান রুকুনুদ্দীনের অধীনে একজন সেনাপতি ছিলেন। সুলতানের নিদের্শে তিনি বহুস্থানে অভিযান চালিয়ে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীয়ন করেন।

বাংলার দক্ষিণাংশে বিশেষ করে চব্বিশ পরগনা ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচারের সাথে যে দুজন মহান সাধক মুজাহিদের নাম বিশেষ ভাবে জড়িত তারা হচ্ছেন সাইয়্যেদ আব্বাস আলী মক্কী (র.) ও তাঁর ভগ্নী রওশন আরা (র.)। বর্তমান চব্বিশ পরগনা জেলার বশিরহাট মহকুমায় মুসলমানদের একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা তাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সাধনার ফল বলা যেতে পারে।

নদী প্রধান এ বাংলাদেশে হযরত শাহ বদর (র.) বা বদর পীরের প্রভাব যে কতো বেশি তা বিশেষ করে দক্ষিণ ও পূর্ব বাংলার নদীপথে ভ্রমণ করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। মুসলমান-হিন্দু নির্বিশেষে আজো বাংলার মাঝি মাল্লারা নৌকা ছাড়ার পূর্বে বদর পীরের নাম উচ্চারণ করে থাকে।

পূর্ববঙ্গে ও আসামের পশ্চিমাংশে ইসলাম প্রচারে হযরত শাহ জালাল মুজাররাদীর (র.) এর অবদান অতুলনীয়। সমকালীন পর্যটক ইবনে বতুতা লিখেছেন; তাঁর হাতে এদেশের অধিকাংশ লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে।

বরেন্দ্র অঞ্চলে যে সব ইসলাম প্রচারক এসেছিলেন তাদের অধিকাংশই দিনাজপুর জেলায় তাদের কর্মশক্তি নিয়োগ করেন। তাই দিনাজপুর জেলায় বহু আলেম ও দরবেশের আস্তানা ও মাজার দেখা যায়। এ আলেম ও দরবেশদের মধ্যে হযরত সাইয়েদ নাসিরুদ্দীন শাহ নেকমর্দান (র.) অন্যতম ছিলেন।

চতুর্দশ শতকে বাংলার আর এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে। তিনি হচ্ছেন হযরত শায়খ আলী সিরাজুদ্দীন (র.)। তৎকালীন বাংলার কেন্দ্রভূমি গৌড় ও পান্ডুয়ায় বসে তিনি ইসলাম প্রচার অভিযান চালিয়ে যান।

নোয়াখালী জেলায় ইসলাম প্রচারকদের মধ্যে সাইয়্যেদ হাফেজ মাওলানা আহমদ তানুরী (র.) সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। তিনি এ অঞ্চলের প্রথম যুগের ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম।

২০২৫

বাংলায় ইসলাম প্রচারে রাজশক্তির ভূমিকা

ত্রয়োদশ শতকের শুরু থেকে বাংলায় মুসলমানদের বিজয় অভিযান শুরু হয়। পরবর্তী দুশো থেকে আড়াইশো বছরের মধ্যে সমগ্র বাংলা মুসলিম শাসকদের অধীনে চলে আসে। এ সময় মুসলিম বিজেতা ও শাসকগণ বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকলেও ইসলাম প্রচারে তাদের ভূমিকা কম ছিল না। ইসলাম প্রচারকদের অভাবিতপূর্ব সাফল্যই বখতিয়ার খলজি কে বঙ্গ বিজয়ে উদ্বুদ্ধ করে। তিনি বাংলার মুসলমানদের ধর্মীয় প্ররণার উৎস ছিলেন। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় তিনি বহু মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মান করেন। তুঘরিল খান বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসকের মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বাংলায় ইসলাম প্রচারের জন্য এক সময় তিনি আলেম ও দরবেশগণকে ৫ মণ স্বর্ণ দান করেছিলেন। তাছাড়া তৎকালীন বাংলার শামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ, ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ, শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ, সেকান্দার শাহ, গিয়াসুদ্দীন আযম শাহ প্রমুখ শাসকগনের সাথে ইসলাম প্রচারক আলেম ও দরবেশগণের সু-সম্পর্ক ছিল। যা ইসলাম প্রচারে সহায়ক হয়েছিল।

বাংলায় ইসলাম প্রচারের তৃতীয় পর্যায়

পঞ্চদশ শতক হতে মুসলিম রাজশক্তি বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফলে এ সময়ের ইসলাম প্রচারকদের পথ ছিল তুলনামূলকভাবে সুগম। তৃতীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রচারকদের অন্যতম ছিলেন শাহ নূর কুতুবুল আলম (র.)। তিনি গৌড়ের সুলতান গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। তাঁর কাছে ধর্মীয় শিক্ষা লাভের জন্য বাংলায় ও ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে ইসলামী জ্ঞান পিপাসু সমবেত হন। যশোরে ও খুলনা অঞ্চলে ইসলাম প্রচার, ইসলামের ভাবধারার প্রচলন ও ইসলামি সমাজ বিধি প্রবর্তনে হযরত খান জাহান আলীর নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। তিনি নিজে ইসলাম প্রচার করার সাথে সাথে তাঁর শিষ্য-শাগরিদগণকেও বিভিন্ন স্থানে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রেরণ করেন। তাঁর সংগঠন ক্ষমতা, জনসেবা ও অকৃত্রিম চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ-বিমোহিত হয়ে এতদঞ্চলের অমুসলিম সম্প্রদায়গুলো দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। তাছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলে হযরত খালাস খান (র.), উত্তর বঙ্গে হযরত শাহ শরীফ জিন্দানী (র.), বগুড়ায় বাবা আদম (র.), ঢাকার সোনারগাঁওয়ে শাহ মাল্লাহ (র.), ঢাকা অঞ্চলে শাহ জালাল (র.) ও শাহ আলী (র.), পাবনা অঞ্চলে শাহ আফজাল মাহমুদ (র.) ও গাজী শায়খ মুহম্মদ বাহাদুর (র.), রাজশাহী অঞ্চলে শাহ মুয়াজ্জাম দানীশ (র.), টাঙ্গাইল অঞ্চলে শাহ আদম কাশ্মিরী (র.) ও শাহ জামাল (র.), চট্টগ্রাম অঞ্চলে শাহপীর (র.) ও কাজী মুওয়াজ্জিল (র.) সহ অন্যান্য আরও বহু সুফি সাধক বাংলায় ইসলাম প্রচারে ব্যাপক ভূমিকা রেখে গেছেন।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন (নমুনা)

১। প্রাচীন মিসরের প্রতিটি গ্রাম ছিল অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কেননা নদী বিধৌত পলিমাটির দেশ হবার কারণে মিসরে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে ওঠেছিল। অন্যদিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে মিসরীয়রা বহু ধর্ম ও দেব-দেবীতে বিশ্বাসী ছিল। তারা নানা ধরনের পূজা-পার্বন পালন করত। মিসরের প্রতিটি গোত্র ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম পালন করত।

ক. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন।

খ. বাংলা নামকরণ কীভাবে হয়েছিল?

গ. উদ্দীপকের প্রাচীন মিসরের অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার যে মিল রয়েছে তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত প্রাচীন মিসরের ধর্মীয় অবস্থার সাথে প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থার সাদৃশ্য আছে কি? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তোমার মতামত দাও।

২। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসে এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তারা বহু মিশনারী প্রতিষ্ঠা করে। অন্যদিকে আরব বণিকদের ধর্ম প্রচারের কৌশল ছিল ইসলামের মর্মবাণী প্রচার।

ক. ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক কে?

খ. স্থলপথে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের আগমণ কীভাবে হয়েছিল?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সঙ্গে আরব বণিকদের ইসলাম ধর্ম প্রচারের বৈসাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচারে আরব বণিকদের ভূমিকা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

১। হযরত আদম (আ.) কোথায় অবতরণ করেছিলেন?

ক. সিংহলে খ. ভারতে

গ. আরবে ঘ. বাংলায়

বাংলায় ইসলাম প্রচার কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল। মুসলিম বণিকদের মাধ্যমে মূলত এ অঞ্চলে ইসলামের সত্যবাণী প্রবেশ করলেও বহু একনিষ্ঠ ইসলাম প্রচারক এ অঞ্চলে আগমন করে ইসলাম প্রচার করেন।

উপরের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২-৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

২। বাংলায় ইসলাম প্রচার কয়টি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

৩। মহাস্থানগড়ে ইসলাম প্রচার করেছিলেন−

ক. শাহ সুলতান বলখী (র.)

খ. শাহ মোঃ সুলতান রুমী (র.)

গ. হযরত বাবা আদম শহীদ (র.)

ঘ. হযরত শাহ নিয়ামতুল্লাহ (র.)

৪। ইসলাম ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হিজরি প্রথম শতকেই তা কোন ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়?

ক. মুহম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়

খ. বখতিয়ার খলজীর বাংলা বিজয়

গ. হযরত শাহ তুফান শেখের বাংলায় আগমন

ঘ. হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (র.) -এর বাংলায় আগমন

৫। বাংলায় ইসলাম প্রচারে সহায়ক ভূমিকা পালন করে−

ক. দারিদ্র

খ. বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজব্যবস্থা

গ. শাসকদের জবরদস্তি

ঘ. ব্যাপক প্রচার।

সমাপ্ত

২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

দাখিল নবম ও দশম : ইসলামের ইতিহাস

তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের জীবনই সর্বোত্তম আদর্শ।

—আল কুরআন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক প্রণীত এবং
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত।